ইসলামী খেলাফত ধ্বংসের প্রকৃত ইতিহাস

মুফতী মনসূরুল হক

উৎসর্গ

নবীজীর দুই নন্দিনীর জামাতা, সায়্যিদুনা উসমান (রাযিঃ)নবীজী (সাল্লাল্লাহু আলাইহিহি ওয়াসাল্লাম) বলেছিলেনঃ উসমান!আল্লাহ তোমাকে একটি মহান সম্মানে ভূষিত করবেন। লোকজন চাইবে তোমার সে ভূষণ ছিনিয়ে নিতে। তুমি কিন্তু তা নিতে দিওনা ! উসমান দেননি। বিনিময়ে জীবন দিয়েছেন নির্মমভাবে!নবীজির একটি উপদেশের খাতিরে।আর বরিত হয়েছেন ইতিহাসের শ্রেষ্ঠতম মযলুমশহীদের মর্যাদায়। আমার এই ক্ষুদ্র নিবেদন তাঁরই পবিত্রস্মৃতির স্মরণে। - গ্রন্থকার

www.islamijindegi.com

সূচিপত্রঃ

বিষয়	পৃষ্ঠা
চতুর্থ সংস্করণের ভূমিকা	৫
প্রকাশকের কথা	১১
যুগে যুগে ইয়াহুদী-খৃষ্টচক্রের ষড়যন্ত্র	১৫
ইসলাম বিদ্বেষীদের ষড়যন্ত্র	২২
আয়িশা রাযি.-এর প্রতি মিথ্যা অপবাদের	২৯
তাবুক যুদ্ধে	৩১
মসজিদের নামে ষড়যন্ত্রের	৩২
ইসলামী খিলাফত ব্যবস্থা ধ্বংসের	৩২
ইবনে সাবার নানাবিধ অপকৌশল	৩৩
সাবায়ীচক্রের অপপ্রচারণা	৩৫
ইবনে সাবার লক্ষ্যে	৩৭
ইবনে সাবার ষড়যন্ত্রের প্রথম পর্ব	৩৮
ইবনে সাবার বিরুদ্ধে কঠিন শাস্তি প্রয়োগে জটিলতা	৪০
ইবনে সাবা কর্তৃক মদীনা আক্রমণ	৪২
হযরত উসমান রাযি. এর শাহাদাত	৪২
উসমান রাযি. এর প্রতি রাসূলুল্লাহ সা.এর ভবিষ্যদ্বাণী	৪৩
হযরত উসমান রাযি. এর বিরুদ্ধে কয়েকটি ভিত্তিহীন অভিযোগ	৪৬
উচ্চপদে আত্মীয়দের নিয়োগদান	৪৭
সফলতার পথে সাবায়ী ষড়যন্ত্র	৫১
সাবায়ীদের বিরুদ্ধে হযরত আলী রাযি	৫৫
জঙ্গে জামাল	৫৭
জঙ্গে সিফফীন	৫৮
কল্পিত ইতিহাসের গোড়ার কথা	৬৪
খারেজী সম্প্রদায়ের আত্মপ্রকাশ	৬৭
হযরত আলী রাযি. -এর শাহাদাত	৬৮
পঞ্চম খলীফা	৭০
একক খিলাফত প্রতিষ্ঠা	৭১
হাসান রাযি.- এর শর্তাবলী:	৭২
মুআবিয়ার রাযি. কীর্তিগাঁথা শাসনামল	৭৩
সাবায়ী ফিৎনা নির্মূলে	৭৬
অপপ্রচারণার কবলে হযরত মুআবিয়া রাযি.	৭৯
মুআবিয়ার প্রতি রাসূলুল্লাহ সা. ভবিষ্যদ্বাণী	৮০
শিয়া- রাফেজীর স্বরূপ	৮১
মুআবিয়ার রাযি. উত্তরসূরী	৮৪
কারবালার সঠিক ইতিহাস শুরুর কথাঃ	৯১
ইমাম হুসাইন এবং আব্দুল্লাহ ইবনে যুবাইরের বাইআতে অস্বীকৃতি জ্ঞাপনঃ	৯৪
ইমাম হুসাইনও মক্কার পথে	৯৫

উবাইদুল্লাহ ইবনে যিয়াদের আগমন	৯৬
হানীর গৃহে মুসলিম:	৯৬
হানীর গ্রেফতারী	৯৭
রাজ ভবন অবরোধ	৯৮
মুসলিমের গ্রেফতারী আর শাহাদাত	৯৮
হযরত হুসাইনের রাযি. কুফা যাওয়ার সংকল্প আর সহমর্মিদের নসীহতঃ	১০০
ইমাম হুসাইন রাযি. এর কারবালায় অবস্থান	১০১
পানি বন্ধ করে দেয়া হল	১০২
মহিমান্বিত শাহাদতের হৃদয় বিদারক ঘটনা	১০৫
শাহাদাতের সকাল	১০৮
হযরত হুসাইনের রাযি. শাহাদাত	১১০
হযরত ইবনে আব্বাসের রাযি. স্বপ্নঃ	১১২
আহলে বাইতের কাফেলা সিরিয়ায়	১১২
আহলে বাইতের সদস্য বর্গের স্বদেশ প্রত্যাবর্তন	১১৫
ইমাম হুসাইন রাযি. এর শাহাদাতে জড়িতদের পরিণাম	১১৬
একটি গুরুত্বপূর্ণ প্রশ্ন ও তার উত্তরঃ	১২০
আব্দুল্লাহ ইবনে জাফর জিজ্ঞেস করলেন কি সেই কাজ	১২১
কুরআন-সুন্নাহর আলোকে সাহাবায়ে কিরামের মাকাম ও তাদের অধিকার	১২৫
সাহাবায়ে কিরাম রাযি. সম্পর্কে আহলুস সুন্নাহ ওয়াল জামা'আতের আক্বীদা	১৪৩
দীনের জন্য সাহাবায়ে কিরামের রাযি. আত্মবিসর্জন	১৪৮
কুরআন হাদীসের আলোকে সাহাবায়ে কিরাম রাযি.-ই সত্যের মাপকাঠি	১৫৭
সাহাবায়ে কিরাম রাযি.-এর সমালোচনা ও দোষচর্চার শরয়ী বিধান	১৬৪
বর্তমান প্রেক্ষাপট ইয়াহুদী খৃষ্টানদের ষড়যন্ত্রের স্বরূপ	১৬৯

চতুর্থ সংস্করণের ভূমিকা

'ইতিহাস' শিক্ষিতজনদের উৎকৃষ্ট খোরাক বুদ্ধিমানদের পথের দিশারী। বিবেকবানরা ইতিহাস পড়েন। অতীতকালের উত্থান-পতনের কাহিনীর আলোকে নির্ণয় করেন আগামী দিনের জয়-পরাজয় ও সফলতা-ব্যর্থতার মাপকাঠি। সে কাঠিতে মেপে-ঝোপে রচনা করেন তাঁরা উন্নত ভবিষ্যত-প্রত্যাশিত নতুন ইতিহাস। মূলতঃ এ উদ্দেশ্যেই কুরআনে কারীমে বিভিন্ন জাতির উত্থান-পতনের কাহিনী বিধৃত হয়েছে অতীব যত্নের সাথে যারপর নাই সংক্ষিপ্ত পরিসরে। কিন্তু অনুসৃত সেই ইতিহাস যদি হয় বিকৃত-পরিবর্তিত ও বাস্তবতার সীমান্তচ্যুত তাহলে সে আলোকে প্রতিষ্ঠিত যে কোন ভবিষ্যত ও ভবিষ্যত ভাবনাই যে হবে বিকৃত, অধঃপতিত ও পরাজিত তা আর বলার অপেক্ষা রাখে না।

'বাড়াবাড়ি' কবিদের রোগ। ভারসাম্য ও সত্যসীমা বজায় রেখে কথা বলতে তারা অপারগ। তাদের তুলির আঁচড়ে প্রিয়জনরা হয়ে ওঠে জ্যোৎস্না নন্দিত অনিন্দ্য রূপসী কিংবা তার চাইতেও উজ্জ্বলতম আর বিজনরা চিত্রিত হয় পোকার কামড়ে বিক্ষত শতছিদ্র গোবরস্তুপ তুল্য একখানা কৃষ্ণাকালো আদলে। কিন্তু কাব্যশিল্পীদের এই বাড়াবাড়ি যদি মহামারীর রূপ নেয়; বিস্তৃতির পাখা ছড়িয়ে দেয় ইতিহাসের গচ্ছিত সম্পদ অবধি, তখন আর সেই ইতিহাস 'ইতিহাস' থাকে না। বরং তা হয়ে ওঠে কাব্যের রস ভরা উপাদান গল্প-উপন্যাস। গল্প-উপন্যাস অদ্যাবধি কোন জাতিকে তার উন্নত ভবিষ্যত নির্মাণে সাহায্য করেছে বলে শোনা যায়নি।

একথাও সত্য, ইতিহাস মানুষের রচনা। মানুষ ভুলের ঊর্ধ্বে নয়। তাই মানুষের কোন শিল্প-সৃষ্টি-রচনা-আবিষ্কারই সম্পূর্ণ ত্রুটিমুক্ত নয়। পৃথিবীতে সুস্থ মানব প্রজন্মের যে যা করেছে এই স্বীকৃত দিয়েই করেছে। পক্ষান্তরে সৃষ্টিকর্তা আল্লাহ সকল ত্রুটির ঊর্ধ্বে তাঁর সৃজিত বিশ্বে কুদরতের মহিমায় শিল্পে অপূর্ণতা, অসতর্কতা, অক্ষমতা, অদক্ষতা আর ত্রুটি-বিচ্যুতির কোন দাগ নেই। মুমিন হওয়ার জন্যেও এই স্বীকৃতি অত্যাবশ্যকীয়।

এই সূত্রদ্বয়ের আলোকেই একথা নিঃশঙ্কচিত্তে বিশ্বাস করতে হয় ইতিহাস মানুষের সৃষ্টি। কুরআন আল্লাহ'র চিরন্তন চিরসত্য গুন। হাদীসে রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম কুরআনেরই ব্যাখ্যা মাত্র। তাই ঐতিহাসিক কোন তথ্য যদি কুরআন-হাদীসের সাথে সংঘাতপূর্ণ হয় তখন সে ইতিহাস মানার যোগ্য কেন, পঠনযোগ্যই থাকে না। বরং এভাবেও বলা যায় ইতিহাসের সত্যতা, ইতিহাস নির্ভর শিক্ষা ও নির্দেশনা কোন ক্ষেত্রে কতটুকু সত্য ও গ্রহণযোগ্য তা বিচার করা হবে কুরআন-হাদীসের আলোকে। মানুষের সৃষ্টি আল্লাহ'র দেয়া নির্দেশনার আলোকে বিবেচিত হবে এইটাই স্বাভাবিক। মুমিনের জীবনে অনিবার্য বাস্তবতা এটা।

অথচ যদি এর বিপরীত ঘটে কোন অর্বাচীন যদি ইতিহাসের আলোকে কুরআন হাদীস নিঃসৃত শিক্ষা, দর্শন ও আদর্শকে বিচার করতে শুরু করে তাকে মুমিন বলার অবকাশ

থাকবে কি? তাকে ইসলাম ও মুসলমানের মিত্র ভাবার কারণ থাকবে কি ? নিশ্চয় না। একথা কাফির মুশরিকরাও জানে। জানে আমাদের জাতশত্রুইয়াহুদীরাও। এ কারণেই তারা (শত্রুরা) পথ চলেছে নিশ্ছিদ্র সতর্কতার সাথে। তারা যুগে যুগে মুসলমান খান্দানের বেশ কিছু উর্বর মস্তিষ্ক খরিদ করেছে। অতঃপর ইসলামের ঢিলাঢালা আলখাল্লা পরিয়ে ইসলাম চর্চা ইসলামের ইতিহাস পর্যালোচনা ও নেতৃত্বের নির্দেশনার সুরে এমন সব বাকোয়াছ করেছে, সাহিত্যের নৈপুণ্য ও উপস্থাপনার দৃঢ়তায় বাহ্যত ও 'অনিবার্য প্রেসক্রিপশন' মনে হলেও প্রকৃত অর্থে তা ছিল কুরআন হাদীস থেকে উন্মতকে সরিয়ে ফেলার সুগভীর চক্রান্ত। বিক্রিত এই চিহ্নিত গবেষক (?) মহল বরাবরই ইতিহাস চর্চার নামে তাদের বই পুস্তকে এমন কিছু প্রশ্ন ও জিজ্ঞাসা ছড়িয়ে দেয় প্রকৃত সত্য যাদের অজানা তারা সেসব প্রশ্নের জবাব খুঁজতে গিয়ে ইসলামের মহান ঐতিহ্য ও বরেণ্য পূর্বসূরীদের সম্পর্কে সহজেই অনাস্থার শিকার হয়ে পড়ে। অথচ সেই ঐতিহ্যই তার পথ চলার পাথেয় সেই মহান পূর্বসুরীগণই তার জীবনের নিঃস্বার্থ রাহনূমা-পথপ্রদর্শক। অধিকন্তু তাঁদের ঐকান্তিক ত্যাগ ও কুরবানীর বদৌলতেই আজ সারা বিশ্ব আলোকিত ইসলামের বিমল আলোয়। একই সাথে মুসলমানদের গৌরবোজ্জ্বল অতীতকে যে ইয়াহুদীরা চক্রান্তের দাবদাহে ভস্ম করে দিয়েছে কথিত এই গবেষকরা সুকৌশলে চেপে যায় এই 'গণিত' অধ্যায়টি । ফলে সরলমনা মুসলিম বন্ধুরা শিকার হন মহাভ্রান্তির। প্রকৃত সত্য সম্পর্কে অজ্ঞতার কারণে বীতশ্রদ্ধ হয়ে পড়েন সেই মহান কাফেলার প্রতি যাঁদের অকৃত্রিম উৎসর্গের বিনিময়ে আমরা আজ মুসলিম বলে গর্ববোধ করি।

তাই জানা দরকার-
আমাদের গোড়ার শত্রুকারা ?
কারা আমাদের গৌরবময় অতীতকে আত্মদ্বন্দ্বের যাঁতাকলে দলিত করেছে ?
কাদের ষড়যন্ত্রে আমরা লহুসিক্ত হয়েছি জঙ্গে জামালে, জঙ্গে সিফফীনে?
কাদের আঘাতে শহীদ হয়েছে সায়্যিদুনা হযরত উমর রাযি.?
সর্বশ্রেষ্ঠ মাযলূম শহীদ উসমান রাযি. কে হারালাম কোন পাপিষ্ঠদের হাতে ?
নবীজীর নয়নের মণি, হযরত ফাতিমার কলিজার টুকরা, মুসলিম উম্মাহ'র হৃদয়ের ধন সায়্যিদুনা হুসাইন রাযি. কে কারবালার প্রান্তরে নির্মমভাবে শহীদ করল কারা এবং কি ছিল এর প্রেক্ষাপট?

মূলত এ প্রশ্নগুলোর জবাব জানা এখন আমাদের জন্যে জরুরী হয়ে পড়েছে। আমাদের ঈমানকে রক্ষা করার স্বার্থে আমাদের সত্যিকার অতীতের আলোকে সার্থক ভবিষ্যত গড়ার স্বার্থে বক্ষ্যমাণ পুস্তকে আমরা এই প্রশ্নগুলোরই জবাব খুঁজতে চেষ্টা করেছি অত্যন্ত সতর্কতা, আন্তরিকতা, আমানতদারী ও বিশ্বস্ততার সাথে।

আল্লাহ ও তদীয় রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম যাদেরকে আমাদের শত্রু বলে চিহ্নিত করেছেন আমরাও নতুন করে তাদেরকেই ধরিয়ে দেবার চেষ্টা করেছি। বলতে

চেয়েছি আল্লাহ ও রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম যাদেরকে শত্রু বলেছেন তারা কোনদিনই আমাদের মিত্র ছিল না। আরও বলতে চেয়েছি তাদের শত্রুতার স্বরূপ কাহিনী।

সেই শত্রুরা এখনও আছে। আমাদের আশেপাশেই আছে। তাদের দোসররাও আছে। মানস সন্তানরাও আছে। এই শত্রুদের মুখোশ উন্মোচনে যদি সামান্যতমও সহায়ক হয় এই ক্ষুদ্র বইখানি তাহলেই আমরা আমাদের শ্রমকে সার্থক বলে মনে করব।

বইটির প্রথম সংস্করণ প্রকাশিত হওয়ার পরে অতি অল্প সময়েই তা সুধী মহলে ব্যাপক সাড়া জাগাতে সক্ষম হয় এবং অতি দ্রুত প্রথম সংস্করণ নিঃশেষ হয়ে যায়। পুনর্মুদ্রণের জন্য বিভিন্ন জায়গা থেকে অনুরোধ 'আসতে থাকা সত্ত্বেও নানা প্রতিবন্ধকতা আর ব্যস্ততার জন্য তাদের সে অনুরোধ রক্ষা করা সম্ভব হয়নি। পরিশেষে স্নেহভাজন মীযানুর রহমান কাসেমী বইটি নতুন আঙ্গিকে প্রকাশ করার উদ্যোগ নেয়ার অত্যন্ত খুশি হয়েছি। আল্লাহ পাক তাকে জাযায়ে খায়ের দান করুন এবং বইটিকে কবুল করুন। এখন পাঠকদের হাতে বইটির চতুর্থ সংস্করণ রয়েছে। এই সংস্করণের বৈশিষ্ট্য হচ্ছে কারবালার প্রকৃত ইতিহাস এতে তুলে ধরা হয়েছে। অনেকে এ সম্পর্কে সঠিক তথ্য অবগত না হওয়ার কারণে হযরত মুআবিয়া রা. কে এ ব্যাপারে দোষারোপ করে থাকেন, অনেকে আবার ইয়াযীদ সম্পর্কে বাড়াবাড়ি করে থাকেন। তাই কারবালার প্রকৃত ইতিহাস ও তথ্য এখানে তুলে ধরা হল। তাছাড়া সাহাবায়ে কিরামের মর্যাদা এবং তাদের মাপকাঠি হওয়ার ব্যাপারেও বিস্তারিত আলোকপাত করা হয়েছে যা পূর্ববর্তী সংস্করণগুলিতে ছিল না। আশা করি এর দ্বারা পাঠকবৃন্দ নিজেদের ঈমান আক্বীদা সম্পর্কে সচেতন হতে পারবেন। আল্লাহ পাক আমাদেরকে সহীহ বুঝ দান করুন। আমীন ।

মনসূরুল হক
জামিআ রাহমানিয়া মুহাম্মদপুর
২০ রবিউস সানী, ১৪২৯ হিঃ

প্রকাশকের কথা

ইসলামী ইতিহাসের দুই মহান সিপাহসালার হযরত উসমান গনী রাযি. এবং হযরত মুআবিয়া রাযি. একজন রাসূলে আকরাম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এর দুই সাহেবযাদীর জামাতা, খুলাফায়ে রাশেদীনের অন্যতম খলীফা, দুনিয়াতেই জান্নাতের সুসংবাদ প্রাপ্ত ব্যক্তিত্ব। অপরজন রাসূলে আকরাম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এর শ্যালক খাস দু'আ প্রাপ্ত ওহী লেখক এবং অকুতোভয় সিপাহসালার। একদিকে আটলান্টিক তীর অপর দিকে চীনের প্রাচীর পর্যন্ত বিজয় অভিযান পরিচালনা করে ইসলামের পতাকা উড্ডীন করেছিলেন। কিন্তু ইতিহাসের পাতায় তারা বড়ই মজলুম। সাবায়ী, রাফেজী আর খারেজীদের অপপ্রচারের স্বীকার তারা। সাবায়ীদের সুরে সুর মিলিয়ে আমাদের দেশেরও কিছু স্বঘোষিত তথাকথিত ইসলামী চিন্তাবিদ (?) ও শরীক হয়েছেন সেই অপপ্রচারে।

তাদের সেই অপপ্রচারে বিভ্রান্ত হয়ে ইসলামী ইতিহাস বিস্মৃত সরলমনা অনেক মুসলমান উক্ত মহান সাহাবীদ্বয়ের রাযি. প্রতি পোষণ করছেন এমন কিছু খেয়াল যা ঈমান বিধ্বংসী বটে। তাই নিজ নিজ ঈমানের হেফাযতের জন্য এই সাহাবীদ্বয় রাযি. সম্পর্কে দিল পরিষ্কার রাখা একান্তই জরুরী। আর সেজন্য জানা দরকার তাদের 'আসল ইতিহাস।

হযরত মুফতী সাহেব দা. বা. অনেক মেহনত করে সেই 'আসল ইতিহাসকে তুলে ধরেছেন জাতির সামনে। ইসলামী খেলাফত ধ্বংসের জন্য প্রকৃত দায়ী কারা? হযরত উসমান রাযি. এবং হযরত মুআবিয়া রাযি. সম্পর্কে যে অপবাদ আরোপ করা হয় তার বাস্তবতাই বা কতটুকু ? এসব নিয়ে তিনি চুলচেরা বিশ্লেষণ করেছেন আলোচ্য গ্রন্থে। নিজের ঈমানের হেফাযতের জন্য এর এক কপি সকল মুসলমানের নিকট থাকা জরুরী। বইটির কয়েকটি মুদ্রণ অতি দ্রুত শেষ হয়ে যাওয়ার পর বর্তমানে চতুর্থ সংস্করণ পাঠকদের হাতে তুলে দিতে পারছি।

এই সংস্করণের বৈশিষ্ট্য হলো এতে কারবালার প্রকৃত ইতিহাস তুলে ধরা হয়েছে এবং সাহাবায়ে কিরামের মর্যাদা সম্পর্কে একটি গুরুত্বপূর্ণ আলোচনা সন্নিবেশিত হয়েছে। আশা করি এর দ্বারা পাঠকবৃন্দ আরো বেশি উপকৃত হতে পারবেন। আল্লাহ পাক আমাদের এই মেহনতকে কবুল করুন।

বিনীত
মীযানুর রহমান কাসেমী

www.islamijindegi.com

প্রথম অধ্যায়

যুগে যুগে ইয়াহুদী-খৃষ্টচক্রের ষড়যন্ত্র

আল্লাহ তা'আলা ইরশাদ করেনঃ

وَلَن تَرْضَىٰ عَنكَ الْيَهُودُ وَلَا النَّصَارَىٰ حَتَّىٰ تَتَّبِعَ مِلَّتَهُمْ ۗ قُلْ إِنَّ هُدَى اللَّهِ هُوَ الْهُدَىٰ ۗ وَلَئِنِ اتَّبَعْتَ أَهْوَاءَهُم بَعْدَ الَّذِي جَاءَكَ مِنَ الْعِلْمِ ۙ مَا لَكَ مِنَ اللَّهِ مِن وَلِيٍّ وَلَا نَصِيرٍ ﴿١٢٠﴾

অর্থঃ (হে নবী!) ইয়াহুদী ও খৃষ্টানরা কখনোই আপনার প্রতি সন্তুষ্ট হবে না, যতক্ষণ না (খোদা না করুন) আপনি তাদের ধর্মের (পরিপূর্ণ) অনুগত হয়ে যান। (অর্থাৎ আপনি ইয়াহুদী অথবা খৃষ্টান না হওয়া পর্যন্ত তারা আপনার কথা মানবে না।) আপনি বলে দিন আল্লাহু পাক যে পথ প্রদর্শন করেছেন তা প্রকৃত হিদায়াতের পথ। যদি আপনি তাদের আকাঙ্খাসমূহ পূরণে তৎপর হন ওহীর ঐ অকাট্য জ্ঞান লাভের পর-যা আপনার কাছে পৌঁছেছে তবে আল্লাহ থেকে (অর্থাৎ তাঁর হাত থেকে) আপনাকে উদ্ধারকারী ও সাহায্যকারী কেউ থাকবে না। (সূরাহ্ বাক্বারাঃ ১২০)

উল্লেখিত আয়াতে মহান আল্লাহ রাব্বুল আলামীন তাঁর নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম কে স্পষ্টভাবে জানিয়ে দিয়েছেন যে, মুসলমানরা যতদিন পর্যন্ত তাদের প্রভু প্রদত্ত দীন-ইসলামকে পরিত্যাগ করে ইয়াহুদী খৃষ্টানদের ধর্ম গ্রহণ না করবে ততদিন পর্যন্ত ইয়াহুদী ও খৃষ্টানরা মুসলমানদের প্রতি সদ্ভাব পোষণকারী হবে না। এমনকি আল্লাহুর নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এর বেলায়ও তাদের এ মানসিকতা প্রকটভাবে বিদ্যমান ছিল। তাদের আন্তরিক কামনা ও লক্ষ্য একটিই। আর তা হচ্ছে এই যে, সমগ্র মুসলিম জাতি ইয়াহুদী বা খৃষ্টান ধর্ম গ্রহণ করুক আর দুনিয়াতে ইসলামের নাম-নিশানা পর্যন্ত বাকী না থাকুক। এ কারণে ইসলামের সূচনা লগ্ন থেকে তারা ইসলাম ও মুসলমানদের বিরুদ্ধে শুধু ষড়যন্ত্র করেই 'আসছে।

মহানবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এর মদীনায় হিজরতের পূর্বে মদীনা প্রধানতঃ আওস ও খাযরাজ গোত্রীয় মুশরিক আর ইয়াহুদী ও নাসারাদের আবাসস্থল ছিল। নবীজীর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম মদীনায় আগমনের পূর্বেই আওস ও খাযরাজ গোত্রের কাফির মুশরিকদের মধ্য হতে অনেকে হজ্জের মওসুমে মক্কাতে নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এর দাওয়াত কবুল করে ইসলামের সুশীতল ছায়া তলে আশ্রয় গ্রহণ করেছিল।

পক্ষান্তরে ইয়াহুদী ও খৃষ্টানরা শুধুমাত্র হিংসা ও বিদ্বেষের বশবর্তী হয়ে ইসলাম গ্রহণ করা হতে কেবল বিরতই থাকেনি বরং ইসলাম ও মুসলমানদের ক্ষতি সাধনে সর্বদাই তারা নানা ফন্দি ফিকির আটতে থাকে। অথচ মজার ব্যাপার হচ্ছে এই যে, রাসূলে আকরাম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এর আবির্ভাবের কিছুকাল পূর্বেও এই ইয়াহুদী খৃষ্টানরা আওস ও খযরাজ গোত্রের হাতে বার বার প্রহৃত হওয়ার পরিণতিতে

তাদেরকে ভীতি প্রদর্শন ও নিজেদের আত্মতৃপ্তি লাভের উদ্দেশ্যে তাদের 'আসমানী কিতাবের ভবিষ্যদ্বাণীর আলোকে এ কথাই বলতো যে অতিসত্বর এই ভূমিতে খাতামুন নাবিয়্যীন অর্থাৎ আখিরী নবীর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম আবির্ভাব ঘটবে। আমরা তখন তাঁর দীন কবুল করে তাঁর নেতৃত্বে যুদ্ধ করে তোমাদের পরাজিত করবো। কারণ তাদের ধর্মীয় গ্রন্থ তাওরাত ও ইঞ্জিলে নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এর আবির্ভাবের সময় ও স্থানসহ তার পূর্ণ পরিচয় লিপিবদ্ধ ছিল।

নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এর মদীনায় আগমনের পর ইয়াহুদী খৃষ্টানদের ইসলাম কবুল না করা সত্ত্বেও শান্তি ও সহাবস্থানের লক্ষ্যে মহানবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তাদের বিরুদ্ধে কোন ব্যবস্থা গ্রহণ না করে তাদের সঙ্গে সন্ধি চুক্তি স্থাপন করেন। হুজুর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম যাদের সঙ্গে সন্ধি চুক্তি স্থাপন করে ছিলেন তাদের মধ্যে বিশেষভাবে তিনটি ইয়াহুদী গোত্র ছিল উল্লেখযোগ্য যথাক্রমে বুন ক্বাইনুক্বা, বনু নজীর ও বনু কুরাইজা। মহানবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ও তাঁর সাহাবীগণ রাযি. উল্লেখিত চুক্তির সকল শর্তাবলী যথাযথভাবে পালন করতে থাকেন । কিন্তু ইয়াহুদী-খৃষ্টান জাতি তাদের গোঁয়ার্তুমি ও হঠকারিতার কলঙ্কিত ঐতিহ্য ও মজ্জাগত বদ স্বভাবের পরিচয় দিয়ে নানাভাবে চুক্তির বরখেলাপ করে জঘন্যতম কর্মকাণ্ড ঘটাতে থাকে। এক দিকে বিপুলসংখ্যক ইয়াহুদী প্রকাশ্যে ইসলাম কবুল করে ছদ্ম-বেশে মুনাফিকরূপে মুসলমানদের মাঝে অনুপ্রবেশ করতঃ ইসলামের মূলে কুঠারাঘাত করতে তৎপর হয়।

অপরদিকে প্রকাশ্যে ইসলামের বিরোধিতাকারী ইয়াহুদীরা মক্কার মূর্তিপূজক কাফির মুশরিকদের সঙ্গে মিলিত হয়ে মুসলমানদের বিরুদ্ধে নানারকম ষড়যন্ত্রে লিপ্ত হয়। তাদের অপকর্মসমূহের কতিপয় দৃষ্টান্ত নিম্নরূপঃ

দৃষ্টান্ত -১: একবার এক আরব্য রমণী বনু ক্বাইনুক্বার বাজারে গেলে এক দোকানদার দুষ্টামির ছলে তার কাপড় খুলে উলঙ্গ করে দেয় এবং তাকে নিয়ে খুব হাসি ঠাট্টা করে। সেই মহিলার চিৎকার শুনে এক আরব্য ব্যক্তি এগিয়ে আসে এবং দোকানদারকে হত্যা করে ফেলে। তখন অন্যান্য ইয়াহুদীরা জড়ো হয় এবং উক্ত ঘটনাকে কেন্দ্র করে আরব ও ইয়াহুদীদের মধ্যে তুমুল লড়াই শুরু হয়ে যায়। ঘটনাটি অবহিত হয়ে মহানবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম সেখানে তাশরীফ আনেন এবং বিবাদকারীদের তিরষ্কার করেন। এতে বনু ক্বাইনুক্বার লোকেরা ক্ষিপ্ত হয়ে মুসলমানদের বলতে লাগলো যে তোমরা বদর যুদ্ধের বিজয়ে বেশী গর্ব করো না। কারণ তারা (কুরাইশরা) তোমাদের সমগোত্রীয় ছিল, তারা যুদ্ধ করতে শিখেনি। ফলে তোমাদের বিজয় সম্ভব হয়েছে। তবে আমাদের সঙ্গে যুদ্ধ করলে বুঝতে পারবে যোদ্ধা কাকে বলে। এরূপ দম্ভোক্তি করে তারা ইতিপূর্বে তাদের সঙ্গে সম্পাদিত সন্ধি চুক্তি ভঙ্গের ঘোষণা দেয়। তখন মহানবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তাদের প্রতিরোধ পাল্টা আক্রমণের সিদ্ধান্ত নেন। পনের দিন পর্যন্ত তাদের অবরোধ করে রাখা হয়

অতঃপর তাদের মনোবল ভেঙ্গে পড়ে। অবশেষে তারা মহানবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এর যে কোন সিদ্ধান্তের প্রতি নিঃশর্ত সম্মতি জ্ঞাপনে বাধ্য হয়। সুতরাং উক্ত ইয়াহুদী গোত্রকে মদীনা হতে বহিষ্কার করা হয়।

দৃষ্টান্ত-২: ইয়াহুদী গোত্র বনু নজীরের সাথে অপর এক আরব্য গোত্রের বিরোধ হলে, এর মীমাংসা করতে মহানবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ক'জন শীর্ষস্থানীয় সাহাবীকে রাযি. সঙ্গে নিয়ে বনু নজীরের এলাকায় গমন করেন। বাহ্যতঃ তারা তখন আন্তরিকতা ও আতিথেয়তার মনোভাব প্রদর্শন করে হুজুর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম কে সসম্মানে একটি দেয়ালের নিকট বসতে দেয় কিন্তু ভিতরে ভিতরে তারা দেয়ালের উপর হতে বৃহৎ প্রস্তর খণ্ড নিক্ষেপ করতঃ হুজুর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম কে শহীদ করে দেয়ার পরিকল্পনা গ্রহণ করে। পাষণ্ড আমর বিন হাজ্জাশ এই জঘন্য কাজের জন্য প্রস্তুত হয়ে দেয়ালের উপর অবস্থান নেয়। হুজুর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ওহীর মাধ্যমে তাদের এই ষড়যন্ত্র সম্পর্কে অবগত হয়ে নিঃশব্দে তথা হতে উঠে আসেন। এই ঘটনার পর তিনি বনু নজীরকে দশ দিনের মধ্যে মদীনা ত্যাগ করার নির্দেশ দেন। এ সময় সীমা অতিক্রান্ত হওয়ার পর মদীনায় তাদের যে কোন ব্যক্তিকে পাওয়া গেলে তাকে হত্যা করা হবে বলে সাথে সাথে জানিয়ে দেন। মহানবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এর নির্দেশ পেয়ে বনু নজীর মদীনা ত্যাগের জন্য তৈরী হয়ে যায়। কিন্তু মুনাফিক নেতা আবদুল্লাহ বিন উবাইয়ের প্ররোচনায় ও তার পক্ষ হতে সাহায্যের আশ্বাস পেয়ে তারা হুজুর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এর নিক এই উত্তর পাঠায় যে, আমরা কোন ক্রমেই মদীনা ত্যাগ করবো না। আপনার যা ইচ্ছা করতে পারেন। তখন মহানবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম যুদ্ধ ঘোষণা করে তাদেরকেও মদীনা ত্যাগে বাধ্য করেন। অতঃপর তারা দেশান্তরিত হয়ে খাইবার নামক স্থানে গিয়ে বসবাস শুরু করে।

দৃষ্টান্ত-৩: পঞ্চম হিজরীর ঘটনা। এবার ইয়াহুদীরা মুসলমানদেরকে সমূলে শেষ করে দিতে সর্বাত্মক প্রস্তুতি গ্রহণ করে। নেতৃস্থানীয় ক'জন ইয়াহুদী আরবের অন্যান্য সকল কাফির গোত্রের সঙ্গে যোগাযোগ করে মক্কার কুরাইশ, বনু সালীম, বনু গাতফান, বনু আসাদ, আশজা, ফাযারাহ, বনু মুররাহ এ সকল গোত্রের কাফিরদের সমন্বয়ে বহুজাতিক বাহিনী গঠন করতঃ সকলে এক সঙ্গে মদীনা আক্রমণ করার পরিকল্পনা আটে। পরিকল্পনা মুতাবিক তাদের দশ হাজার সৈন্যর বিশাল বাহিনী মুসলমানদের উপর যুগপৎ আক্রমণ চালায়। হুজুর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তখন সকল সাহাবায়ে কিরাম রাযি. কে সঙ্গে নিয়ে কাফিরদের আক্রমণ প্রতিহত করতে মদীনার চতুর্পার্শ্বে পরিখা খননে লিপ্ত হন। মদীনায় তখন কেবল নারী ও শিশুরা ছিল। এরই মধ্যে মদীনায় অবস্থানকারী ইয়াহুদীদের তৃতীয় গোত্র বনু কুরাইজাহ মহানবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এর সঙ্গে সম্পাদিত সন্ধিচুক্তি ভঙ্গের ঘোষণা দিয়ে কাফিরদের সাথে সংঘটিত যুদ্ধের চরম মূহুর্তে মুসলমানদের সাথে বিশ্বাসঘাতকতা করে। মহানবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তখন এক দল সাহাবী রাযি. কে

মদীনায় নারী ও শিশুদের দেখা-শুনার দায়িত্বে নিয়োজিত থাকতে নির্দেশ দেন। তথাপি খন্দক প্রান্তরে যুদ্ধরত মুসলমানগণ সর্বদাই নিজ নিজ পরিবার পরিজনের উপর বনু কুরাইজার ইয়াহুদীদের আক্রমণের আশংকার উদ্বিগ্ন ছিলেন। দীর্ঘ এক মাস পর্যন্ত কাফির বাহিনী মদীনা অবরোধ করে রাখে, কিন্তু সমর বিশেষজ্ঞ সাহাবী হযরত সালমান ফার্সী রাযি. এর পরামর্শ মুতাবিক খন্দক বা পরিখা খনন করে রাখায় কাফিরদের পক্ষে তা অতিক্রম করে মদীনায় প্রবেশ করা সম্ভব হয়নি। অবশেষে আল্লাহর গজবে পতিত হয়ে শত্রুদল বিচ্ছিন্ন হয়ে পড়ে এবং কাফিররা মদীনা ছেড়ে যেতে বাধ্য হয়। আল্লাহ তা'আলার বিশেষ রহমত ও সাহায্যে মুসলমানরা এই যুদ্ধে বিজয় লাভ করে। ইসলামের ইতিহাসে তা খন্দক যুদ্ধ নামে পরিচিত। খন্দক যুদ্ধ হতে মদীনা প্রত্যাবর্তন করে কোনরূপ বিশ্রাম গ্রহণের পূর্বেই হযরত জিবরাইল আ. আল্লাহ তা'আলার পক্ষ হতে বনু কুরাইজার বিশ্বাসঘাতকতার শাস্তির বিধান নিয়ে অবতীর্ণ হন। হুজুর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম সাহাবায়ে কিরাম রাযি. কে সেদিন 'আসরের নামাযের পূর্বেই বনু কুরাইজার এলাকায় পৌছার নির্দেশ দেন। বনু কুরাইজাহ তখন তাদের নির্মিত দূর্গে আশ্রয় গ্রহণ করে। পঁচিশ দিন পর্যন্ত দুর্গ অবরোধ করে রাখা হয়। এই দীর্ঘ অবরোধে তারা মনোবল হারিয়ে ফেলে।

তখন তাদের নেতা কাব বিন আসাদ বললো এখন মুক্তির পথ এইটাই যে তোমরা ইসলাম গ্রহণ করে মুসলমান হয়ে যাও। কেননা, তোমাদের সকলেরই জানা আছে যে, মুহাম্মদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম সত্য নবী। যদি এ পথ তোমাদের নিকট পছন্দনীয় না হয় তাহলে সবাই স্বীয় স্ত্রী ও সন্তানদের হত্যা করে জীবনের মায়া ত্যাগ করে চূড়ান্ত যুদ্ধে ঝাঁপিয়ে পড়ে হয় বিজয় অর্জন কর নতুবা সকলেই আত্মাহুতি দাও। আর যদি তোমাদের পক্ষে তাও সম্ভব না হয় তাহলে তোমাদের ধর্মীয় বিধান লঙ্ঘন করে পবিত্র শনিবারে অতর্কিত হামলা কর। কেননা এদিন মুসলমানগণ এ বিশ্বাসে অপ্রস্তুত থাকবে যে, আমরা শনিবারের পবিত্রতা রক্ষার্থে এদিন যুদ্ধ করবো না। বনু কুরাইজার লোকেরা কাব বিন আসাদের প্রস্তাবিত কোন পন্থাই গ্রহণ না করে হযরত আবু লুবাবা রাযি. এর সঙ্গে পরামর্শ করতঃ বিনা শর্তে আত্মসমর্পণ করে। আওস গোত্রের সঙ্গে বনু কুরাইজার মিত্রতা থাকায় মহানবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বনু কুরাইজার ব্যাপারে যে কোন সিদ্ধান্ত গ্রহণের ক্ষমতা আওসের লৌহ পুরুষ, বিশিষ্ট সাহাবী হযরত সা'আদ বিন মু'আয রাযি. এর হাতে অর্পণ করলেন। বনু কুরাইজার কৃত অপরাধের উচিৎ শাস্তি স্বরূপ তিনি তাদের যুদ্ধক্ষম সকল পুরুষকে হত্যা এবং নারী ও শিশুদের বন্দী করার সিদ্ধান্ত দেন। তারই সিদ্ধান্ত মুতাবিক বনু কুরাইজার নেতা কাব বনু নজীর নেতা হুয়াই বিন আখতাবসহ ছয় শতাধিক যুদ্ধাপরাধী বন্দীর মৃত্যুদণ্ড কার্যকর করা হয়।

দৃষ্টান্ত-৪: বনু নজীরকে খাইবারে বহিস্কার করার পর খাইবার নতুন করে ষড়যন্ত্রকারীদের আখড়ায় পরিণত হয়। এখানে বসে বসে ইয়াহুদী ও ইসলাম বিদ্বেষীরা মুসলমানদের বিরুদ্ধে নানারকম ষড়যন্ত্র করতো। বনু নজীর নেতা হুয়াই

বিন আখতাব খন্দক যুদ্ধের সময় খাইবার হতে মদীনায় গিয়ে তথায় অবস্থানকারী বনু কুরাইজাকে বিশ্বাসঘাতকতায় প্ররোচিত করে। এ কারণে মহানবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম আল্লাহ তা'আলার পক্ষ হতে নির্দেশ প্রাপ্ত হয়ে সপ্তম হিজরীতে খাইবার অভিযান পরিচালনা করেন। অষ্ট দূর্গে পরিবেষ্টিত খাইবার ইয়াহুদীদের অত্যন্ত শক্তিশালী ঘাটি ছিল। এখানে শত্রু পক্ষের কিছু শক্তিশালী যোদ্ধারও অবস্থান ছিল। তাই এ যুদ্ধ জয় করতে মহানবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ও সাহাবায়ে কিরামকে রাযি. কঠোর পরিশ্রম ও চরম ত্যাগ স্বীকার করতে হয়েছে। যুদ্ধ শুরু হওয়ার পর যখন পাঁচটি দুর্গ বিজিত হয় তখন ইয়াহুদীরা আত্মরক্ষার নিমিত্তে শেষ চেষ্টা স্বরূপ অবশিষ্ট তিন দুর্গে আশ্রয় নেয়। মহানবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম সাহাবায়ে কিরাম রাযি. কে নিয়ে সেগুলো অবরোধ করে রাখেন।

দীর্ঘ চৌদ্দ দিন অতিবাহিত হওয়ার পরও যখন ইয়াহুদীরা রণক্ষেত্রে অবতীর্ণ হচ্ছিল না তখন মহানবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম 'মিনজানিক' নামক হস্তচালিত বৃহৎপ্রস্তর নিক্ষেপক কামান মোতায়েন করে দুর্গ ভাঙ্গার পরিকল্পনা গ্রহণ করেন। অবস্থা বেগতিক দেখে ইয়াহুদীরা আলোচনার অনুমতি প্রার্থনা করে দূত প্রেরণ করে, মহানবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এতে সম্মত হন। অতঃপর আলোচনায় এ সিদ্ধান্ত হলো যে দুর্গে অবস্থানকারী সকলকে মুক্তি দেয়া হবে। তবে সঙ্গে কোন প্রকার সম্পদ ও যুদ্ধাস্ত্র নিয়ে যেতে পারবে না। পরিহিত কাপড় ব্যতীত অন্য কোন ব্যবহার্য জিনিস পত্রও সাথে করে নিতে পারবে না। মহানবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এর পক্ষ থেকে ঘোষণা করে দেয়া হয় কেউ কোন কিছু গোপন করলে তার জানের নিরাপত্তা বহাল থাকবে না। সে মুতাবিক সম্পদ লুকানোর অভিযোগ প্রমাণিত হওয়ার পর দু'জনকে মৃত্যু দণ্ডাদেশ দেয়া হয়।

দৃষ্টান্ত-৫: মহানবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম কে বিষ প্রয়োগে হত্যার জঘন্য ষড়যন্ত্রঃ খাইবার যুদ্ধের পরের ঘটনা। যুদ্ধশেষে স্থিতিশীল অবস্থা ফিরে আসার পর এক ইয়াহুদী মহিলা একটি ছাগল রান্না করে মহানবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এর দরবারে তা হাদিয়া হিসেবে পেশ করল। তাতে সে বিষ মিশিয়ে দিয়েছিল। হুজুর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তা হতে এক টুকরা গোস্ত উঠিয়ে মুখে দিলে গোশতের টুকরাটিই বলে দিল যে, তাতে বিষ প্রয়োগ করা হয়েছে। কোন কোন বর্ণনা অনুযায়ী জানা যায় যে, হযরত জিবরাঈল আ. এসে মহানবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম কে বিষ প্রয়োগের কথা জানিয়ে ছিলেন তখন হুজুর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম গোশতের টুকরাটি মুখ থেকে ফেলে দেন। কিন্তু ইতিমধ্যেই একজন সাহাবী রাযি. বিষ প্রয়োগের কথা না জেনে ঐ বিশ মিশ্রিত গোস্ত ভক্ষণ করে ইন্তিকাল করেন। এ ঘটনার পর মহানবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম উক্ত মহিলাকে ডেকে বিষ প্রয়োগের কথা জিজ্ঞেস করলে সে উত্তর দিল আমি এ জন্য বিষ মিশ্রিত করেছি যে, আপনি যদি সত্য নবী হয়ে থাকেন তাহলে আপনাকে ওহীর মাধ্যমে জানিয়ে দেয়া হবে। আর যদি আপনি মিথ্যা নবী হয়ে থাকেন তাহলে আমরা আপনার হাত থেকে মুক্তি পাবো।

ইমাম যুহুরী রহ. বর্ণনা করেন যে, উক্ত মহিলা মহানবীর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এই মু'জিযা প্রত্যক্ষ করে মুসলমান হয়ে গেল। অতঃপর হুজুর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তাকে ক্ষমা ও মুক্ত করে দেন। কিন্তু অন্য বর্ণনা মতে জানা যায় যে, মহানবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম উক্ত সাহাবীর রাযি. ইন্তিকালের ঘটনার পর উক্ত মহিলাকে কিসাস স্বরূপ হত্যার নির্দেশ দেন। খাইবারের এই বিষ প্রয়োগের ঘটনার তিন বছর পর যখন মহানবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম মৃত্যু যাতনায় ভুগছিলেন, তখন তিনি এই বলছিলেন যে, "খাইবারের বিষ ক্রিয়াই এখন আমার মধ্যে দেখা দিয়েছে।" এজন্য ইমাম যুহরী রহ. বলেন যে, মহানবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম শাহাদাতের মৃত্যু লাভ করেছেন।

দৃষ্টান্ত-৬: একবার লাবীদ ইবনে আ'সাম নামীয় এক ইয়াহুদী হুজুর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম কে যাদু করল। ঘটনার বিবরণ এই যে, জনৈক বালক মহানবীর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম কাজ কর্ম করত। ইয়াহুদী তার মাধ্যমে রাসূলুল্লাহর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ব্যবহার করা চিরুনি হস্তগত করে একটি তাঁতের সুতোয় এগারটি গ্রন্থি লাগিয়ে প্রত্যেক গ্রন্থিতে একটি করে সুই সংযুক্ত করে উক্ত চিরনিসহ সেই গ্রন্থিযুক্ত সুতাটি খেজুরে আবরণীতে রেখে তা একটি পরিত্যক্ত কূপে প্রস্তর খণ্ডের নীচে চাপা দিয়ে রাখল। এই যাদুর প্রভাবে মহানবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম অসুস্থ হয়ে পড়েন এবং দীর্ঘ ছ'মাস দারুণ কষ্টে ভোগেন। হযরত আয়িশার রাযি. বর্ণনা মতে, এই যাদুর প্রভাবে হুজুর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম মাঝে মাঝে দিশেহারা হয়ে পড়তেন এবং যে কাজটি করেননি, তাও করেছেন বলে অনুভব করতেন।

অতঃপর স্বপ্নে দু'জন ফেরেশতার কথোপকথন শুনে লাবীদের যাদু ও যাদুতে ব্যবহৃত বস্তু সমূহের গোপন কূপের সন্ধান অবগত হয়ে তিনি ঘুম হতে উঠে তথায় গমন করেন এবং কূপ হতে সেগুলো উঠিয়ে আনেন। আল্লাহ পাক সূরাহ ফালাক ও সূরাহ নাসের এগারটি আয়াত নাযিল করেন। হুজুর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম যাদুর সুতার এগারটি গ্রন্থির প্রত্যেকটিতে এক এক আয়াত পাঠ করে তা খুলতে লাগলেন। গ্রন্থিগুলো খোলা সমাপ্ত হওয়ার সাথে সাথেই হুজুর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম সম্পূর্ণ সুস্থ হয়ে শয্যা ত্যাগ করে এবং অনুভব করলেন যেন নিজের উপর থেকে একটা বোঝা সরে গেল।

এই হচ্ছে মহানবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম, ইসলাম ও মুসলমানদের বিরুদ্ধে ইয়াহুদী-খৃষ্টান জাতি কর্তৃক পরিচালিত ধ্বংসাত্মক ষড়যন্ত্রসমূহের ক'টি সংক্ষিপ্ত উদাহরণ।

ইসলামের প্রাথমিক যুগে ইসলাম ও মুসলমানদের বিরুদ্ধে ইয়াহুদী-খৃষ্টানরা এভাবে নানা রকম ষড়যন্ত্র, চক্রান্ত ও ধ্বংসাত্মক কার্যকলাপ ঘটাতে থাকে। উদ্দেশ্যে ছিল ইসলাম ও মুসলমানদের ধ্বংস করে নিজেদের ধর্মকে সুপ্রতিষ্ঠিত করা। ইয়াহুদী

খৃষ্টানদের সেই ষড়যন্ত্রের ধারা এখনো অব্যাহত আছে পুরোদমে আর তা থাকবে হয়তো আগামীতেও, কিন্তু এ ব্যাপারে এখন করণীয় কী-তা আমাদের নির্ণয় করতে হবে।

ইসলাম বিদ্বেষীদের ষড়যন্ত্র ও রাসূলে আকরাম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এর ভূমিকা

আমাদেরকে বিশেষভাবে স্মরণ রাখতে হবে যে, ইয়াহুদী, খৃষ্টান ও ইসলাম বিদ্বেষীদের সকল ষড়যন্ত্রের মুখে মহানবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম হাল ছেড়ে বসে থাকেননি এবং নীরবে নিশ্চুপ থেকে তা হজম করেও নেননি। বরং তাদের প্রতিটি ষড়যন্ত্রের বিরুদ্ধে যথাসময়ে কঠোর ও যথোপযুক্ত ব্যবস্থা গ্রহণ করে তাদের সকল ষড়যন্ত্র ও কু-মতলবকে গুড়িয়ে দিয়েছেন এবং তাদেরকে শাস্তিও প্রদান করেছেন। তাই মুসলিম বিশ্বের বর্তমান বিপদ সংকুল মুহূর্তে আজ আমাদেরও উজ্জীবিত হতে হবে মহানবীর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম সেই জিহাদি প্রেরণায়। রাসূলের সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম সুন্নতী পথ ধরে চলতে হবে ইয়াহুদী, খৃষ্টান, কাফির, নাস্তিক ও বেদীনের মুকাবিলায় । তাহলেই আমরা সক্ষম হবো ইয়াহুদী-খৃষ্টানচক্র ও ইসলাম বিদ্বেষীদের সকল ষড়যন্ত্রের ভিত উপড়ে ফেলতে।

ইতিপূর্বে মহানবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এর যুগে ইসলাম ও মুসলমানদের বিরুদ্ধে ইয়াহুদী-খৃষ্টানদের ষড়যন্ত্রসমূহের কতিপয় দৃষ্টান্ত পেশ করা হয়েছে। এখন মুসলমানের ছদ্মবেশী মুনাফিকরূপী ইয়াহুদী ও খৃষ্টানরা ইসলাম ও মুসলমানদের বিরুদ্ধে যে সব কূটকৌশল অবলম্বন করতো, তার কতিপয় দৃষ্টান্ত পেশ করা হচ্ছে।

মুনাফিক হচ্ছে যারা বাহ্যতঃ ইসলাম গ্রহণ করেছিল কিন্তু আন্তরিকভাবে তারা মুমিন ছিল না। বরং তাদের অন্তর ছিল ইসলাম ও মুসলমানদের প্রতি হিংসা ও বিদ্বেষে পরিপূর্ণ। এরা মুসলমানদের বিভিন্ন ধরনের ক্ষতি করার পাশাপাশি কাফির ও শত্রুদের নিকট মুসলমানদের সব রকম গোপন তথ্য পাচারের চেষ্টায় লিপ্ত থাকতো। আল্লাহ পাক পবিত্র কুরআনে এদের সম্পর্কে ইরশাদ করেছেন-

وَمِنَ النَّاسِ مَن يَقُولُ آمَنَّا بِاللَّـهِ وَبِالْيَوْمِ الْآخِرِ وَمَا هُم بِمُؤْمِنِينَ ﴿٨﴾ يُخَادِعُونَ اللَّـهَ وَالَّذِينَ آمَنُوا وَمَا يَخْدَعُونَ إِلَّا أَنفُسَهُمْ وَمَا يَشْعُرُونَ ﴿٩﴾ فِي قُلُوبِهِم مَّرَضٌ فَزَادَهُمُ اللَّـهُ مَرَضًا ۖ وَلَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ بِمَا كَانُوا يَكْذِبُونَ ﴿١٠﴾ وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ لَا تُفْسِدُوا فِي الْأَرْضِ قَالُوا إِنَّمَا نَحْنُ مُصْلِحُونَ ﴿١١﴾ أَلَا إِنَّهُمْ هُمُ الْمُفْسِدُونَ وَلَـٰكِن لَّا يَشْعُرُونَ ﴿١٢﴾ وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ آمِنُوا كَمَا آمَنَ النَّاسُ قَالُوا أَنُؤْمِنُ كَمَا آمَنَ السُّفَهَاءُ ۗ أَلَا إِنَّهُمْ هُمُ السُّفَهَاءُ وَلَـٰكِن لَّا يَعْلَمُونَ ﴿١٣﴾ وَإِذَا لَقُوا الَّذِينَ آمَنُوا قَالُوا آمَنَّا وَإِذَا خَلَوْا إِلَىٰ شَيَاطِينِهِمْ قَالُوا إِنَّا مَعَكُمْ إِنَّمَا نَحْنُ مُسْتَهْزِئُونَ ﴿١٤﴾ اللَّـهُ يَسْتَهْزِئُ بِهِمْ وَيَمُدُّهُمْ فِي طُغْيَانِهِمْ يَعْمَهُونَ ﴿١٥﴾

অর্থঃ মানুষের মধ্যে কিছু লোক এমন রয়েছে, যারা বলে-আমরা আল্লাহ ও পরকালের প্রতি ঈমান এনেছি অথচ আদৌ তারা ঈমানদার নয়। মূলতঃ তারা (এরূপ কথা বলে) আল্লাহ এবং ঈমানদারগণকে ধোঁকা দিচ্ছে। অথচ এতে তারা নিজেরাই শুধু ধোঁকা খাচ্ছে। কিন্তু তারা তা উপলব্ধিও করতে পারছে না। তাদের অন্তঃকরণ ব্যাধিগ্রস্ত। আর আল্লাহপাক তাদের ব্যাধি আরও বৃদ্ধি করে দিয়েছেন। বস্তুতঃ তাদের এ মিথ্যাচারের দরুন তাদের জন্য নির্ধারিত রয়েছে ভয়াবহ আযাব। আর যখন তাদেরকে বলা হয় যে, দুনিয়ার বুকে দাঙ্গা-হাঙ্গামা সৃষ্টি করো না তখন তারা বলে আমরা তো মীমাংসার পথ অবলম্বন করেছি। মনে রেখো তারাই হাঙ্গামা সৃষ্টিকারী । কিন্তু তারা তা উপলব্ধি করে না। আর যখন তাদেরকে বলা হয় সাহাবীগণ রাযি. যেভাবে ঈমান এনেছে তোমরাও সেভাবে ঈমান আন তখন তারা বলে আমরা কি ঈমান আনবো বোকাদের মত ? মনে রেখো প্রকৃতপক্ষে তারাই বোকা। কিন্তু তারা তা বোঝে না। আর তারা যখন ইমানদারদের সাথে মিলিত হয় তখন বলে আমরা ঈমান এনেছি। আবার যখন তাদের শয়তানদের সাথে একান্ত সাক্ষাতে মিলিত হয় তখন বলে, আমরা তোমাদেরই সাথে রয়েছি। আমরা তো (মুসলমানদের সাথে) উপহাস করি মাত্র। আল্লাহ পাক তাদের এ উপহাসের সমুচিত শাস্তি দিবেন। তবে (দুনিয়াতে) তাদেরকে তিনি ছেড়ে দিয়েছেন যেন তারা নিজেদের অহংকার ও কুমতলবে আরো মাতোয়ারা ও হয়রান পেরেশান হতে থাকে। (সূরাহ বাকারাহ-৮-১৫)

অন্যত্র আল্লাহ পাক ইরশাদ করেন-

إِنَّ الْمُنَافِقِينَ يُخَادِعُونَ اللَّـهَ وَهُوَ خَادِعُهُمْ وَإِذَا قَامُوا إِلَى الصَّلَاةِ قَامُوا كُسَالَىٰ يُرَاءُونَ النَّاسَ وَلَا يَذْكُرُونَ اللَّـهَ إِلَّا قَلِيلًا ﴿١٤٢﴾ مُذَبْذَبِينَ بَيْنَ ذَٰلِكَ لَا إِلَىٰ هَـٰؤُلَاءِ وَلَا إِلَىٰ هَـٰؤُلَاءِ ۚ وَمَن يُضْلِلِ اللَّـهُ فَلَن تَجِدَ لَهُ سَبِيلًا ﴿١٤٣﴾

অর্থঃ অবশ্যই মুনাফিকরা প্রতারণা করছে আল্লাহর সাথে, অথচ আল্লাহই তাদের প্রতারণার শাস্তি দিবেন। আর যখন তারা নামাযে দাঁড়ায় তখন একান্ত অলসতার সাথে দাড়ায়। উদ্দেশ্যও আবার শুধু লোক দেখানো। আর তারা আল্লাহকে সামান্যই স্মরণ করে। এরা দোদুল্যমান অবস্থায় ঝুলন্ত। এদিকেও নয়, ওদিকেও নয়। বস্তুতঃ যাকে আল্লাহ গোমরাহ করে দেন, তুমি তাদের জন্য কোথাও কোন পথ পাবে না। (সুরাহ নিসা, ১৪২-১৪৩)

দৃষ্টান্ত-১: উহুদ যুদ্ধের প্রাক্কালে মুসলমানগণ যুদ্ধের কৌশল সম্পর্কে পরামর্শ করছিলেন যে, মদীনা হতে বের হয়ে কাফিরদের মোকাবিলা করা হবে, নাকি মদীনার অভ্যন্তরে থেকেই শত্রুর আক্রমণ প্রতিহত করা হবে ? স্বভাবগতভাবে মুসলিম ছদ্মবেশী মুনাফিকরাও পরামর্শ সভার অংশীদার ছিল। আর তাদের অভিপ্রায় ছিল- সম্মুখ যুদ্ধে অবতীর্ণ না হয়ে মদীনায় বসে কেবল আত্মরক্ষামূলক যুদ্ধ পরিচালনা করা হোক। কিন্তু অন্যান্য বরেণ্য মুজাহিদ সাহাবায়ে কিরামের সাহসিকতাপূর্ণ আগ্রহে শেষ

পর্যন্ত যখন মদীনা হতে বের হয়ে কাফিরদের সঙ্গে সম্মুখ যুদ্ধে অবতীর্ণ হওয়ার প্রস্তাবই গৃহীত হলো তখন যুদ্ধে রওয়ানা হয়ে যাওয়ার পর তিন হাজার কাফির সৈন্য বাহিনীর মোকাবেলায় মাত্র এক হাজার মুসলিম মুজাহিদ বাহিনীকে আরো ক্ষুদ্র করে তাদের মনোবল ভেঙ্গে দিয়ে তাদেরকে নিশ্চিত পরাজয়ের সম্মুখীন করার এক গভীর চক্রান্তের অংশ হিসেবে মুনাফিক নেতা আব্দুল্লাহ বিন উবাই এই বলে তার তিনশত মুনাফিক অনুসারীসহ মধ্য পথ হতে ফিরে এলো যে, যখন আমাদের পরামর্শের প্রতি ভ্রূক্ষেপ করা হলো না বরং অন্যদের পরামর্শই গ্রহণ করা হল তখন আমাদের আর যুদ্ধ করার প্রয়োজন নেই। আমরা এই বিশাল শত্রু বাহিনীর হাত থেকে আত্মরক্ষার পরিবর্তে রণাঙ্গনে অবতীর্ণ হয়ে নিজেদেরকে নিশ্চিত মৃত্যুর মুখে নিক্ষেপ করতে পারি না। যুদ্ধ শুরু হওয়ার কি পূর্ব মুহূর্তে তার এই ধরনের প্ররোচনা মুসলিম সৈন্য বাহিনীতে এতই ক্ষতিকর প্রভাব ফেললো যে, কতিপয় দুর্বল ও নতুন মুসলমানও তার সাথে পশ্চাদপসরণ করে মদীনায় প্রত্যাবর্তন করল। সেই সাথে দু'একটি গোত্রও তাদের সাথে মদীনায় প্রত্যাবর্তন করার ইচ্ছা করেছিল কিন্তু আল্লাহর মেহেরবানীতে তারা রক্ষা পেল।

দৃষ্টান্ত-২: পঞ্চম হিজরীর ঘটনা । মহানবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এবং সাহাবায়ে কিরাম রাযি. গণ বনু মুস্তালিক যুদ্ধে বিজয়ের পর রণাঙ্গন থেকে প্রত্যাবর্তন করছিলেন, পথিমধ্যে কুপ হতে পানি উঠানোকে কেন্দ্র করে এক মুহাজির সাহাবীর রাযি. সাথে খাযরাজ গোত্রের অপর এক আনসারী সাহাবীর রাযি. সামান্য ঝগড়ার সৃষ্টি হয়। হুজুর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এর হস্তক্ষেপে ঘটনা সেখানেই শেষ হয়ে যায়। তদন্তের পর উক্ত মুহাজির সাহাবীরই রাযি. অপরাধ প্রমাণিত হয়। সেই প্রেক্ষিতে সাহাবীগণ রাযি. উক্ত আনসারী সাহাবীকে রাযি. বুঝিয়ে শুনিয়ে মাফও করিয়ে নিয়ে ছিলেন। মুনাফিকদের যে দলটি যুদ্ধ লব্ধ সম্পদের লালসায় মুসলমানদের সাথে একত্রিত হয়েছিল তাদের নেতা মুনাফিক আব্দুল্লাহ বিন উবাই এই ঘটনা অবহিত হয়ে আনসার ও মুহাজির সাহাবীগণের রাযি. ভ্রাতৃত্বের সম্পর্ক নষ্ট করার লক্ষ্যে তাদের মাঝে বিরোধ ও বিবাদ সৃষ্টি করার অপপ্রয়াস চালায়। তখন সে আনসার সাহাবীদের রাযি. উত্তেজিত করার উদ্দেশ্যে বলল- এই ভিনদেশী মুহাজির তোমাদের খেয়ে তোমাদের পরে মোটা তাজা হয়ে এখন তোমাদেরই খেয়ে ফেলতে চায় দেখছি। খোদার কসম! এবার মদীনা প্রত্যাবর্তন করে আমি মুহাম্মদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম কে মদীনা হতে বিতাড়িত করবো। (নাউজুবিল্লাহ)।

হযরত উমর রাযি. এই ঘটনা শ্রবণ করলেন এবং হুজুর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর নিকট তাকে হত্যা করার অনুমতি চাইলেন। কিন্তু মহানবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এই বলে হযরত উমর রাযি. কে নিবৃত্ত করলেন যে, "লোকেরা এই বলে আমার সম্পর্কে ভীতি ছড়াবে যে, মুহাম্মদ স্বীয় লোকদের হত্যা করে।" এক সাহাবীর প্রশ্নের জবাবে হুজুর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তাকে বললেন- "তুমি কি জানো না, আব্দুল্লাহ বিন উবাই কি জঘন্য কথা বলেছেন? তখন তিনি আরজ

করলেন, ইয়া রাসূলুল্লাহ! তার কথা তাকে বলতে দিন, সে মনে করে যে, আপনি তার হাত থেকে সমগ্র মদিনাবাসীর নেতৃত্ব ছিনিয়ে নিয়েছেন, আপনি না এলে সেই মদিনার একক নেতৃত্বের অধিকারী হতে। এ কারণে প্রতিনিয়ত আপনার ও মুসলমানদের প্রতি হিংসার আগুনে জ্বলছে সে।”

অতঃপর মদিনা প্রত্যাবর্তনের পথে মহানবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম আব্দুল্লাহ বিন উবাইকে ডেকে তার অশোভন উক্তি সম্পর্কে জিজ্ঞাসা করলে সে সরাসরি তা অস্বীকার করে। এবং দ্বিধাহীনচিত্তে তার উপর মিথ্যা কসম খায়। তখনই সূরা মুনাফিকুন অবতীর্ণ করে আল্লাহ তা‘আলা তাদের মুখোশ উন্মোচন করে দিলে মদিনার সর্বত্র সে অপদস্থ ও লাঞ্ছিত হতে থাকে। সবার ধারনা ছিল যে, এবার তাকে মৃত্যুদণ্ডই দেয়া হবে। তখন আব্দুল্লাহ বিন উবাইয়ের পুত্র আব্দুল্লাহ যিনি খাটি মুসলমান ও মহানবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এর অত্যন্ত প্রিয় পাত্র ছিলেন- তিনি হুজুর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এর দরবারে এসে আরজ করলেন, “ইয়া রাসূলাল্লাহ! সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম আপনি আমার পিতাকে হত্যা করতে মনস্থ করে থাকলে আমাকে হুকুম করুন, আমি তার মাথা কেটে আপনার দরবারে হাজির করব।” তিনি আরও বললেন, “সমগ্র খাযরাজ গোত্রে আমি মাতা-পিতার সবচেয়ে অনুগত সন্তান বলে পরিচিত। তথাপি পিতৃহত্যার ব্যাপারে আপনার আদেশই শিরোধার্য। কিন্তু আপনি যদি অন্য কাউকে হত্যার আদেশ দেন, তাহলে আমি হয়তোবা পিতৃহত্যাকে চোখের সামনে দৃশ্যমান হতে দেখে আত্মসংবরণ করতে পারবা না।” মহানবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বললেন- তুমি নিশ্চিত থাক, আমি তার ব্যাপারে সেই ধরনের কোন সিদ্ধান্ত গ্রহণ করব না।

দৃষ্টান্ত-৩- নবী পত্নী হযরত আয়িশা রাযি.-এর প্রতি মিথ্যা অপবাদের ঘটনাঃ

বনু মুস্তালিক যুদ্ধে মহানবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এর সফর সঙ্গিনী ছিলেন হযরত আয়িশা রাযি.। যুদ্ধ সমাপ্তির পর মদীনা প্রত্যাবর্তনকালে এক মনযিলে কাফেলা অবস্থান করার পর শেষ রাতে প্রস্থানের ঘোষণা করা হলো যে, কাফেলা কিছুক্ষণের মধ্যে এখান থেকে রওয়ানা হয়ে যাবে। তাই সবাই যেন নিজ নিজ প্রয়োজন সেরে প্রস্তুত হয়ে যায়। হযরত আয়িশা রাযি. ইস্তিঞ্জা (প্রাকৃতিক কার্জ) সম্পাদনের প্রয়োজনে জঙ্গলের দিকে চলে গেলেন। সেখানে ঘটনাক্রমে তার গলার হার ছিঁড়ে হারিয়ে গেল, সেখানে তিনি তা তালাশ করতে লাগলেন। এতে বেশ কিছু সময় অতিবাহিত হয়ে গেল। ইতিমধ্যে কাফেলা রওয়ানা হয়ে গেল। মনযিলে এসে কাফেলাকে না দেখে তিনি সেখানে কাপড় দ্বারা শরীর আবৃত করে বসে পড়লেন এবং সেখানে কিছুক্ষণের মধ্যে নিদ্রার কোলে ঢলে পড়লেন। সময় ছিল শেষরাত্রি, হযরত আয়িশা রাযি. ছুটাছুটি না করে তাঁকে খুঁজে বের করার সুবিধার্থে পূর্বের স্থানেই অপেক্ষা করতে লাগলেন।

এদিকে সাফওয়ান বিন মুআত্তাল রাযি. কে মহানবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম পূর্ব থেকেই কাফেলার পশ্চাতে থেকে কাফেলা রওয়ানা হয়ে যাওয়ার পর ভুলবশতঃ কোন কিছু ফেলে গেলে বা রেখে গেলে তা কুড়িয়ে আনার দায়িত্বে নিয়োজিত করে রেখেছিলেন। সে মতে তিনি পূর্বের মনজিল হতে সকাল নাগাদ উল্লেখিত মনজিলে এসে পৌঁছলেন। তখন পর্যন্ত প্রভাতরশ্মি ততটুকু উজ্জ্বল হয়ে উঠেনি। তিনি একজন মানুষকে নিদ্রামগ্ন দেখে কাছে এসে চিনতে পারলেন। তার মুখ থেকে বিচলিত কণ্ঠে "ইন্নালিল্লাহি ওয়া ইন্না ইলাইহি রাজিউন" বেরিয়ে এল। তাঁর আওয়াজ শুনা মাত্র হযরত আয়িশা রাযি. জাগ্রত হয়ে চাদর মুড়ি দিয়ে বসে পড়লেন। অতঃপর হযরত সাফওয়ান রাযি. নিজের উট কাছে এনে বসিয়ে দিলে হযরত আয়িশা রাযি. তাতে সওয়ার হয়ে বসে যান। আর উক্ত সাহাবী রাযি. নিজে পায়ে হেটে হেটে উটের রশি ধরে আগে আগে চলতে লাগলেন। অবশেষে তিনি কাফেলার সাথে মিলিত হয়ে গেলেন।

এ ঘটনাটি নিয়ে মুনাফিকরা এক তুলকালাম কাণ্ড ঘটিয়ে দিল। আব্দুল্লাহ বিন উবাই মুনাফিক হওয়া ছাড়াও সে ছিল অত্যন্ত অসৎ চরিত্রের। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এর প্রতি ব্যক্তিগতভাবেও তার ছিল প্রচণ্ড আক্রোশ ও চরম বিদ্বেষ। তাই সে নবীজির সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম প্রাণপ্রিয় স্ত্রী উম্মুল মুমিনীন হযরত আয়িশার রাযি. পবিত্র চরিত্রে কালিমা লেপন করে মহানবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম কে চরম লাঞ্ছনা ও মানসিক যাতনায় ফেলার চেষ্টা চালাল। এই হতভাগা ও তার সঙ্গীরা তখন হযরত আয়িশা রাযি. ও সাহাবী সাফওয়ানের রাযি. ব্যাপারে কুৎসা রটনা করতে লাগলো এবং এই মিথ্যা অপবাদের খুব প্রসার ঘটাতে লাগলো। যখন মানুষের মাঝে এই মুনাফিক রটিত অপবাদ চর্চা হতে লাগলো তখন রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এতে খুবই দুঃখিত হলেন। হযরত আয়িশার রাযি. তো দুঃখের কোন অন্তই ছিল না। সাধারণ মুসলমানরাও এতে দারুণভাবে বেদনাহত হলেন। এক মাস পর্যন্ত এ অবস্থা চলতে থাকলো। অবশেষে আল্লাহ তা'আলা পবিত্র কুরআন মাজীদের সূরাহ নূরে ষোল আয়াত বিশিষ্ট দীর্ঘ দুই রুকু অবতীর্ণ করে তাতে হযরত আয়িশার রাযি. পবিত্রতা বর্ণনা ও অপবাদ রটনাকারীদের নিন্দাবাদ করেন। অতঃপর মহানবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম অপবাদ রটনাকারীদের হতে সাক্ষ্য তলব করেন। তারা এই ভিত্তিহীন অপবাদের সাক্ষ্য কোথা থেকে আনবে ? ফলে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম শরী'আতের বিধান অনুযায়ী কোন মুসলমানের চরিত্রে মিথ্যা অপবাদ আরোপের শাস্তি সরূপ প্রত্যেকের উপর আশি দোররা করে হদ্দে কযফ প্রয়োগের নির্দেশ দেন।

দৃষ্টান্ত-৪: তাবুক যুদ্ধে ও যুদ্ধের পূর্বাপর অবস্থায় মুনাফিকদের জঘন্য কার্যাবলীঃ

এক দিকে প্রচণ্ড গরম, অপর দিকে মৌসুমের ফসল -খেজুর কাটার সময় অতি সন্নিকটে, এমনি প্রতিকুল মুহূর্তে যখন মহানবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ও তার সাহাবীগণ রাযি. রোমীয় সৈন্যবাহিনীর বিরুদ্ধে তাবুক যুদ্ধের দীর্ঘ সফরের প্রস্তুতি

গ্রহণ করছিলেন, তখন মুনাফিকরা সাধারণ লোকদেরকে অত্যাধিক গরম দীর্ঘ সফরের কষ্ট ক্লেশ ও প্রতিপক্ষের প্রবল শক্তিশালী হওয়া ইত্যাদির ভয় দেখিয়ে যুদ্ধে না যাওয়ার ব্যাপারে প্ররোচিত করছিল। এ উদ্দেশ্যে তারা এক ইয়াহুদীর বাড়ীতে একত্রিত হয়ে শলা-পরামর্শও করল। সংবাদ পেয়ে মহানবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম উক্ত ইয়াহুদীর বাড়ী জ্বালিয়ে দেয়ার আদেশ দেন। মুনাফিক নেতা আব্দুল্লাহ বিন উবাই প্রথমে তার অনুসারী বিরাট দল নিয়ে যুদ্ধে যাওয়ার প্রস্তুতি দেখিয়েও রওয়ানা হওয়ার মূহুর্তে পিছু টান দেয়।

তাবুক যুদ্ধে যাওয়ার সময় মহানবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম হযরত আলী রাযি. কে আহলে বাইতের দেখা শুনা করার জন্য মদীনায় রেখে গিয়ে ছিলেন। তখন মুনাফিকরা বলাবলি করতে লাগলো যে, আলীর রাযি. প্রতি রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম অসন্তুষ্ট তাই তাকে যুদ্ধে নিয়ে যাননি। শেরে খোদা হযরত আলী রাযি. একথা শুনে তক্ষুনি যুদ্ধ সাজে সজ্জিত হয়ে জরুফ নামক স্থানে মহানবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এর মনযিলে গিয়ে উপস্থিত হলেন এবং জিজ্ঞাসা করলেন যে, মুনাফিকরা এমন বলাবলি করছে। আপনি কি সত্যিই এজন্য আমাকে মদীনায় রেখে এসেছেন ? মহানবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বললেন- তারা মিথ্যা বলছে আমি আমার পরিবার পরিজনের জন্য তোমাকে আমার স্থলাভিষিক্ত করে এসেছি। হে আলী! তুমি কি আমার জন্য এরূপ হতে সন্তুষ্ট নও যেরূপ ছিলেন হযরত হারুন আ., হযরত মুসা আ. এর জন্য। অবশ্য আমার পর আর কোন নবী নেই। তখন হযরত আলী রাযি. মদীনায় ফিরে এলেন।

তাবুক যুদ্ধে যাওয়ার সময় পথিমধ্যে একবার মহানবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এর উট হারিয়ে গেলে এক মুনাফিক বলতে লাগলো মুহাম্মদ নবী হওয়ার দাবী করে এবং লোকদেরকে ‘আসমানের সংবাদ শোনায়। অথচ স্বীয় উটের সংবাদ তার জানা নেই। মহানবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেনঃ এক ব্যক্তি এরূপ বলছে আমি আল্লাহর শপথ করে বলছি আমার মাওলা আমাকে যা জানান তা ছাড়া আমার কিছুই জানা নেই। আর উটের সংবাদ আমাকে আল্লাহ তা’আলা জানিয়ে দিয়েছেন। উপত্যকার একটি ঘাটিতে গাছের সাথে তার দড়ি পেঁচিয়ে যাওয়ার সে আটকে রয়েছে কেউ গিয়ে নিয়ে এস।

এক দল মুনাফিক পথিমধ্যে মুসলমানদের হীনবল করার উদ্দেশ্যে তাদের এই বলে ভয় দেখাচ্ছিল যে, তোমরা কি রোমীয় সৈন্যদের বীরদের আরব যোদ্ধাদের ন্যায় অপরিপক্ক ভেবেছ? মাথা দেখে নিও। সবাইকে রশি দিয়ে বেধে রেখে দেবে। তাদের মধ্যে হতে একজন মুনাফিক বলল তোমরা সাবধানে কথা বলো তোমাদের উপর না জানি একশ করে চাবুক মারার আদেশ হয় এবং আমাদের সম্পর্কে কুরআন নাযিল হয় যে তাতে আমাদের এই কথোপকথন প্রকাশ করে দেয়া হয়। মহানবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম হযরত আম্মার রাযি. কে তাদের নিকট জিজ্ঞাসা করার জন্য

পাঠালেন তারা সবাই মহানবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এর দরবারে উপস্থিত হয়ে বলতে লাগলো যে, আমরা ঠাট্টা বশতঃ পরস্পর এরূপ বলছিলাম।

মহানবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম কে হত্যার লোমহর্ষক ষড়যন্ত্র

তাবুক হতে প্রত্যাবর্তনের পর কতিপয় মুনাফিক গোপনে পরামর্শ করলো যে, যখন মহানবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম পাহাড়ের উঁচু সরু পথে আরোহণ করবেন, তখন ধাক্কা দিয়ে নীচে ফেলে তাকে হত্যা করা হবে। এ উদ্দেশ্যে উল্লেখিত ষড়যন্ত্রকারীরা হুজুর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এর সঙ্গে সঙ্গে চলতে লাগলো। ওহীর মাধ্যমে মহানবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তাদের এ ষড়যন্ত্র সম্পর্কে অবহিত হয়ে গিয়েছিলেন। অতঃপর তিনি পাহাড়ের সুরু রাস্তার নিকট পৌঁছে বললেন- যার ইচ্ছে হয় সে এই পর্বত উপত্যকার প্রশস্ত রাস্তা দিয়ে যেতে পারে- অথবা পাহাড়ের উপর সরুপথ দিয়ে যেতে পারে, এই বলে নিজে পাহাড়ের উপর সরু রাস্তা দিয়ে যেতে লাগলেন। ষড়যন্ত্রকারী দল মোক্ষম সুযোগ বুঝে রাত্রির অন্ধকারে মুখোশ পরিধান করে এই সরুপথ দিয়ে 'আসতে লাগল। মহানবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এর সঙ্গে তখন ছিলেন শুধু হযরত হুযাইফা রাযি. ও হযরত আম্মার রাযি.

হযরত হুযাইফা রাযি. পিছনে ছিলেন। হুজুর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম উক্ত সুরু পথে আরোহণ করলে পিছন হতে উল্লেখিত অভিশপ্ত দলের আগমনের আওয়াজ শোনা গেল। মহানবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এর চেহারায় তখন ক্রোধের লেলিহান শিখা জ্বলছিল। তিনি তাদেরকে পেছনে বিতাড়িত করার আদেশ করলেন। হযরত হুযাইফা রাযি. পিছন ফিরে তাদের উটের মুখে তীর নিক্ষেপ করলেন।

যখন তারা হযরত হুযাইফার রাযি. সম্মুখে উপস্থিত হল তখন তারা ঘটনা জানাজানি হয়ে গেছে ভেবে তারা ভীত সন্ত্রস্ত হয়ে দ্রুত গতিতে পিছনে ফিরে কাফেলার সাথে মিলিত হয়ে গেল। হযরত হুযাইফা রাযি. তাদের বিতাড়িত করে ফিরে এলে মহানবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম দ্রুত উট চালানোর আদেশ করেন। অতঃপর সরু রাস্তা অতিক্রম করে উপত্যকা ঘুরে আসা কাফেলার অপেক্ষায় রইলেন। হুজুর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম হযরত হুযাইফা রাযি. কে জিজ্ঞাসা করলেন তুমি ঐ দলটিকে চিনেছ? তিনি আরজ করলেন সওয়ারী কার কার ছিল তা তো চিনেছি। কিন্তু আরোহণকারীদের চিনতে পারিনি। হুজুর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম জিজ্ঞাসা করলেন- তুমি তাদের উদ্দেশ্য বুঝেছ? তিনি আরজ করলেন, না। মহানবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বললেন- তাদের উদ্দেশ্য ছিল আমাদেরকে পাহাড়ের উপর হতে ফেলে দিয়ে হত্যা করা। আর বললেন যে, ঘটনা এখন কারো নিকট প্রকাশ করো না। আল্লাহ তা'আলা আমাকে তাদের উদ্দেশ্য ও সকলের নাম জানিয়ে দিয়েছেন। ইনশাল্লাহ সকালে প্রকাশ করে দেবো।

ইবনে ইসহাক রহ. বর্ণনা করেন যে, সকালে উঠে মহানবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম নাম উল্লেখ পূর্বক তাদের বক্তব্য তুলে ধরলেন। তাদের মধ্যে হতে

‘জুল্লাস’ নামক মুনাফিক বলেছিল- “আজকের রাতে আমরা মুহাম্মাদকে পাহাড়ের উপর হতে নিক্ষেপ করেই ছাড়ব। যদিও মুহাম্মদ ও তার সাহাবীরা রাযি. আমাদের চেয়ে উত্তম হোক না কেন। আমরা ছাগলের পাল আর তারা আমাদের চেয়ে উত্তম হোক না কেন। আমরা ছাগলের পাল আর তারা আমাদের রাখাল। আমরা তো নির্বোধ আর তারা বুঝি খুব বুদ্ধিমান।”

আব্দুল্লাহ বিন উয়াইনা তার সঙ্গীদের বলেছিল- “আজকের রাতটি জাগ্রত থাকতে পারলে তোমরা চিরদিন শান্তিতে থাকতে পারবে। আজ তোমাদের শুধু একটিই কাজ এই ব্যক্তিকে মহানবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম হত্যা করে ফেল।” হুজুর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তাকে জিজ্ঞাসা করলেন- “আমি নিহত হলে তোমার কি লাভ হতো?” সে তখন কাকুতি-মিনতি শুরু করলে হুজুর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তাকে ছেড়ে দেন। মুররা বিন রাবী বলেছিল আমরা একটি মানুষকে (অর্থাৎ মহানবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম কে হত্যা করতে পারলে সবাই পরিত্রাণ পেয়ে যাবো। মহানবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বার জনের প্রত্যেকের কথোপকথন ও তাদের অন্তরের কুমতলব বলে দেন। হিসন বিন নামীরকে হুজুর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম জিজ্ঞাসা করলেন যে তুমি এরূপ কেন করেছিলে ? সে উত্তর দিল আমার বিশ্বাস ছিল না যে আপনি এই ষড়যন্ত্র অবগত হবেন। এখন বুঝতে পারছি যে, আপনি সত্যিই আল্লাহর নবী। এত দিন আমি আন্তরিকভাবে মুসলমান ছিলাম না। এখন অন্তর হতে ঈমান এনেছি। মহানবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তাকে ক্ষমা করে দেন। কিন্তু মহানবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তাদের কাউকে হত্যার আদেশ করেননি। কারণ দয়ার নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ব্যক্তিগত কোন ব্যাপারে কখনো কারো নিকট হতে কোনরূপ প্রতিশোধ গ্রহণ করেননি।

তাছাড়া কাফিরদের নিকট মুসলমান বলে পরিচিত মুনাফিকদের হত্যা না করার কতগুলো রাজনৈতিক কারণও ছিল। যথাঃ

১. যুদ্ধ ক্ষেত্রে মুসলমানদের দল ভারী দেখিয়ে কাফিরদের ভীতি প্রদর্শন করা।

২. শত্রুরা যাতে এই বলে বদনাম রটাতে না পারে যে, মুহাম্মদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম স্বীয় লোকদেরকে হত্যা করে।

৩. তাছাড়া মহানবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এর জীবদ্দশায় মুনাফিকরা বিভিন্ন ষড়যন্ত্র করলেও তাতে ইসলামের তেমন ক্ষতি করতে পারত না। কেননা তাদের সব ষড়যন্ত্রই আল্লাহ তা’আলা ওহীর মাধ্যমে হুজুর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম কে অবগত করে দিতেন। তাই মহানবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এর জীবদ্দশায় মুনাফিকদের হত্যা করা হতো না।

এরূপ আরো কতগুলো দীনী ও রাজনৈতিক বিশেষ হিকমতের কারণে তাদের সম্পূর্ণ পরিচয় জানা থাকা স্বত্বেও মহানবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তাদের বাহ্যিক ঈমানের উপর ভিত্তি করেই কিছু বলতেন না বরং তাদের সাথে মুসলমানদের মত

আচরণ করতেন। দলীয় প্রমাণাদি দিয়ে তাদেরকে সত্য বুঝাতে চেষ্টা করতেন। তবে তাদের সাথে এতটা আন্তরিকতা প্রদর্শন করতেন না, যা হুজুর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এর স্বভাব ছিল। বরং কিছুটা কর্কশ ও বিমাতা সুলভ আচরণই করতেন এবং কোন কোন ক্ষেত্রে তাদের শাসাতেন। কোন ধরনের পরামর্শ সভায় তাদের উপস্থিতি মহানবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এর অত্যন্ত অপ্রিয় ছিল।

দৃষ্টান্ত -৫ : মসজিদের নামে ষড়যন্ত্রের আখড়া নির্মাণ

মহানবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তাবুক যুদ্ধে রওয়ানা হওয়ার পূর্ব মুহূর্তে একদল মুনাফিক মসজিদে কুবা'র সন্নিকটে আর একটি মসজিদ বানিয়ে হুজুর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এর নিকট এসে আবেদন করলো যে, আমাদের দুর্বল ও অসুস্থ ব্যক্তি যারা মসজিদে কুবায় যেতে পারে না তাদের জন্য একটি মসজিদ বানিয়েছি। অনুগ্রহপূর্বক আপনি নামায পড়িয়ে মসজিদটি বরকতময় করে দিয়ে 'আসবেন। মহানবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বললেন- এখনতো আমি যুদ্ধে যাচ্ছি। ফিরে এসে ইনশাআল্লাহ তোমাদের মসজিদে নামায পড়তে যাব।

এর দীর্ঘ প্রায় এক মাস পর যখন মহানবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তাবুক হতে ফিরার পথে "যী আওয়ান" নামক স্থানে পৌঁছলেন, তখন আল্লাহ তা'আলার পক্ষ হতে ওহীর মাধ্যমে মহানবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম উক্ত মসজিদ নির্মাতাদের কু-উদ্দেশ্যে সম্পর্কে অবগত হয়ে দু'জন বিশিষ্ট সাহাবী রাযি. কে ডেকে জালিমদের তথাকথিত মসজিদটি জ্বালিয়ে গুড়িয়ে দিতে নির্দেশ দিলেন তারা দ্রুত গতিতে গিয়ে তাতে আগুন ধরিয়ে দিল। তার ভিতর অবস্থানকারী মুনাফিকরা সবাই এদিক সেদিক পালিয়ে জান বাঁচালো। কুরআনে কারীমে আল্লাহপাক মুনাফিকদের এই মসজিদকে মসজিদে জিরার বা ক্ষতিকর মসজিদ এবং আল্লাহ ও রাসূলের শত্রুদের ঘাটি হিসেবে আখ্যা দিয়েছেন। বিভিন্ন বর্ণনায় জানা যায় যে, মসজিদে জিরার বানিয়ে ছিল বার জন মুনাফিক তাদের নেতা আবু আমের একদিন তাদের বললো তোমরা মসজিদের নামে একটি ঘর তৈরী কর এবং তাতে সম্ভাব্য সব ধরনের অস্ত্র শস্ত্রের মজুত গড়ে তোল। আমি রোম সম্রাটের নিকট সাহায্য প্রার্থনা করে তার বাহিনী নিয়ে 'আসব এবং মদীনা হতে মুহাম্মদ ও তার অনুসারীদের বিতাড়িত করব। তখন তার নির্দেশানুসারে তার অনুসারীরা মসজিদে জিরার নির্মাণ করে।

এই ছিল মহানবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এর জীবদ্দশায় ইসলাম ও মুসলমানদের বিরুদ্ধে ইয়াহুদী খৃষ্টান ও মুনাফিকদের ষড়যন্ত্রসমূহের কতিপয় উদাহরণ।

ইসলামী খিলাফত ব্যবস্থা ধ্বংসের লোমহর্ষক কাহিনী

মহানবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এর ইন্তিকালের পর ইসলাম এবং মুসলমানদের শক্তি ও শান্তি শৃঙ্খলার উৎস ছিল নিযামে খিলাফাত বা সুপ্রতিষ্ঠিত ও নিয়মতান্ত্রিক খিলাফত ব্যবস্থা। সেই ধারাবাহিকতায় মহানবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি

ওয়াসাল্লাম এর ইন্তিকালের পর সর্বপ্রথম খলীফা মনোনীত হলেন হযরত আবু বকর সিদ্দীক রাযি.।

তাঁর পর খলীফা নিযুক্ত হন হযরত উমর রাযি. এই দুই খলীফার কালজয়ী আদর্শ শাসনে ইসলামী খিলাফত ব্যবস্থার কার্যকারিতা ও সফলতা যখন পরিস্ফুটিত ও সু-প্রমাণিত হয়ে প্রকাশ পায় তখনই ইয়াহুদী খৃষ্টান চক্র তাদের সকল ষড়যন্ত্রের মূল টার্গেট বানায় 'নিযামে খিলাফাত' কে। নতুন করে সুদূর প্রসারী পরিকল্পনা গ্রহণ করে মুসলিম উম্মাহর উন্নতি ও অগ্রগতির মূল শক্তি খিলাফত ব্যবস্থাকে ধ্বংস করার দুরভিসন্ধিতে ইসলামের তৃতীয় খলীফা আমীরুল মু'মিনীন হযরত উসমান যিন্নুরাইন রাযি. এর খিলাফতকালের প্রাথমিক পর্যায়ে হিজরী ২৫ সনে ছদ্মবেশ ধারণ করে মুসলমান দলভুক্ত হয় আব্দুল্লাহ বিন সাবা নামে এক কুখ্যাত ইয়াহুদী মুনাফিক।

এসময় হযরত উসমান রাযি. এর নেতৃত্বে পারস্য, মিশর, সিরিয়া ও ইরাক ইত্যাদি অঞ্চল বিজিত হওয়ার পর লক্ষ লক্ষ লোকেরা ইসলাম গ্রহণ করার হিড়িক চলছিল। এর মধ্য আব্দুল্লাহ বিন সাবা ছাড়াও তার মত আরো অনেক সংখ্যক মুনাফিক ইসলামের মূলে আঘাত হানার মানসে বাহ্যতঃ ইসলাম গ্রহণ করে।

ইবনে সাবার নানাবিধ অপকৌশল

ধুরন্ধর ইবনে সাবা নতুন এই সকল মুনাফিক ও পুরাতন মুনাফিক যারা হরত আবু বকর ও হযরত উমর রাযি. এর খিলাফত কালে কখনো চোখ খোলার সাহস পেত না তাদের নিয়ে একটি গোপন দল গঠন করে। ইবনে সাবার এই দলকে বলা হয় খারিজী বা সাবায়ী দল। "নিযামে খিলাফাত" তথা মুসলমানদের সর্ব সম্মত একতাপূর্ণ সুদৃঢ় খিলাফত তথা রাষ্ট্রীয় ব্যবস্থা ধ্বংসের লক্ষ্য সামনে রেখে ইবনে সাবা সর্বপ্রথম প্রচেষ্টা চালায় খলীফাসহ রাষ্ট্রীয় কার্যে নিয়োজিত বিভিন্ন গভর্নর সাহাবীগণের রাযি. নামে অন্যান্য লোকদের নিকট কুৎসা রটিয়ে তাদেরকে ক্ষিপ্ত করে তুলতে।

সাহাবীগণের রাযি. দোষ চর্চা হারাম হওয়া সত্ত্বেও এই সাবায়ী চক্র হযরত উসমানের রাযি. বিরুদ্ধে নিযামে খিলাফাত ধ্বংসের হাতিয়ার হিসেবে সম্পূর্ণ বানোয়াটভাবে দোষ চর্চার পথকে বেছে নেয়। এর পূর্বে এমন কোন জামা'আত বা দলের আবির্ভাব পৃথিবীতে ঘটেনি যারা সাহাবী রাযি. না হয়েও সাহাবীগণের রাযি. দোষ চর্চার কল্পনা করেছে। অবশ্য এই বানোয়াট দোষ চর্চার পথ অবলম্বন করে তারা তেমন সুবিধা করতে পারেনি। একজন সাহাবীর রাযি. নিকট মুনাফিক আবদুল্লাহ বিন সাবা হযরত মুআবিয়া রাযি. সম্পর্কে মিথ্যা সমালোচনা করলে তিনি তাকে উদ্দেশ্যে করে বললেন- তুই কে? কসম খোদার আমার ধারণা তুই কোন ইয়াহুদীর বাচ্চা। আরেকজন সাহাবীর রাযি. নিকট গিয়ে হযরত মুআবিয়ার রাযি. সম্পর্কে মিথ্যা সমালোচনা করলে তিনি তাকে পাকড়াও করে হযরত মুআবিয়ার রাযি. দরবারে উপস্থিত করেন। হযরত মুআবিয়া রাযি. সুমদয় ঘটনা খলীফা উসমান রাযি. এর

নিকট জানিয়ে পাঠান। হযরত উসমান রাযি. এর ব্যাপারে প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণ করেন যার বিবরণ বক্ষ্যমাণ আলোচনায় বিধৃত হয়েছে। উল্লেখ্য ইবনে সাবা এ সময়ে সিরিয়ায় অবস্থান করছিল এবং সিরিয়ার গভর্নর ছিলেন তখন হযরত মুআবিয়া রাযি.।

অতঃপর ইবনে সাবা সিরিয়া হতে বসরায় এসে এখানকার এক পুরাতন দাগী সন্ত্রাসী ও ডাকাতের বাড়ীতে বসে আরো কতিপয় লোককে নিয়ে এক গোপন বৈঠক করে। সেখানে সাংকেতিক ভাষায় একটি কার্য পরিচালনার প্রস্তাব করলে তা গৃহীত হয়। বসরার গভর্নর গোপন সূত্রে এই সংবাদ পেয়ে তাকে বসরা হতে বহিস্কার করলেন। ফলে সেখান থেকে সে কুফায় চলে যায়। কিছুদিন পর সেখান হতেও বহিস্কৃত হয়ে মিশরে গিয়ে আশ্রয় নেয়। আর এরই মধ্যে সে বসরা ও কুফায় তার অনুসারীদের সমন্বয়ে গোপন দলের একটি স্থানীয় কমিটি তথা ষড়যন্ত্রকারী দল গঠন করে দিয়ে যায়।

মিশরে গিয়ে সে তার কেন্দ্রীয় দফতর ও প্রধান ঘাটি স্থাপন করে এবং বিভিন্ন অঞ্চল বিশেষতঃ বসরা ও কুফায় অবস্থানরত তার সুসংগঠিত অনুসারীদের সঙ্গে চিঠি-পত্রের মাধ্যমে সর্বদা যোগাযোগ অব্যাহত রাখে। তাদের মাধ্যমে সে মুসলিম জাহানের তৃতীয় খলীফা হযরত উসমান রাযি. এর বিরুদ্ধে নানা রকম মিথ্যা অভিযোগ প্রচার করা আরম্ভ করে। তার স্বজনপ্রীতি বংশের লোকদের চাকুরীর ক্ষেত্রে অধিক সুযোগ-সুবিধা প্রদান ও রাষ্ট্রীয় সম্পদ অধিক হারে তাদের মাঝে বণ্টনের কল্পিত অভিযোগ উত্থাপন করে। অধিকন্তু তাকে (হযরত উসমান রাযি. আরো বেশী দোষী সাব্যস্ত করার জন্য আব্দুল্লাহ বিন সাবার সহকর্মীরা আরো অনেক গভর্নর সাহাবীর রাযি. বিরুদ্ধে মিথ্যা অপবাদ রটাতে থাকে। এরূপ ষড়যন্ত্রকারী খারিজীরা খলীফা হযরত উসমান রাযি. এর বিরুদ্ধে মিথ্যা -অতিরঞ্জনকেই বড় অস্ত্ররূপে ব্যবহার করে। এমন কি তারা এসব কল্পিত মিথ্যা অপবাদগুলোকে এরূপ ব্যাপকভাবে পুথি পুস্তকাকারে সর্বত্র প্রচার করে যে, সেগুলো পরবর্তীতে বে-মালুম ইতিহাসে পরিণত হয়ে যায়।

এমনিভাবে আব্দুল্লাহ বিন সাবা নতুন পুরাতন মুনাফিকদের একত্রিত করে এবং মদীনার দু'জন স্বার্থান্বেষী খান্দানী মুসলমান যাদের সাহাবী রাযি. হওয়ার সৌভাগ্য নসীব হয়নি অর্থাৎ মুহাম্মদ বিন আবু বকর ও মুহাম্মদ বিন হুযাইফাকে ভিড়িয়ে উক্ত সন্ত্রাসী দল মিথ্যার বহর ছড়াতে ও মুসলমানদের শান্তি-শৃঙ্খলা ব্যাহত করার অপচেষ্টা করে।

এই উদ্দেশ্যে ইবনে সাবার দল পুথি-পুস্তকাকারে মিথ্যার বহর এমন ভাবে ছড়িয়ে দিয়েছিল যে, পরবর্তী অনেক ইতিহাস লেখকগণ সেসব মিথ্যা গুজব সর্বস্ব পুথি পুস্তক দ্বারা প্রভাবান্বিত হয়ে পড়েন। তারই কলঙ্কিত নজীর হচ্ছে মীর মোশারারফ হোসেনের বহু পুরাতন উপন্যাস "বিষাদ সিন্ধু" যার আদ্যোপান্ত শুধু অলীক ও কাল্পনিক কাহিনী এবং সে সকল মুনাফিকদের প্রচারিত মিথ্যা তথ্য ও ঘটনাবলীর দ্বারা পরিপূর্ণ। উল্লেখ্য এই মীর মোশারারফ হোসেন শিয়া ছিলেন।

সাবায়ীচক্রের অপপ্রচারণায় প্রভাবিত কতিপয় মুসলিম ঐতিহাসিকের বিষক্রিয়া

অত্যন্ত পরিতাপের বিষয় হচ্ছে যে, স্বীয় জাতির সঠিক ইতিহাস বিস্মৃত মুসলিম জাতির অনেকেই আজ মীর মোশারারফ হোসেনদের ন্যায় ইতিহাস লেখক, যারা সত্য মিথ্যা যাচাই না করে দলীল প্রমাণের কোন তোয়াক্কা না করে সবরকম ঐতিহাসিক বিবরণ সংগ্রহ করাতেই অধিক আনন্দ বোধ করেন এবং সঠিক ইতিহাস লেখার পরিবর্তে ইতিহাসের নামে গল্প-কাহিনী লেখার স্বাদ পেতে চান, বা স্বীয় বক্র স্বভাব ও মানসিক কু-চাহিদা পূরণ করে আত্মতৃপ্তি অনুভব করতে চান, আর সঙ্গে সঙ্গে সস্তা দরে ঐতিহাসিক বলে খ্যাত হতে চান। তাদের এ সকল আত্মতৃপ্তিমূলক লেখা তথাকথিত ইতিহাস পড়ে আজ মুসলিম মিল্লাতের বহু সরল প্রাণ মুসলমান হযরত উসমান রাযি. ও হযরত মুআবিয়া রাযি. সহ বিশিষ্ট ও অন্যতম কয়েকজন সাহাবীর রাযি. ব্যাপারে বিরূপ মনোভাব পোষণ করেন। মুসলিম উম্মাহর মাঝে এ ধরনের মানসিকতা সম্পন্ন কিছু লোক তৈরি হওয়াও সাবায়ী খারেজীদের ইতিহাস বিকৃতির এক বিরাট সফলতা। এই মানসিকতায় অতি বেশী প্রভাবান্বিত হয়ে জনৈক ইসলামী চিন্তাবিদ খিলাফত ধ্বংসকারীদের ইতিহাস লিখতে গিয়ে সাবায়ী চক্রের মিথ্যা ইতিহাসের উপর ভিত্তি করে সর্বপ্রথম এবং সবচেয়ে বেশী দোষী সাব্যস্ত করেছে, তৃতীয় খলিফা হযরত উসমান রাযি. ও হযরত মুআবিয়া রাযি. কে।

তার এই লেখনীর বদৌলতে আজ মুসলিম উম্মাহর বহুলোক সাহাবীদের থেকে আস্থা হারিয়ে ফেলেছে, আবার অনেকে সাহাবী বিদ্বেষীও হয়ে পড়েছে।

আরো অধিক পরিতাপের বিষয় হচ্ছে যে, আধুনিক শিক্ষা অর্জনের নিমিত্তে যারা স্কুল, কলেজ ও ভার্সিটিতে গমন করেন, দীন ইসলাম ও তার সঠিক ইতিহাস সম্পর্কে তাদের সম্যক ধারণা না থাকার দরুন তারা আরো বেশী বিভ্রান্ত হচ্ছেন। কারণ, তাদের পাঠ্যসূচীতে ইসলামের ইতিহাস নামে যে সব বই পাঠ্য রয়েছে, তা ব্রিটিশ উপনিবেশিক কর্তৃক প্রণীত সিলেবাসেরই অংশ। আর ব্রিটিশরা যে কখনই ইসলাম ও মুসলমানদের মঙ্গল চায়নি তা বলাই বাহুল্য। তাই তাদের প্রণীত সিলেবাসে সঠিক ঐতিহ্যপূর্ণ ইসলামী ইতিহাসের পরিবর্তে ভ্রান্তিকর ইতিহাস স্থান পাওয়াই স্বাভাবিক। তারা ইসলামী ইতিহাস লেখার ক্ষেত্রে ঐ সাবায়ী ও শিয়া চক্র কর্তৃক রচিত ইসলামের উপর কুঠারাঘাত করা গর্হিত মিথ্যা ইতিহাসের উপর নির্ভর করেছে। ঐ সব ইতিহাস অধ্যয়ন করার দরুন আজ তাবলীগ জামাআত বা উলামায়ে কিরামের সঙ্গে সম্পর্কহীন সাধারণ শিক্ষায় শিক্ষিত অধিকাংশ শিক্ষিত বন্ধুরা হযরত উসমান রাযি. ও হযরত মুআবিয়া রাযি. সম্পর্কে বিরূপ মনোভাব পোষণ করে (নাউযুবিল্লাহ্)। অথচ মহানবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম স্পষ্ট ভাষায় বলে গিয়েছেন- "আল্লাহকে ভয় কর- আল্লাহকে ভয় কর- আমার সাহাবীদের ব্যাপারে। আমার পরে তোমরা আমার সাহাবীদেরকে সমালোচনার পাত্র বানিওনা।" এ জন্য আজ জরুরী হয়ে পড়েছে- উপনিবেশবাদী শিক্ষা ব্যবস্থাকে ঢেলে সাজিয়ে ইসলাম সম্মত যুগোপযোগী শিক্ষা ব্যবস্থা চালু করা। এ ব্যাপারে মুসলমানদের সোচ্চার হওয়া সময়ের দাবী ও কর্তব্য।

ইবনে সাবার লক্ষ্যে

হযরত উসমানের রাযি. বিরুদ্ধে আব্দুল্লাহ বিন সাবার দলের এসব অপপ্রচারের উদ্দেশ্য ছিল, জনগণকে খলীফার বিরুদ্ধে ক্ষেপিয়ে তোলা এবং তাদের দিয়ে বিদ্রোহ করিয়ে মুসলামানদের সুশৃঙ্খল ঐক্যে ফাটল ধরিয়ে নিযামে খিলাফাত (খিলাফত ব্যবস্থা) কে ধ্বংস করা। এজন্য তারা উল্লেখিত পন্থায় অপপ্রচারের পাশাপাশি মদীনায় অবস্থানরত বিশিষ্ট সাহাবীগণের রাযি. নামে হযরত উসমানের বিরুদ্ধে বিদ্রোহ ও জিহাদে অবতীর্ণ হওয়ার আহবান সম্বলিত জাল প্রচারপত্র বিলি করতে থাকে। এভাবে তারা বেশ কিছুসংখ্যক জনগণকে বিভ্রান্ত করতে সক্ষম হয়।

এরই সাথে হিজরী ৩৪ সনে যখন এই মুসলিম নামধারী মুনাফিক সন্ত্রাসবাদী ঘাতক দলটি পূর্ণ জৈবিক উন্মাদনার সাথে আত্মপ্রকাশ করেছিল তখন তারা তাদের ইশতিহার ও ঘোষণা পত্রে আরেকটি বিষয় জুড়ে দিয়েছিল। তা ছিল এই যে এরূপ এক হাজার নবী এমন অতিবাহিত হয়েছেন যাঁদের প্রত্যেকে নিজ নিজ ওয়াসী বা খলীফা নিযুক্ত করে গিয়েছেন। মুহাম্মদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম সর্ব শেষ নবী। আলী রাযি. সর্বশেষ ওয়াসী। অতএব, আলী রাযি. উসমান রাযি. অপেক্ষা খিলাফতের অধিক হকদার, উসমান অন্যায়ভাবে খিলাফত দখল করে রেখেছে।

এই মিথ্যা ও ভিত্তিহীন কথা উল্লেখপূর্বক জনসাধারণের প্রতি হযরত উসমান রাযি. এর বিরুদ্ধে বিদ্রোহ ও আন্দোলন গড়ে তোলার আহবান জানায়। এতেও কিছু মানুষ বিভ্রান্ত হয়ে ইবনে সাবার অনুসারী হয় এবং তা থেকেই পরবর্তীতে হযরত আলী রাযি. কেই মহানবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এর একমাত্র 'খলীফা বরহক' বলে বিশ্বাসী শিয়া দল সৃষ্টি হয়।

মুনাফিক দল বস্তুতঃ হযরত আলীর রাযি. প্রতিও অনুরাগী ছিল না। তারা তাঁর নাম কেবলমাত্র নিজেদের স্বার্থ উদ্ধারের জন্য প্রতারণামূলকভাবে ব্যবহার করত। মুসলমানদের খিলাফত ব্যবস্থায় বিশৃঙ্খলা সৃষ্টি করতে হলে প্রথমে বর্তমান খলীফার বিরুদ্ধে আন্দোলন সৃষ্টি করতে হবে। আর সুপ্রতিষ্ঠিত ও জনপ্রিয় খলীফা হযরত উসমান রাযি. এর বিরুদ্ধে আন্দোলন গড়তে হলে- তার মত যোগ্য ও আকর্ষণীয় ব্যক্তির নাম নিয়ে দাঁড়াতে হবে। তাই তারা এক্ষেত্রে হযরত আলীর রাযি. নাম সাইনবোর্ড হিসেবে ব্যবহার করে। উদ্দেশ্য শুধু স্বার্থ উদ্ধার । অথচ হযরত আবু বকর রাযি. ও উসমান রাযি. এর খলীফা মনোনীত হওয়ার সময় কেউই এরূপ উদ্ভট দাবী করেনি যে হুজুর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম হযরত আলী রাযি. কে খলীফা নির্ধারিত করে গেছেন। বস্তুতঃ হযরত আলীও রাযি. তাদের খিলাফত সর্বান্তকরণে গ্রহণ করে নিয়েছেন। উক্ত অপপ্রচার বাস্তবে ছিল খারেজীদের আন্দোলনের একটি কৌশল মাত্র।

এভাবে ইবনে সাবা তার দল-বল নিয়ে খলীফার বিরুদ্ধে ঘোলাটে বিশৃঙ্খলা, ও গর্হিত পরিস্থিতি সৃষ্টি ও সন্ত্রাসী দল গঠন করতঃ মদীনা আক্রমণে সক্ষম হয়। (মদীনা

আক্রমণের ঘটনার বিবরণ অচিরেই ‘আসছে) ইবনে সাবার দল সংখ্যায় অধিক না থাকলেও তারা সকলেই ছিল অত্যন্ত সুসংগঠিত ও সুসংহত এবং তারা সকলেই ছিল সন্ত্রাসী ও নিষিদ্ধ কার্যে বিশেষ ট্রেনিং প্রাপ্ত ও উদ্দেশ্য পানে পৌছতে অত্যন্ত তৎপর। তাই তাদের পক্ষে এহেন পরিস্থিতি সৃষ্টি করা এবং এরূপ গোপন শক্তিশালী সন্ত্রাসী দল গঠন করা সম্ভব হয়েছিল।

ইবনে সাবার ষড়যন্ত্রের প্রথম পর্ব

আল্লাহ তা‘আলা ইরশাদ করেনঃ

لَتَجِدَنَّ أَشَدَّ النَّاسِ عَدَاوَةً لِّلَّذِينَ آمَنُوا الْيَهُودَ وَالَّذِينَ أَشْرَكُوا ۖ وَلَتَجِدَنَّ أَقْرَبَهُم مَّوَدَّةً لِّلَّذِينَ آمَنُوا الَّذِينَ قَالُوا إِنَّا نَصَارَىٰ ۚ ذَٰلِكَ بِأَنَّ مِنْهُمْ قِسِّيسِينَ وَرُهْبَانًا وَأَنَّهُمْ لَا يَسْتَكْبِرُونَ ﴿٨٢﴾

(হে নবী) আপনি মুসলমানদের জন্য সব মানুষের চেয়ে অধিক শত্রু ইয়াহুদী ও মুশরিক (পৌত্তলিক) দের পাবেন এবং আপনি সবার চাইতে মুসলমানদের সাথে বন্ধুত্বের নিকটবর্তী তাদেরকে পাবেন যারা নিজেদেরকে খৃষ্টান বলে, এর কারণ তাদের মধ্যে আলেম রয়েছে দরবেশ রয়েছে এবং তারা অহংকার করে না। (সূরাহ মায়িদাহঃ ৮২)

পূর্বেই উল্লেখ করা হয়েছে যে, খিলাফত ধ্বংসের লক্ষ্যে হযরত উসমানের রাযি. খিলাফত কালে আব্দুল্লাহ বিন সাবা নামক এক ইয়াহুদী মুনাফিক মুসলিম বেশে মুসলমানদের মাঝে অনুপ্রবেশ করে। সে ছিল অত্যন্ত চতুর ও ধূর্ত। সে ইয়ামান হতে মদীনাতে এসে মুসলমানদের সাথে মিশে যায়। এখানে কিছুদিন অবস্থান করে সে মুসলমানদের আভ্যন্তরীণ সার্বিক অবস্থা সম্পর্কে অবগতি লাভ করে। অতঃপর মুসলমানদের মধ্যে ধর্মীয় ও রাজনৈতিক বিভেদ সৃষ্টির লক্ষ্যে একটি গোপন দল প্রতিষ্ঠার পরিকল্পনা করে। এ দলের প্রচারের ভিত্তি রাখা হয় এমন কতগুলো ধারার উপর যদ্দারা বাহ্যতঃ রাসূলের সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম প্রতি অধিক প্রেম-মহব্বত ও আহলে বাইত তথা রাসুলের সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বংশধরের প্রতি অত্যাধিক অনুরাগ প্রদর্শিত হয়। যেমনঃ

১. আশ্চর্য, মুসলমানরা হযরত ঈসার আ. পুনরায় পৃথিবীতে আগমনের কথা বলে। কিন্তু মুহাম্মাদুর রাসূলুল্লাহু সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এর পুনরাগমনের কথা মানে না।

২. সকল পয়গাম্বরের একজন ওয়াসী বা ভারপ্রাপ্ত দায়িত্বশীল থাকেন হযরত মুহাম্মদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এর ভারপ্রাপ্ত ব্যক্তি হচ্ছেন হযরত আলী রাযি. যেহেতু মুহাম্মদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম শেষ নবী অতএব, আলী রাযি. শেষ ভারপ্রাপ্ত ব্যক্তি।

৩. বড় অন্যায়ের কথা মুসলমানরা নিজেদের নবীর ওসীয়তের কোন পরওয়া করলো না এবং তার ভারপ্রাপ্ত ব্যক্তি থাকা সত্ত্বেও খিলাফত অন্যদের [আবু বকর উমর ও

উসমানের রাযি.] হাতে অর্পণ করে দিল। অতএব তাদেরকে অপসারণ করে ন্যায্য ব্যক্তিকেই [হযরত আলী রাযি.] এ অধিকার প্রদান করা জরুরী।

এ গোপন দলের শাখা প্রতিষ্ঠার জন্য ইবনে সাবা ইসলামী রাষ্ট্রের প্রদেশসমূহের কেন্দ্রীয় শহরগুলোতে দ্রুত সফর করে। উদ্দেশ্যে হাসিলের জন্য সব চেয়ে উপযুক্ত ব্যক্তিদের বেছে নিয়ে তাদেরকে কাজের কৌশল জানিয়ে দিল এবং নিজে মিসরে এসে অবস্থান গ্রহণ করে মিসরকেই সে তার কেন্দ্র রূপে সাব্যস্ত করলো।

কাজের জন্য যে কর্মপন্থা নির্ধারণ করা হলো তা ছিল নিম্নরূপ:
ক) দৃশ্যতঃ মুত্তাকী ও পরহেযগার হয়ে সাধারণ লোকদের উপর নিজের প্রভাব ও মর্যাদা প্রতিষ্ঠা করতে হবে।
খ) সমকালীন খলিফার (হযরত উসমান রাযি. বিরুদ্ধে অপবাদ রটাতে হবে এবং অভিযোগ আরোপ করতে হবে।
গ) বিভিন্ন প্রদেশের গভর্নরগণকে অস্থির করে তুলতে হবে। তাদেরকে অযোগ্য, অসাধু, দুর্নীতি পরায়ণ ও জালিম সাব্যস্ত করে প্রদশেসমূহের কলহ ছড়াতে হবে। সাজানো মিথ্যা দোষসমূহ রটিয়ে পত্রাদি প্রেরণ করতে হবে।
ঘ) এক শহর থেকে অন্য শহরে গভর্নরগণের বিরুদ্ধে সম্পূর্ণ পরিকল্পিত রূপে সাজানো মিথ্যা দোষ সমূহ রটিয়ে পত্রাদি প্রেরণ করতে হবে। মদীনা মুনাওয়ারা থেকে হযরত আলী, হযরত ত্বালহা, হযরত যুবাইর রাযি. প্রমুখ নেতৃস্থানীয় সাহাবায়ে কিরামের পক্ষ খেকে গভর্নরদের বিরুদ্ধে জাল চিঠি দেশের বিভিন্ন এলাকায় পাঠাতে হবে, এ সকল পত্রে আবদুল্লাহ বিন সাবার এ তৎপরতার সাথে উল্লেখিত সাহাবাগণের সংশ্লিষ্টতার কথা প্রকাশ করতে হবে।

ইবনে সাবার বিরুদ্ধে কঠিন শাস্তি প্রয়োগে জটিলতা

হযরত উসমান রাযি. যে খারেজীদের এ সকল কার্যক্রম সম্পর্কে একেবারেই অনবগত ছিলেন তা নয় । বরং তিনি খারেজীদের এ সকল অপপ্রচার ও তার বিরুদ্ধে বিষোদগার ও তাদের সৃষ্ট বিশৃঙ্খলার কথা অবগত হয়ে বিশিষ্ট কয়েকজন সাহাবী রাযি. কে কুফা, বসরা, মিশর ও সিরিয়া ইত্যাদি এলাকায় প্রেরণ করেন এবং সার্বিক পরিস্থিতি তদন্ত করে রিপোর্ট তৈরী করতে নির্দেশ দেন। তদন্ত কমিশনের সদস্যগণ সকলেই যথাসময়ে তদন্তকার্য শেষ করে মদীনায় এসে প্রকাশ্য জনসমাবেশে রিপোর্ট পেশ করেন যে মুসলিম জনসাধারণের মধ্যে কোথাও কোন বিশৃঙ্খলা নেই।

খলীফা হযরত উসমান রাযি. ও তার কোন গভর্নরের বিরুদ্ধে সাধারণ ও বিশিষ্ট মুসলমানদের কোন অভিযোগ নেই অধিকন্তু তারা ন্যায় ও সুবিচার কায়িম রেখেছেন এবং সদা জনগণের কার্য নির্বাহেই নিয়োজিত আছেন।

হযরত উসমান রাযি.- এর পক্ষে মুনাফিকদের এসব কার্যক্রম অবহিত হওয়া সত্ত্বেও সন্ত্রাসবাদীদের বিরুদ্ধে কঠোর মনোভাব গ্রহণ করা বিভিন্ন কারণে সম্ভব ছিল না

যদ্দরুন ইবনে সাবা ও তার দোসরদেরকে হত্যার ন্যায় কঠোর কোন শাস্তি প্রদান করতে পারেননি। কেননা মুনাফিকদের হত্যা করা ও কাফিরদের ন্যায় তাদের বিরুদ্ধে তরবারী ব্যবহার করা এমন একটি জটিল বিষয় ছিল- যার কোন নজীর হযরত উসমান রাযি. এর সম্মুখে ছিল না। কারণ তার পূর্বে মহানবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ও তার পরবর্তী দুই খলীফার খিলাফতকালে কখনো কোন মুনাফিককে হত্যা করার ঘটনা ঘটেনি। এমনকি মহানবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এর আমলে অনেক মুনাফিকের মুনাফিকী কার্যকলাপ ধরা পড়ার পরও হযরত উমর রাযি. প্রমুখ সাহাবীগণ রাযি. তাদের গর্দান উড়িয়ে দেয়ার অনুমতি প্রার্থনা করে ব্যর্থ হয়েছেন।

মহানবীর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম যুগে মুনাফিক নেতা আব্দুল্লাহ বিন উবাই এর মুনাফিকী বার বার ধরা পড়া সত্ত্বেও তিনি তাকে হত্যার নির্দেশ দেননি। মহানবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এর যুগে কতগুলো রাজনৈতিক কারণে তা হয়ে উঠেনি। যা পূর্বে উল্লেখ করা হয়েছে। আর হযরত আবু বকর ও হযরত উমর রাযি. এর যুগে সামান্য সংখ্যক মুনাফিকের অস্তিত্ব থাকলেও তারা প্রকাশ্যে ইসলামের জন্য ক্ষতিকর কোন পদক্ষেপ গ্রহণ করার সাহস পেত না, তাই তারা ধরাও পরত না। আর হযরত উসমান রাযি. এর যুগের ন্যায় এরূপ দলবদ্ধভাবে অস্ত্রশক্তির ব্যবহারের কোন কল্পনাও তখনকার মুনাফিকরা করত না। এ কারণে তাদের আমলে কোন মুনাফিককে হত্যা করার আদেশ দেননি। এদিক দিয়ে বিষয়টি ছিল হযরত উসমান রাযি.-এর জন্য সম্পূর্ণ নতুন ও জটিল। কেননা, ইসলামের কালিমা তাওহীদের স্বীকৃতি ঘোষণাকারী ও নামায রোযা ইত্যাদি পরিপূর্ণরূপে আদায়কারী (মুনাফিক) দের বিরুদ্ধে তরবারী ব্যবহার করা যা রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ও তার পরবর্তী খলীফাগণ কখনো করেননি এই অনুভূতি বিরুদ্ধবাদীদের সশস্ত্র পন্থায় কঠোর হস্তে দমনের চিন্তা করা ও সিদ্ধান্ত নেয়ার পথে যে কত বড় বাধা তা বর্তমান ক্ষমতা ও গদির মোহান্ধতার যুগে উপলব্ধি করা যায় না। গেলেও হযরত উসমান রাযি. এর ন্যায় সাহাবীর রাযি. পক্ষে অনুধাবন না করা সম্ভব ছিল না।

তাই তিনি সন্ত্রাসবাদী মুনাফিকদের ব্যাপারে নির্ভীক চিত্তে নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম খলীফা হযরত আবু বকর রাযি. ও খলীফা হযরত উমর রাযি. এর নীতিতে অটল থেকে যথা সম্ভব মৃত্যুদণ্ড দেয়ার ন্যায় চরমপন্থা এড়িয়ে এই সকল বিদ্রোহী মুনাফিকদের যুক্তি দিয়ে বুঝানো, বহিষ্কার, দেশান্তর, কারাদণ্ডের ন্যায় সাধারণ শাস্তি দিয়ে পরিস্থিতি সামাল দেয়ার চেষ্টা করেছিলেন। কিন্তু ভাগ্যের নির্মম পরিহাস তার এই প্রচেষ্টায় মুনাফিকরা সঠিক পথে আসেনি সংশোধন হয়নি। বরং এসব শাস্তি ভোগের পরও তারা তাদের সংকল্পে দৃঢ় থাকে। অবশেষে তারা তাদের চূড়ান্ত লক্ষ্য অর্জনের উদ্দেশ্যে মদীনা আক্রমণের পরিকল্পনা গ্রহণ করে।

ইবনে সাবা কর্তৃক মদীনা আক্রমণ

হজ্জের মৌসুম যখন নিকটবর্তী এবং সকল এলাকার মুসলমানগণ বিশেষতঃ মদীনাবাসীগণ যখন মক্কা সফরে ব্যস্ত, সুযোগবুঝে তখনই নিঃশব্দে ইবনে সাবার সন্ত্রাসী দল মিশর বসরা ও কুফা তিন দিক হতে মদীনা অভিমুখে রওয়ানা করল। যার দরুন পথিমধ্যে তারা কোথাও কোন বাধার সম্মুখীন হয়নি। মিশরীয় দলটির সাথে স্বয়ং ইবনে সাবাও ছিল। তারা মদীনার নিকটবর্তী স্থানে শিবির স্থাপন করতঃ মদীনাবাসীদের সমর্থন চাইলে হযরত আলী রাযি., তালহা রাযি., ও যুবাইর রাযি. প্রমুখ সাহাবীগণ তাদের তিরষ্কার করে ফিরিয়ে দেন এবং খারেজীদের সম্পর্কে মহানবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এর ভবিষ্যদ্বাণী অনুযায়ী এই সন্ত্রাসী দলকে আল্লাহ তা'আলার লা'নতপ্রাপ্ত ও অভিশপ্ত দল বলে আখ্যায়িত করেন। এদিকে সিরিয়া, কুফা ও বসরা হতে খলীফার সাহায্যার্থে মুসলিম বাহিনী রওয়ানা হওয়ার সংবাদ পেয়ে সন্ত্রাসীরা উক্ত বাহিনী সেখানে এসে পৌছার পূর্বেই কাজ সমাধা করার মানসে যিলক্বদ মাসের শেষ দিকে হঠাৎ মদীনা আক্রমণ করে বসে।

হযরত উসমান রাযি. এর শাহাদাত

মদীনার নিয়ন্ত্রণ দখল করে তারা খলীফা হযরত উসমান রাযি. এর বাস ভবন অবরোধ করে। মদীনার অধিকাংশ মুসলমানই তখন হজ্জে গিয়েছিলেন। তাই মদীনা এক প্রকার জনশূন্যই ছিল। সন্ত্রাসীরা ঘোষণা দিল। আমাদের ব্যাপারে যারা হস্তক্ষেপ না করবে শুধু তারাই জানের নিরাপত্তা পাবে। তাদের মোকাবিলায় তখন উপস্থিত মদীনাবাসীদের শক্তি ছিল একেবারেই অপর্যাপ্ত। তাই তারা নিশ্চুপ থাকলেন।

সন্ত্রাসীরা খলীফার বাসভবন অবরোধ করে খাদ্য ও পানি বন্ধ করে দেয়। হযরত উসমান রাযি. ভবনের ছাদে আরোহণ করে সন্ত্রাসীদের উদ্দেশ্যে তাদের দাবী ও কার্যাবলীর অযৌক্তিকতা বুঝাতে চেষ্টা করেন। তবুও তারা খলীফার পদত্যাগের দাবীতেই অটল থাকে। কিন্তু হযরত উসমান রাযি. রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম কর্তৃক তার প্রতি আরোপিত সুস্পষ্ট ও কড়া নির্দেশের কারণে তাদের দাবী প্রত্যাখ্যান করেন।

হযরত উসমান রাযি. এর প্রতি রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম- এর ভবিষ্যদ্বানীঃ

হযরত আয়িশা রাযি. বর্ণনা করেনঃ একদা রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম লোক মারফত হযরত উসমান রাযি. কে ডেকে আনলেন। অতঃপর হুজুর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তার দিকে মুখ করে বসে স্বীয় হস্তদ্বয় তার স্কন্ধে রেখে (অতিশয় গুরুত্ব আরোপ করে) বললেন হে উসমান। অচিরেই আল্লাহ তা'আলা তোমাকে একটি জামা পরাবেন। যদি মুনাফিকরা তোমার নিকট তা খুলে ফেলার দাবি জানায় তবে তুমি কিন্তু তা খুলে ফেলো না। যতক্ষণ না (শহীদ হয়ে) আমার সঙ্গে মিলিত হও। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম একথা তিন বার বললেন।

হযরত উসমান রাযি. এর মাধ্যমে নিজেদের হীন স্বার্থ চরিতার্থ করার চেষ্টা ব্যর্থ হওয়ার ফলে জিলহজ্ব মাসের ১৮ তারিখে কুফা, বসরা ও মিশর হতে আগত সন্ত্রাসী দলের ১৩ জন নেতা, হযরত উসমানের রাযি. গৃহের সামনের দরজায় হযরত হাসান ও হযরত হুসাইন রাযি. সহ যুবক সাহাবীদের রাযি. পাহারা থাকায় তাঁর গৃহের পিছনের দেয়াল টপকে ঘরে প্রবেশ করে। হযরত উসমান রাযি. তখন নামাযে দাঁড়িয়ে যান। নামায শেষ করে তিনি কুরআন শরীফ তিলাওয়াত আরম্ভ করেন। এ অবস্থাতে সন্ত্রাসীরা তার উপর আক্রমণ চালিয়ে তাঁকে নির্মমভাবে আহত করে ফেলে। একজন সন্ত্রাসী পদাঘাত করে উসমান রাযি. এর সম্মুখ হতে কুরআন শরীফ সরিয়ে দিতে চাইলেও তা ঘূর্ণয়মানভাবে তার সম্মুখেই পড়ে। অতঃপর মিশরীয় দলের সন্ত্রাসী নেতা সুদান ইবনে হুমরানের তরবারীর আঘাতে ইসলামের তৃতীয় স্তম্ব মহানবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এর দুই তনয়া হযরত উম্মে কুলসুম রাযি. ও হযরত রুক্বাইয়া রাযি. এর স্বামী খলীফাতুল মুসলিমীন হযরত উসমান রাযি. শাহাদাত বরণ করেন। তাকে হত্যা করার পর সন্ত্রাসীরা তাঁর গৃহের সব কিছুই লুন্ঠন করে নেয়।

হযরত উসমান রাযি. এর এই নির্মম হত্যাকাণ্ডের মাধ্যমে ইবনে সাবা গং নিযামে খিলাফত ধ্বংসে তাদের প্রাথমিক সাফল্য লাভ করে। হিজরী ২৫ সনে ইসলামী হুকুমত ধ্বংসে ইবনে সাবা যে ষড়যন্ত্র শুরু করেছিল দীর্ঘ দশ বছর চেষ্টার পর হিজরী ৩৫ সনে খলীফা হযরত উসমান রাযি. এর নির্মম হত্যাকাণ্ডের মাধ্যমে তার প্রথম পর্ব শেষ হয়। অতঃপর শুরু হয় ভেঙ্গে পড়া খিলাফত ব্যবস্থাকে পুনরায় প্রতিষ্ঠিত ও সংহত না হতে দেয়ার ষড়যন্ত্র।

ইবনে সাবারা দীর্ঘ ষড়যন্ত্র ও সন্ত্রাসী দল গঠন করলেও খলীফার হত্যাকাণ্ডে তার এ সফলতা ছিল একেবারেই কল্পনাতীত। কারণ তার দল এত বড় ও এত শক্তিশালী ছিল না যে, এত জঘন্য কাজ করতে পারবে বলে কল্পনা করা যায়। অন্যদিকে হযরত উসমান রাযি. এর বিরুদ্ধে জনগণের কোন রকম বিদ্রোহ ছিল না যার কারণে পূর্ব থেকে এ ধরনের কোন আশংকা বোধ করা হয়নি। খারেজীরা শুধু গোপন ষড়যন্ত্রের মাধ্যমে অকস্মাৎ এই কুকীর্তিতে সফল হয়ে গিয়েছিল। সন্ত্রাসীরা সম্পূর্ণ অতর্কিতে কাজ করে তাদের উদ্দেশ্য অর্জনে সফলকাম হতে পেরেছিল। এজন্য হযরত উসমান রাযি. কে সঠিক সময়ে খারেজী তথা ইবনে সাবার দলকে কঠোর হস্তে দমন করতে ব্যর্থ হওয়ার অভিযোগে অভিযুক্ত করারও কোন সুযোগ নেই।

তাছাড়া এ ঘটনা ছিল মহানবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এর ভবিষ্যদ্বাণীর বাস্তবায়ন। বস্তুতঃ তার মুখ হতে নিঃসৃত একটি বাক্যও মিথ্যা প্রমাণিত হতে পারে না।

মহানবীর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ভবিষ্যদ্বাণীঃ

বিশিষ্ট সাহাবী হযরত জাবির রাযি. বর্ণনা করেন, একদা রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ফিৎনা তথা সন্ত্রাস ও বিশৃঙ্খলা সৃষ্টি হওয়ার ভবিষ্যদ্বাণী

করলেন। তখন আবু বকর রাযি. জিজ্ঞাসা করলেন আমি কি সেই ফিৎনার যুগ পাবো? হুজুর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বললেন- না। হযরত উমর রাযি. ও অনুরূপ প্রশ্ন করলে হুজুর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম না সূচক উত্তর দেন। অতঃপর হযরত উসমান রাযি. জিজ্ঞাসা করলেন আমি কি পাবো ? হুজুর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বললেন সেই বিশৃঙ্খলা সৃষ্টিকারী সন্ত্রাসীদের লক্ষ্যস্থল তো তুমিই হবে। (মুসনাদে বাযযার)

বিশিষ্ট সাহাবী হযরত আবু মুসা আশ'আরী রাযি. বর্ণনা করেন, একদা রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম নির্জন পরিবেশের উদ্দেশ্যে একটি বাগানের ভিতরে গিয়ে ঢুকলেন এবং আমি বাগানের প্রবেশ পথে প্রহরী হয়ে থাকলাম। তখন হযরত আবু বরক রাযি. উপস্থিত হয়ে হুজুর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এর নিকট যাওয়ার অনুমতি প্রার্থনা করলে হুজুর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম আমাকে বললেন অনুমতি দাও এবং তাকে বেহেশতের সুসংবাদ দান কর। অতঃপর হযরত উমর রাযি. এসে অনুমতি প্রার্থনা করলে হুজুর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তাঁর সম্পর্কেও বললেন, অনুমতি দাও এবং তাকে বেহেশতের সুসংবাদ দান কর। অতঃপর হযরত উসমান রাযি. ও এসে অনুমতি চাইলেন।

রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তার সম্পর্কে বললেন- অনুমতি দাও এবং তাকে বেহেশতের সুসংবাদ দান কর বালা মুসীবত ও আপদ বিপদের সাথে। তখন হযরত উসমান রাযি. বাগানে প্রবেশ করলেন। তার মুখে ছিল "সমস্ত প্রশংসা আল্লাহ্ তা'লার এবং আল্লাহ্ তা'লার নিকটই সাহায্য কামনা করি। হে আল্লাহ্ (সেই বিপদে আমাকে) সবর ও ধৈর্য ধারণের শক্তি দাও। (বুখারী ও মুসলিম)

হযরত আব্দুল্লাহ ইবনে উমর রাযি. বর্ণনা করেন, একদা মহানবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ফিৎনা তথা সন্ত্রাস ও বিশৃঙ্খলা সৃষ্টি ভবিষ্যদ্বাণী করলেন এবং বললেন- সেই ফিৎনার সময় ঐ মস্তকাবৃত লোকটি অন্যায়ভাবে মজলুম হয়ে নিহত হবে। হযরত আব্দুল্লাহ ইবনে উমর বলেন আমি তৎক্ষণাৎ সেই মস্তকাবৃত লোকটির প্রতি তাকিয়ে দেখি তিনি হযরত উসমান রাযি.।

এসকল হাদীসে হযরত উসমান রাযি. এর খিলাফত কালে খারিজী মুনাফিকদের বিশৃঙ্খলা সৃষ্টি ও সেই ফিৎনায় হযরত উসমান রাযি. এর শহীদ হওয়ার ভবিষ্যদ্বাণী অতি স্পষ্ট।

শাহাদাতের পূর্বে হযরত উসমানের রাযি. স্বপ্নঃ তাছাড়া হযরত আব্দুল্লাহ ইবনে উমর রাযি. হতে আরও বর্ণিত আছে, যেদিন খলীফা হযরত উসমান রাযি. শহীদ হয়েছিলেন, সেদিন সকালে তিনি প্রকাশ করেছিলেন যে, অদ্য আমি হযরত নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম কে স্বপ্ন দেখেছি। তিনি আমাকে বলেছেন হে উসমান। আজ তুমি আমার নিকট ইফতার করবে। সে মতে তিনি ঐ দিন রোযা রেখেছিলেন এবং রোযা অবস্থাতেই দিনের শেষে শহীদ হয়েছিলেন। (আল-বিদায়া ওয়ান নিহায়া)

পূর্বের দিনও একটি স্বপ্ন দেখেছিলেন। তাও তিনি বর্ণনা করেছেন যে, গতকাল রাতে আমি স্বপ্নে দেখেছি আমি যেন হযরত নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এর নিক উপস্থিত হয়েছি। তাঁর নিক আবু বকর ও উমর রাযি. বসা ছিলেন হুজুর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বললেন, এখন তুমি চলে যাও। আগামী কাল নিশ্চয়ই তুমি আমাদের নিকট এসে ইফতার করবে। (আল-বিদায়া ওয়ান নিহায়া)

বিশিষ্ট সাহাবী হযরত আব্দুল্লাহ ইবনে সালাম রাযি. বর্ণনা করেছেন, খলীফা হযরত উসমান রাযি. অবরুদ্ধ থাকাবস্থায় একবার আমি তার নিকট 'আসলাম। তিনি আমাকে সাদর সম্ভাষণ জানিয়ে বললেন, হে ভাই! আমি স্বপ্নে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম কে এই দরওয়াজার নিকট দেখেছি। তিনি আমাকে জিজ্ঞাসা করলেন হে উসমান ! তোমাকে কি শত্রুদল অবরোধ করেছে ? আমি বললাম হ্যাঁ। তিনি আবার প্রশ্ন করলেন তারা কি তোমাকে তৃষ্ণার্ত রেখেছে ? আমি বললাম হ্যাঁ। তখন হুজুর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম আমাকে এক বালতি পানি দান করেন। আমি প্রাণ ভরে তা পান করলাম। অতঃপর হুজুর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম আমাকে বললেন, তুমি যদি চাও তবে আমি তোমার সাহায্য করতে পারি। আর যদি ইচ্ছা কর তবে আমাদের নিকট এসে ইফতার করতে পার। উসমান রাযি. বললেন আমি হুজুর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এর নিকট গিয়ে ইফতার করাকেই গ্রহণ করেছি। (আল বিদায়া ওয়ান নিহায়া)

হযরত উসমান রাযি. এর বিরুদ্ধে কয়েকটি ভিত্তিহীন অভিযোগ

হযরত উসমান রাযি. এর বিরুদ্ধে ইবনে সাবা কর্তৃক আরোপিত স্বজন-প্রীতি তথা স্বীয় বংশীয় লোকদেরকে রাষ্ট্রীয় তহবিল হতে অধিক সম্পদ প্রদান ও সরকারী চাকুরীতে অধিক হারে তাদের নিয়োগ দানের অপবাদ দেয়া হয়েছিল। যার উপর ভিত্তি করে আজ ইসলামী খিলাফতের বিকৃত ইতিহাস রচিত হয়েছে। এগুলো যে কেবলমাত্র ইবনে সাবার রাজনৈতিক উদ্দেশ্য হাসিলের জন্য তার সাজানো, মনগড়া ও মিথ্যা অভিযোগ ছিল, সে বিষয়টি পূর্বেই উল্লেখ করা হয়েছে। কিন্তু যেহেতু সেই সাবায়ী দলের গর্হিত ইতিহাসের ভিত্তিতেই বর্তমানে জনসাধারণের মাঝে প্রচলিত ইসলামী খিলাফতের বিকৃত ইতিহাস রচিত তাই নতুন করে তার অসারতা প্রমাণ করা প্রয়োজন।

স্বীয় বংশীয় লোকদের অধিক সম্পদ দান সংক্রান্ত অভিযোগের উত্তর স্বয়ং হযরত উসমান রাযি.-এর মুখেই শুনুন এবং বাস্তবতার প্রতিও লক্ষ্য রাখুন।

একবার ইবনে সাবা কুফা হতে তার কিছু অনুচরকে নেককার মানুষের বেশে মদীনা প্রেরণ করলো যেন তারা জনসমক্ষে হযরত উসমান রাযি. কে এতদসংক্রান্ত বিষয়ে প্রশ্নবাণে জর্জরিত করে ও তাকে হেস্তনেস্ত করে এবং চূড়ান্তরূপে অভিযুক্ত করতে সক্ষম হয়।

হযরত উসমান রাযি. গোপনে তাদের উদ্দেশ্য ও মদীনা আগমনের সংবাদ পেয়ে তাদেরকে মসজিদে ডাকালেন। ইতিমধ্যেই আজান দেয়া হল। তারা খলীফা হযরত উসমানের একেবারে সম্মুখে মিম্বরের নিকটবর্তী স্থানে বসলে উপস্থিত সাহাবীগণ রাযি. খলীফাকে ঘিরে বসলেন। খলীফা উসমান রাযি. উপস্থিত জনতাকে ইবনে সাবার অনুচরদের উদ্দেশ্যে ও পরিকল্পনা অবগত করিয়ে বিস্তারিত ভাষণ দেন। জনগণ তখন সেই কুচক্রীদের মৃত্যুদণ্ড দাবী করে। হযরত উসমান রাযি. উত্তরে বলেন আমি তাদের ক্ষমা করে দিব এবং আমার সৎ প্রচেষ্টায় তাদের বুঝাতে চেষ্টা করবো। আমি কাউকে প্রাণদণ্ড দিব না যাবৎ না সে প্রাণদণ্ডের অপরাধ করে অথবা প্রকাশ্যে কুকুরী করে। অতঃপর তিনি স্বজন-প্রীতির কথিত অভিযোগের উত্তরে বলেনঃ তারা অভিযোগ করে থাকে আমি আমার আপন জনদের অধিক ভালবাসি এবং তাদের অধিক দিয়ে থাকি। এ সম্পর্কে আমার বক্তব্য এই যে আপনজনের সঙ্গে স্বাভাবিক ভালবাসা আছে বটে কিন্তু কোন অন্যায় ব্যাপারে তাদের পক্ষ সমর্থন করি না। বরং তাদের প্রাপ্য হক আমি তাদের নিকট পৌঁছে দেই মাত্র।

আর তাদের যে অধিক দিয়ে থাকি, তা আমার ব্যক্তিগত ও নিজস্ব সম্পদ হতে দিয়ে থাকি। মুসলমানদের সম্পদ তথা সরকারী ধন ভাণ্ডারকে আমি আমার জন্য এবং আমার আত্মীয় বা নিজস্ব কোন ব্যক্তির জন্য হালাল মনে করি না। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এর আমলে এবং আবু বকর ও উমর রাযি. এর আমলেও আমি আমার ব্যক্তিগত সম্পদ হতে ভাল ভাল ও বড় বড় দান করতাম। অথচ ঐ সময় তো বয়স হিসেবে পার্থিব ধন-সম্পদের প্রতি অধিক লোভ লালসার সময় ছিল। আর যখন আপন পরিজনের মধ্যে আমার বয়স সর্বাধিক। আমার বয়স শেষ সীমায় পৌঁছিয়েছে (৮০ হতে ৯০) এমতাবস্থায় আমি আমার ব্যক্তিগত বা নিজস্ব যা কিছু ছিল আপনজনদের দিয়ে দিয়েছি তাতে বেঈমানরা নানা রকম কথা বলে। তিনি স্পষ্ট করে বলেন আমি যখন খলীফা নির্বাচিত হয়েছিলাম তখন আমি আরবের সর্বাধিক ধনাঢ্য ব্যক্তি ছিলাম। আরবের সবচেয়ে বেশী উট-বকরী আমার ছিল। বর্তমান মুহূর্তে আমার হজ্জের জন্য রক্ষিত দুটি উট ছাড়া অতিরিক্ত একটি উট বা একটি বকরীও আমার নেই। আমার সব আত্মীয় স্বজনের মধ্যে বণ্টন করে দিয়েছি। হযরত উসমান রাযি. স্বীয় এই উক্তির উপর মদীনাবাসী জনগণের সাক্ষ্য চাইলেন- এটাই কি প্রকৃত অবস্থা নয়? তারা সকলে একবাক্যে আল্লাহকে হাজির নাযির উল্লেখ করতঃ বললেন, হ্যাঁ এটা বাস্তব সত্য।

হযরত উসমান রাযি. এর এই বক্তৃতার বর্ণনাকারী এ তথ্যও প্রকাশ করেছেন যে, হযরত উসমান রাযি. তার সমুদয় সম্পত্তি স্বীয় বংশের লোকদের মাঝে বণ্টন করে দিয়েছিলেন। আর এক্ষেত্রে তিনি আপন পুত্র-কন্যাকে দানকৃত লোকদের সমশ্রেণীর করে দিয়েছিলেন। বস্তুতঃ ইসলামের বিধান অনুযায়ী নিজস্ব মাল দেয়ার সময় স্বীয় বংশ ও আত্মীয় স্বজনই অগ্রগণ্য-এটাই সুন্নত তরীকা।

তাছাড়া হযরত উসমান রাযি. ব্যক্তিগতভাবে ইসলামের পূর্ব হতেই আরবের অন্যতম ধনী ব্যক্তি হওয়ার পাশাপাশি তিনি অত্যন্ত দানশীল ছিলেন। ইসলাম গ্রহণের পর মহানবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এর যুগে তার সিংহভাগ সম্পদই মুসলমানদের কল্যাণমূলক কাজে ব্যয় হয়। যে কোন ধরনের নেক কাজে সম্পদ ব্যয় করায় তিনি থাকতেন সর্বাগ্রে। এ জন্য তাকে বলা হতো উসমানে গনী বা ধনী উসমান।

উচ্চপদে আত্মীয়দের নিয়োগদান প্রসঙ্গেঃ

সরকারী চাকুরীতে স্বীয় আত্মীয় ও বংশীয় লোকদের অধিক হারে উচ্চপদ তথা গভর্ণরী প্রদানের যে অভিযোগ হযরত উসমান রাযি. এর বিরুদ্ধে করা হয়েছিল তার অসারতা প্রমাণে তার খিলাফত কালের ৪৭ জন গভর্ণরের নামের তালিকার প্রতি দৃষ্টিপাত করলে অতিসহজেই উত্তর পাওয়া যায় যে, উক্ত ৪৭ জন গভর্ণরের মধ্যে মাত্র ৫ জন হযরত উসমান রাযি. এর সাথে সম্পর্কিত ছিলেন। তন্মধ্যে তিনজন ছিলেন তার নিজ বংশ তথা রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এর গোত্র কুরাইশের শাখা উমাইয়া গোত্রের। কিন্তু এই তিন জনের মধ্যে দুই জনই ছিলেন হযরত উমর রাযি. কর্তৃক নিয়োজিত। উক্ত পাঁচ জনের মধ্যে অপর দুই জন হযরত উসমান রাযি. এর আত্মীয় ছিলেন কিন্তু আত্মীয়তা অভিযোগের কারণ হতে পারে না। বরং হযরত উসমান রাযি. কে অন্যায়ভাবে অভিযুক্ত করার জন্যই কেবল এ ধরনের কথা উত্থাপন করা হয়েছিল। নতুবা শুধু আত্মীয়তার খাতিরে হযরত উসমান রাযি. কাউকে গভর্নর নিয়োগ করেননি। যাকেই গভর্নর নিয়োগ করেছেন যোগ্যতাও পরামর্শের ভিত্তিতেই করেছেন। ৪৭ জন গভর্নরের ভিতরে ২/৪ জন যদি তার নিজ গোত্রের হয় এবং হযরত উসমানের রাযি. বিরাট গোত্রের মধ্যে যোগ্যতা সম্পন্ন লোক থাকাটাও স্বাভাবিক; তাহলে তাদেরকে দায়িত্বে বসালে তাতে এমন কি অপরাধ হতে পার ? বরং যোগ্য ব্যক্তিকে যোগ্য দায়িত্বে না বসানোই অপরাধ এবং জনসাধারণের উপর জুলুম করার শামিল। কারণ বেশী যোগ্য লোক থাকতে যদি তার চেয়ে কম যোগ্য লোক দায়িত্বে বসানো হয় তাহলে নিশ্চয় জনসাধারণ ধর্মীয় সুযোগ সুবিধা ও ন্যায় বিচার কম পাবে যা অত্যন্ত স্পষ্ট। সুতরাং হযরত উসমান রাযি. এর উপর স্বজন-প্রীতির অভিযোগ সম্পূর্ণ ভিত্তিহীন। এটা শুধু বক্র দিল ও ট্যারা চোখ সম্পন্ন লোকদের স্বার্থবাদী অপতৎপরতার বহিঃপ্রকাশ মাত্র।

ষড়যন্ত্রের দ্বিতীয় পর্ব

সাবায়ীদের চাপের মুখে হযরত আলীর রাযি. খিলাফতের দায়িত্বভার গ্রহণ সাবায়ী ষড়যন্ত্রের এ পর্বকে মুসলমানদের পরস্পরে চিরস্থায়ী অনৈক্য সৃষ্টির অধ্যায় বলা চলেঃ

আব্দুল্লাহ বিন সাবার মুনাফিক দল কর্তৃক খলীফা হযরত উসমানের রাযি. শাহাদাতের পর মুসলিম জাহানের প্রথম করণীয় ছিল সর্বসম্মতিক্রমে একজন খলীফা মনোনীত

করে ইসলামী খিলাফতের ভিত্তিতে দেশ পরিচালনা করা এবং মুসলমানদের ঐক্যকে সুসংহত রাখা ও শরয়ী বিধান মুতাবিক হযরত উসমানের রাযি. হত্যাকারী ও বিদ্রোহীদের বিচার করা। কিন্তু সেসব যদি বাস্তবায়িত হয়ে যায় তাহলে আব্দুল্লাহ বিন সাবা ইসলামী খিলাফত ব্যবস্থা ধ্বংসের যে নীল নকশা প্রণয়ন করেছিল শুধু যে তা বিধ্বংস হয়ে তাদের চেষ্টা ব্যর্থ হবে তা ই নয়, বরং তখন তার ও তার দলের ভয়াবহ পরিণামের সম্মুখীন হতে হবে। তাই হযরত উসমান রাযি. কে হত্যা করার পর তার সর্বপ্রথম তৎপরতা ছিল ইসলামের উন্নতির চালিকা শক্তি উম্মতের সর্বসম্মত খিলাফত ব্যবস্থা যেন আর দ্বিতীয়বার প্রতিষ্ঠা না হতে পারে। এই প্রচেষ্টার অংশ হিসেবে সাবায়ী দলের লোকেরা মুসলিম উম্মাহর সর্ব সম্মতিক্রমে একজনকে খলীফা বানিয়ে তার নেতৃত্বে সকলের একতাবদ্ধ হওয়ার প্রচেষ্টাকে ঠেকিয়ে রাখার লক্ষ্যে তারা হজ্জের মওসুমে অধিকাংশ সাহাবী রাযি. ও শান্তিপ্রিয় জনগণশূণ্য দারুল খিলাফত মদীনায় যে পরিস্থিতির সুযোগ নিয়ে হযরত উসমান রাযি. কে শহীদ করেছিল সেই পরিস্থিতিতে নিজেরাই গোটা পরিস্থিতির উপর নিয়ন্ত্রণ প্রতিষ্ঠা করে হযরত আলী রাযি. কে খলীফা পদপ্রার্থী হতে বাধ্য করে।

বিঃদ্রঃ

ভ্রান্তি নিরসনঃ বক্ষ্যমাণ গ্রন্থে সাহাবী ও সাবায়ী শব্দ দুটি বহু জায়গায় ব্যবহৃত হয়েছে। তাই সাধারণ পাঠকদের মাঝে যাতে এ সম্পর্কে কোন বিভ্রান্তি সৃষ্টি না হয় সেজন্য শব্দ দু'টির সংজ্ঞা নিম্নে প্রদত্ত হলঃ

সাহাবী: যে সকল মহান ব্যক্তি ঈমান থাকা অবস্থায় রাসূলে আকরাম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এর দর্শন লাভে ধন্য হয়েছেন এবং ঈমান থাকা অবস্থায় ইন্তেকাল করেছেন।

সাবায়ী: কুখ্যাত ইয়াহুদী আব্দুল্লাহ বিন সাবা'র অনুসারীদেরকে বলা হয় সাবায়ী।

হযরত আলী রাযি. বিশিষ্ট সাহাবী হযরত ত্বালহা রাযি. ও যুবাইর রাযি. এর নিকট খিলাফতের দায়িত্ব গ্রহণের আবেদন জানিয়ে ব্যর্থ হয়ে সাহাবা শূন্য মদীনায় যে স্বল্প সংখ্যক বিশিষ্ট সাহাবা রাযি. বিদ্যমান ছিলেন তাদের পরামর্শে ও বিধ্বস্ত খিলাফত পুনরুদ্ধারের শেষ আশায় এই গুরুদায়িত্ব কাঁধে নিতে বাধ্য হয়ে সম্মতি প্রদান করেন। এর পূর্বে সাবায়ীরা মদীনাবাসীকে খলীফা নির্বাচনের জন্য তিন দিনের সময় সীমা বেঁধে দিয়েছিল। এ সময়ের মধ্যে কাউকে খলীফা বানাতে ব্যর্থ হলে সকলকে হত্যার হুমকি পর্যন্ত তারা দিয়েছিল। ঘটনা পরস্পরার এক পর্যায়ে তারাই হযরত আলীর রাযি. নাম প্রস্তাব করে। অতঃপর উল্লেখিত পন্থায় কতিপয় বিশিষ্ট সাহাবীর রাযি. পরামর্শে হযরত আলী রাযি. খিলাফতের দায়িত্বভার গ্রহণ করেন।

হযরত আলীর রাযি. খলীফা হওয়ার পিছনে মূলতঃ সাবায়ীদের ভূমিকা থাকলেও তাঁর পক্ষে মদীনার একাধিক বিশিষ্ট সাহাবার রাযি. সমর্থনও ছিল। তাছাড়া বাস্তবিক পক্ষেও তখন হযরত আলী রাযি. খলীফা হওয়ার জন্য সর্বদিক দিয়ে যোগ্য ছিলেন। যার প্রমাণ হযরত উসমান রাযি. কে খলীফা মনোনীত করার সময় সমগ্র মুসলিম

বিশ্বের রায় দু'ব্যক্তির ব্যাপারে সীমাবদ্ধ ছিল। অধিকাংশ গোত্র ও লোকের হযরত উসমানের পক্ষে রায় দিয়েছিলেন। অবশিষ্টরা হযরত আলীর রাযি. পক্ষে মতামত ব্যক্ত করেছিলেন। এ দু'জন ব্যতীত অন্য কারো ব্যাপারে প্রস্তাব আসেনি। যে কারণে হযরত আলী রাযি. বিরোধী অন্যান্য সাহাবীগণ রাযি. কাউকে হযরত আলীর রাযি. বিরুদ্ধে পাল্টা খলীফা মনোনীত করেন নি। বরং তারা শুধু সাবায়ীদের ব্যাপারে বিশেষ আপত্তির কারণে হযরত আলীর রাযি. হাতে বাইয়াত হতে অস্বীকার করেছিলেন, এসকল কারণে অর্থাৎ মদীনায় অবস্থিত বিশিষ্ট সাহাবায়ে কিরামের সমর্থন, ও স্বীয় যোগ্যতা বলে হযরত আলীর খলীফা মনোনীত হওয়া শুদ্ধ ছিল এবং তিনি 'খলীফায়ে বরহক' ছিলেন। এ ব্যাপারে উম্মতের মধ্যে কোন দ্বিমত নেই।

হযরত আলীর রাযি. উল্লেখিত পন্থায় খলীফা মনোনীত হওয়ার পর মদীনায় অবস্থিত যে সকল সাহাবী রাযি. তাঁর হাতে উল্লেখিত আপত্তির কারণে বাই'আত হতে অস্বীকার করেন, তাদের মধ্যে কতেককে বিশেষতঃ হযরত ত্বালহা ও যুবাইরের রাযি. ন্যায় বিশিষ্ট দুই সাহাবীকেও রাযি. সাবায়ীরা ঘাড়ের উপর তরবারী ধরে হযরত আলীর রাযি. হাতে বাই'আত হতে বাধ্য করে। খিলাফতের শূন্য পদে তাৎক্ষণিকভাবে একজনকে খলীফা বানানোতে তাদের উদ্দেশ্যে ছিল নিজেদের ইসলামী খিলাফত ব্যবস্থা ধ্বংসের সুদূরপ্রসারী ষড়যন্ত্র হতে মুসলমানদের দৃষ্টি আড়াল করে রাখা, জনগণের রোষানল থেকে আত্মরক্ষা করা এবং খিলাফত ব্যবস্থায় জবরদস্তি নিজেদের সম্পৃক্ত করে নিজেরা ক্ষমতার অংশীদার হয়ে ধীরে ধীরে মনোনয়নে বিভেদ সৃষ্টি করে ধাপে ধাপে খিলাফত ব্যবস্থাকে চিরতরে বিনষ্ট করে দেয়া। হযরত আলীর রাযি. মত গ্রহণযোগ্য ব্যক্তিত্বকে খলীফা মনোনীত না করলে তাদের এ সকল উদ্দেশ্যে অর্জিত হতো না বরং তখন মুসলমানরা সম্মিলিতভাবে কাউকে খলীফা বানিয়ে তাঁর নেতৃত্বে খলীফা হযরত উসমানের রাযি. হত্যাকারী সাবায়ীদের সমূলে ধ্বংস করে দিতে পারতো। এ জন্য হযরত উসমান রাযি. কে শহীদ করার পর সাবায়ীদের সকল ষড়যন্ত্র মুসলমানদের মাঝে বিভেদ সৃষ্টি করে তা বাড়ানো ও জিইয়ে রাখার লক্ষ্যে প্রণীত হয়। সে লক্ষ্যে তারা হযরত আলী রাযি. কে খলীফা মনোনয়ন ও বিরোধীদেরকে জোর পূর্বক তাঁর হাতে বাই'আত করার উল্লেখিত পন্থা অনুসরণ করে।

মদীনার বিশিষ্ট সাহাবীগণের রাযি. সমর্থন ও স্বীয় যোগ্যতার কারণে হযরত আলী রাযি. খলীফায়ে বরহক হলেও তার মনোনয়নে হযরত উসমানের রাযি. হত্যাকারী সাবায়ী চক্রের হাত থাকা ও বিরোধীদেরকে সাবায়ী দল কর্তৃক জোর পূর্বক বাই'আত হতে বাধ্য করা এবং খিলাফতের গুরুত্বপূর্ণ পদে সাবায়ীদের জবরদস্তিমূলক কর্তৃত্ব প্রতিষ্ঠিত করার দরুন বিপরীত মত সৃষ্টির সুযোগ করে দেয়। যে কারণে আশারায়ে মুবাশশারাহ তথা মহানবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এর মুখে একই মজলিসে এই দুনিয়ায় জীবিত থেকে বেহেশতের শুভ সংবাদ লাভকারী দশজন সাহাবীর রাযি. অন্যতম দু'জন হযরত ত্বালহা ও হযরত যুবাইর রাযি. জোরপূর্বক হযরত আলীর রাযি. হাতে বাই'আত করেও তা প্রত্যাহার করে নেন এবং হযরত আয়িশা রাযি. ও

হযরত মুআবিয়া রাযি.এবং উম্মুল মুমিনীনসহ বিশিষ্ট অনেক সাহাবীই রাযি. হযরত আলী রাযি. হাতে বাই'আত না হয়ে হযরত উসমানের রাযি. হত্যাকারী সাবায়ীদের হযরত আলী রাযি. কর্তৃক বিচারের দাবীতে বিরোধী শিবিরে অবস্থান গ্রহণ করেন।

সফলতার পথে সাবায়ী ষড়যন্ত্র

এদিকে হযরত আলী রাযি. খলীফা মনোনীত হওয়ার পর সাবায়ী দল কর্তৃক সৃষ্ট গোলযোগপূর্ণ ও বিশৃঙ্খল মুহূর্তে তার চতুর্দিকে সাবায়ীদের শক্ত আধিপত্য ও ক্ষমতা নিয়ন্ত্রণমূলক অবস্থান এবং এরই সঙ্গে হযরত আলীর রাযি. সমর্থন ও ক্ষমতার প্রভাবে সাবায়ী চক্রের দৃঢ় অবস্থান ও প্রভাব কিছুতেই খতম করতে না পারার দরুন হযরত আলী রাযি. বিরোধী শিবিরে অবস্থান গ্রহণকারী সাহাবীগণের রাযি. সংখ্যা ধীরে ধীরে বেড়েই চলছিল।

আর এর মাধ্যমে মুসলমানদের ঐক্যকে চূর্ণ করে তাদেরকে দুই শিবিরে বিভক্ত করার ষড়যন্ত্র সফলতার দিকে এগুচ্ছিল। এক দিকে হযরত আয়িশা, তালহা, যুবাইর, মুআবিয়া প্রমুখ সাহাবা রাযি. ও তাদের অনুসারীগণ হযরত আলীর রাযি. প্রতি তাদের দাবী ছিল আপনি খলীফা নির্বাচিত হওয়ার পর আপনার প্রথম কর্তব্য হচ্ছে হযরত উসমানের রাযি. হত্যার বদলা নেয়া। অপর দিকে হযরত আলী রাযি. ও তাঁর সমর্থকগণের বক্তব্য ছিল যেহেতু আমরা পরিস্থিতির শিকার হয়ে সাবায়ীদের দৃঢ় অবস্থান ও প্রভাব সীমিত শক্তি দ্বারা খতম করতে পারছি না তাই আপনারাও এগিয়ে আসুন এবং নির্বাচিত খলীফার হাতে বাই'আত করে তার হাত কে শক্তিশালী করুন এবং খিলাফতের ভিত্তি মজবুত করুন। অতঃপর তিনি অবশ্যই তাদের (সাবায়ী) বিচার করবেন। হযরত উসমানের রাযি. রক্ত তিনি কিছুতেই বৃথা যেতে দিতে পারেন না।

হযরত আলী রাযি. এ বক্তব্য জনসাধারণের মাঝে মিশ্র প্রতিক্রিয়ার সৃষ্টি করেছিল। অনেকে হযরত আলীর রাযি. সাথে এ ব্যাপারে ঐক্যমত পোষণ করলেও অন্যরা এটাকে হযরত উসমানের রাযি. হত্যার বদলা নেয়া হতে তাঁর পাশ কাটানোর চেষ্টা বলে অভিহিত করলো। আর সাবায়ীরা হযরত আলীর রাযি. উল্লেখিত বক্তব্য শ্রবণে চিন্তা করলো যে যদি তিনি প্রতিকুল পরিস্থিতি কাটিয়ে উঠে সামান্য নিঃশ্বাস নেয়ার সুযোগ পান, তাহলে আমাদের আর রক্ষা নেই। অতএব আমদের এরূপ পরিস্থিতি সৃষ্টির বিরুদ্ধে সর্বদা প্রাণপণ চেষ্টা চালিয়ে যেতে হবে।

এদিকে হযরত মুআবিয়া রাযি. তাঁর শাসিত 'শাম প্রদেশে' হযরত উসমানের রাযি. হত্যাকারীদের বদলা নেয়ার পক্ষে জনমত গঠনে ব্যস্ত থাকায় হযরত আলী রাযি. তাঁর প্রতি বাইআতের আহ্বান জানিয়ে পত্র প্রেরণ করেন। হযরত মুআবিয়ার রাযি. পক্ষ হতে সন্তোষজনক উত্তর না পাওয়ার হযরত আলী রাযি. বুঝে নিলেন যে, ব্যাপারটি এত সহজে সমাধান হবার নয়। অতএব, তিনি হযরত মুআবিয়ার রাযি. বিরুদ্ধে শাম (সিরিয়া) অভিযানের প্রস্তুতি গ্রহণ করেন।

অপরদিকে হযরত আয়িশা রাযি. মক্কা হতে হজ্জ পালন করে মদীনা ফিরার সময় পথিমধ্যে সাবায়ী দল কর্তৃক হযরত উসমানের রাযি. শাহাদাত ও মদীনা দখলের সংবাদ শ্রবণ পূর্বক মক্কা প্রত্যাবর্তন করে সাবায়ীদের বিচার ও মদীনাকে তাদের দখলমুক্ত করার পক্ষ জনমত গঠন করতে থাকেন। হযরত ত্বালহা ও যুবাইর রাযি. সহ আরো অনেকেই মদীনা থেকে মক্কায় এসে তাঁর সঙ্গে যোগ দেন। তাঁদের পরামর্শে হযরত আয়িশা রাযি. হযরত আলীর রাযি. উপর চাপ প্রয়োগের লক্ষ্যে, অর্থ ও সামরিক শক্তি অর্জনের জন্য সমমনা লোকদের সাথে বসরার উদ্দেশ্যে রওয়ানা হন।

হযরত আয়িশা রাযি. কর্তৃক বসরা অভিযানের সংবাদ শুনে তথায় হযরত আলী রাযি. কর্তৃক নিযুক্ত গভর্নর উসমান বিন হানিফ এ অভিযান প্রতিহত করার প্রস্তুতি গ্রহণ করেন। অতঃপর হযরত আয়িশা রাযি. সদলবলে বসরা আগমনের পর উভয় পক্ষ যুদ্ধ এড়িয়ে সন্ধির পথ বের করতে মনোনিবেশ করেন। কিন্তু বসরায় নিযুক্ত আব্দুল্লাহ বিন সাবার এজেন্ট হাকিম বিন জাবাল হঠাৎ করে তার দল নিয়ে হযরত আয়িশার রাযি. বাহিনীর উপর আক্রমণ করে বসে। কিন্তু হযরত আয়িশা রাযি. তাঁর বাহিনীকে যুদ্ধ এড়িয়ে শুধু প্রতিরোধের নির্দেশ দেন।

কিন্তু ধীরে ধীরে এ যুদ্ধ ব্যাপক আকার ধারণ করে। সে মুহূর্তে উসমান বিন হানিফ হাকিম বিন জাবালার পক্ষ অবলম্বন করেন। অবশেষে উসমান বিন হানিফ পরাজিত হয় এবং বসরা শহর হযরত আয়িশার রাযি. নিয়ন্ত্রণে চলে যায়। বসরা দখলের পর হযরত উসমানের রাযি. বিরুদ্ধে যে সকল বসরাবাসী বিদ্রোহে অংশ নিয়েছিল হযরত ত্বালহা ও যুবাইরের রাযি. নির্দেশে তাদের অনেককেই গ্রেফতার করে হত্যা করা হয়। আর কিছু লোক পলায়ন করে আত্মরক্ষা করে।

হযরত আয়িশার রাযি. বসরা অভিযান ও তথায় তাঁর নিয়ন্ত্রণ প্রতিষ্ঠার সংবাদ শুনে হযরত আলী রাযি. সিরিয়া অভিযান স্থগিত রেখে ইরাক তথা বসরার উদ্দেশ্যে রওয়ানা হন। 'যী-ক্বার' নামক স্থানে হযরত আলী রাযি. বসরার নিকট শিবির স্থাপন করেন।

সন্ধি প্রচেষ্টাঃ হযরত আলী রাযি. আলোচনার মাধ্যমে মতবিরোধ নিষ্পত্তির আশায় ক্বা' ক্বা' বিন আমরকে বসরায় পাঠালেন। ক্বা' ক্বা' একজন বিচক্ষণ ও বাকপটু ব্যক্তি ছিলেন। তিনি হযরত আয়িশা, ত্বালহা ও যুবাইরের রাযি. দরবারে এসে আরয করলেন আপনারা যে এত কষ্ট করে এখানে এসেছেন, এতে আপনাদের উদ্দেশ্য ও নেক নিয়ত কি? হযরত আয়িশা রাযি. ও তাঁর সঙ্গীরা উত্তর দিলেন আমাদের উদ্দেশ্যে মুসলমানদের ঐক্যে যে ফাটলের সৃষ্টি হয়েছে তা নিরসন করা ও কুরআনের আদেশ বাস্তবায়িত করা।

ক্বা' ক্বা' বললেন- তাহলে এ লক্ষ্য অর্জনে আপনারা কি পন্থা নির্ধারণ করেছেন ? তারা উত্তর দিলেন- 'হযরত উসমানের রাযি. হত্যাকারীদেরকে হত্যা করতে হবে। কেননা

তাঁর হত্যার কিসাস (হত্যার বদলে হত্যাকারীকে হত্যা করা) না নেয়া হলে কুরআনের বিরুদ্ধাচরণ করা হবে।

ক্বা‘ ক্বা‘ বললেন- হযরত উসমানের রাযি. হত্যার কিসাসের দাবী তো যুক্তিযুক্ত এবং তাতে আমাদের কারো দ্বিমত নেই। কিন্তু যতক্ষণ পর্যন্ত খিলাফতের ভিত্তি সুদৃঢ় না হবে এবং রাজ্যে শান্তি-শৃঙ্খলা ফিরে না ‘আসবে ততক্ষণ তো এ দায়িত্ব পালন করা সম্ভবপর নয়। দেখুন আপনারা বসরার বিদ্রোহীদের নিকট হতে কিসাস নিয়েছেন কিন্তু হারকুম বিন যাহীরকে শায়েস্তা করতে পারেননি বরং তাকে হত্যার করতে চাইলে তার পক্ষে ছয় হাজার মানুষ দাড়িয়ে গেল অবশেষে আপনারা তাকে ছেড়ে দিতে বাধ্য হন। তাহলে আপনারা যখন পরিস্থিতির কথা বিবেচনা করে হযরত উসমানের রাযি. হত্যাকরীদের মধ্য হতে একজনকে আপাততঃ ছেড়ে দিতে পারলেন তাহলে হযরত আলী রাযি. যদি সকলের বিচার সাময়িকভাবে স্থগিত রাখেন তাহলে তার অন্যায় কোথায়? অতএব, এই অস্থিরতা ও বিশৃঙ্খলার সমাধান এভাবেই হতে পারে যে, আপনারা সকলে আমীরুল মুমিনীন হযরত আলীর রাযি. পতাকাতলে সমবেত হয়ে বিদ্রোহীদের বিচারের জন্য তাঁর হাতকে শক্তিশালী করবেন এবং নিজেদেরকে ও আমাদেরকে এমন বিপদে নিক্ষেপ করা হতে বিরত থাকবেন যার পরিণতিতে আমরা উভয়ই ধ্বংস হয়ে যাব। কোন একক ব্যক্তি বা দলের নয় বরং তা সমগ্র জাতির ঐক্য ভাঙনের কারণ হবে। আমি আশা করি আপনারা যুদ্ধ বিগ্রহের চেয়ে শান্তিপূর্ণ সমাধানকেই অগ্রাধিকার দিবেন।

ক্বা‘ক্বা‘র এ যুক্তিপূর্ণ উপস্থাপনায় হযরত আয়িশা রাযি. ও তাঁর দুই অনুসারী হযরত ত্বালহা ও যুবাইর রাযি. অত্যন্ত প্রভাবান্বিত হলেন এবং তাঁরা বললেন যে, আপনার এ ফর্মুলা তো অত্যন্ত যুক্তিপূর্ণ। কিন্তু হযরত আলীর রাযি. ও কি এই মত? যদি তাঁরও এই মত হয়ে থাকে, আর তিনি হযরত উসমানের রাযি. হত্যাকরীদের বিচারে প্রস্তুত থাকেন, তাহলে অতি সহজেই এ সংকট নিরসন হতে পারে।

ক্বা’ক্বা’ ফিরে এসে হযরত আলীকে রাযি. উপরোক্ত আলোচনার বিবরণ শুনালে হযরত আলী রাযি. অত্যন্ত খুশী ও আশান্বিত হয়ে উঠলেন । ক্বা‘ক্বা‘র সঙ্গে হযরত ত্বালহা ও হযরত যুবাইরের রাযি. কিছু অনুসারীও হযরত আলীর রাযি. নিকট তার প্রকৃত মনোভাব জানার জন্য ‘আসল। কেননা তাদের নিকট সাবায়ীরা এই অপপ্রচার চালাচ্ছিল যে, হযরত আলী রাযি. বসরা বিজয় করে তথাকার যুবকদের হত্যা করবেন আর শিশু ও নারীদের গোলাম-বাঁদী বানিয়ে নিবেন।

হযরত আলী রাযি. তাদেরকে একান্তে নিয়ে এ সকল মিথ্যা অপপ্রচারে কান না দেয়ার পরামর্শ দেন এবং তার পক্ষ হতে এরূপ আচরণ না হওয়ার নিশ্চয়তা প্রদান করেন। তারা হযরত আলীর রাযি. বাহিনীকে শান্তির প্রত্যাশী ও যুদ্ধ পরিহারে আগ্রহীই দেখতে পেল। দীন ও ইসলামী উম্মাহর স্বার্থে উভয় পক্ষের এই ইখলাস ও নমনীয়তায় যে আন্তরিক পরিবেশ সৃষ্টি হয় তাতে মুসলমানদের পারস্পরিক দ্বন্দ্ব ও

গৃহযুদ্ধের আশংকা দূরীভূত হয়ে 'আসছিল আর এরূপ আশার আলো দেখা যাচ্ছিল যে, মুসলমানদের উভয় পক্ষ পারস্পরিক আলোচনার মাধ্যমে সাবায়ীদের সৃষ্ট দ্বন্দ্ব কলহকে ভুলে গিয়ে অচিরেই চূড়ান্ত ঐক্যের ঘোষণা দিবেন এবং উভয় পক্ষ হযরত আলীর রাযি. খিলাফতের পতাকাতলে একতাবদ্ধ হয়ে খিলাফতের ভিত্তিকে দৃঢ় করে খিলাফত ব্যবস্থা ধ্বংসের ষড়যন্ত্রকারী ও হযরত উসমানের রাযি. হত্যাকারী সাবায়ী চক্রকে সমূলে উৎখাত করে তাদের সকল ষড়যন্ত্রের বিষদাঁত গুঁড়িয়ে দিবেন এবং তাদেরকে চরম শাস্তি প্রদান করবেন।

অতএব, উভয় পক্ষের এই ঐক্য ইসলাম ও ইসলামের উন্নতির মূল ভিত্তি ইসলামী খিলাফত ব্যবস্থা ও মুসলমানদের জন্য মঙ্গলজনক হলেও আব্দুল্লাহ বিন সাবা ও তার দলের জন্য তা ছিল মৃত্যু ঘণ্টা । তাই তারা এতে নিজেদের প্রমাদ গুনলো এবং যে কোন মূল্যে মুসলমানদের এ ঐক্য প্রয়াস ব্যর্থ করার হীন ষড়যন্ত্রে মত্ত হল। যার বিস্তারিত বিবরণ নিম্নে উদ্বৃত্ত হচ্ছে।

সাবায়ীদের বিরুদ্ধে হযরত আলী রাযি. এর দ্ব্যর্থহীন ভাষণ ও এর প্রতিক্রিয়া

হযরত আলী রাযি. শান্তি চুক্তি চূড়ান্ত করার লক্ষ্য বসরা গমনের প্রস্তুতি নিলেন। রওয়ানা হওয়ার পূর্বে সমবেত জনতার উদ্দেশ্যে তিনি একটি ভাষণ দিলেন। ভাষণে তিনি জাহিলিয়াতের অন্ধকার ও ইসলামের আলোর কথা উল্লেখ করেন। অতঃপর মুসলমনাদেরকে পারস্পরিক ঐক্য, সম্প্রীতি ও সৌহার্দ্যের যে মহান নিয়ামত দান করা হয়েছিল, তা উল্লেখপূর্বক বর্তমান অনৈক্য ও বিশৃঙ্খলার উপর দুঃখ প্রকাশ করেন এবং এর জন্য ইসলাম বিদ্বেষীদের ষড়যন্ত্রকেই দায়ী করে বলেন- "যারা মুসলমানদের উন্নতি ও প্রতিপত্তি সহ্য করতে পারে না এবং মুসলমানদের বিশ্বব্যাপী রাজত্ব বিস্তারে ঈর্ষান্বিত হয়ে তাদের অধঃপতন কামনা করে বর্তমানের এ সৃষ্ট পরিস্থিতি তাদেরই ষড়যন্ত্রের পরিণতি।"

অতঃপর তিনি বললেন- আগামীকাল আমরা বসরায় যাব। কিন্তু আমাদের এই সফর যুদ্ধের উদ্দেশ্যে নয় বরং শান্তি ও একতার জন্য। অতএব যারা হযরত উসমানের রাযি. হত্যাকাণ্ডে অংশগ্রহণ করেছিল তাদের কেউ যেন আমাদের সঙ্গে না যায়।

হযরত আলীর রাযি. স্পষ্ট ও দ্ব্যর্থহীন এ ভাষণ শ্রবণ করতঃ সাবায়ীদের পয়ের নীচ হতে মাটি সরে গেল। তাই যে কোন মূল্যে এই ঐক্য প্রচেষ্টাকে নস্যাৎ করার লক্ষ্যে মরণ কামড় হানার পায়তারায় আব্দুল্লাহ বিন সাবা তার ঘনিষ্ঠ সাঙ্গ পাঙ্গদের নিয়ে এক গোপন বৈঠকে বসল। বৈঠকে সার্বিক পরিস্থিতি পর্যালোচনা করতঃ তারা মতামত ব্যক্ত করল যে যদি আলী রাযি. ও ত্বালহা-যুবাইরের রাযি. মাঝে ঐক্য সম্পাদিত হয়ে যায় তাহলে তা আমাদের রক্তের উপর দিয়ে সম্পাদিত হবে যা আমাদের এতদিনের সকল প্রচেষ্টা নস্যাৎ করে দিবে। অতএব যে কোন মূল্যে এ সন্ধি প্রচেষ্টাকে ব্যর্থ করে দিতে হবে।

পরের দিন সকালে হযরত আলী রাযি. স্বীয় বাহিনীসহ বসরার উদ্দেশ্যে রওয়ানা করলেন। অপরপক্ষে হযরত ত্বালহা-যুবাইর রাযি. ও তাদের বাহিনী নিয়ে বসর হতে বেরিয়ে 'আসলেন। উভয় দর তিন দিন পর্যন্ত মুখোমুখি অবস্থান করল। উভয়পক্ষের মাঝে আলোচনা চলতে থাকল। অবশেষে হযরত আলী রাযি. হযরত ত্বালহা ও যুবাইর রাযি. নিকট প্রস্তাব পাঠালেন যে, ক্বা'ক্বা'র সঙ্গে এর পূর্বে যে কথা হয়েছিল তাতে যদি আপনারা একমত থাকেন তাহলে আর সময় ক্ষেপণ না করে চূড়ান্ত ফয়সালা হয়ে যাওয়া উচিৎ । তাঁরা উত্তর দিলেন আমরা নিঃসন্দেহে সে কথার উপর অটল আছি। অতঃপর এ পক্ষ থেকে এই দু'জন ও অপরপক্ষ হতে হযরত আলী রাযি. নিজ ঘোড়ায় আরোহণ করে বের হলেন এবং অপরের সঙ্গে লেগে গেল। অতঃপর দীর্ঘক্ষণ ধরে অত্যন্ত সৌহার্দ্যপূর্ণ পরিবেশে এই তিন নেতার সরাসরি বৈঠক ও আন্তরিক আলোচনা হল। আলোচনায় উভয়পক্ষেই অতীতের বিভিন্ন স্মৃতি চারণ করলেন। এ বৈঠকের পর সন্ধিচুক্তি চূড়ান্ত হওয়ার ব্যাপারে আর কোন সন্দেহ ও আশংকা রইল না।

জঙ্গে জামাল মুসলিম ইতিহাসের মর্মান্তিক ট্রাজেডি

বৈঠক শেষ করে উভয় পক্ষ স্ব স্ব শিবিরে ফিরে আসেন, উভয় পক্ষের সন্ধি প্রিয় লোকেরা স্বস্তির নিঃশ্বাস নেয়ার সুযোগ পেলেন এবং উভয় পক্ষের সৈন্যরাই রাতে নিশ্চিন্তে ঘুমিয়ে পড়ল, এদিকে রাতের আধার কাটার পূর্বেই মরণ কামড় হানার লক্ষ্যে ওঁত পেতে থাকা সাবায়ী গোষ্ঠীর লোকেরা দুই দলে বিভক্ত হয়ে একদল হযরত আয়িশা হযরত আলীর রাযি. ঘুমন্ত বাহিনীর উপর আক্রমণ করল এবং উভয় দলের মধ্যেই অপর পক্ষের বিশ্বাসঘাতকতা ও আক্রমণের সংবাদ ছড়িয়ে দিল। ফলে তাদের মাঝে বেধে গেল তুমুল যুদ্ধ। উভয় পক্ষের যুদ্ধের এই ডামাডোল চলাকালীন সময়ে সাবায়ীরা উভয় দলের বিশিষ্ট ব্যক্তিদের হত্যা করতে ওঁত পেতে থাকে। যুদ্ধের প্রারম্ভে কাব বিন ছাওরিয়া হযরত আয়িশার রাযি. পক্ষ হতে শান্তিবানী ও যুদ্ধ বিরতির ঘোষণা নিয়ে দাঁড়ালে সাবায়ীরা তাকে তীর নিক্ষেপে হত্যা করে এবং একই সঙ্গে তারা হযরত আয়িশার রাযি. হাওদা (উটের পিঠের উপর বসার স্থান যাতে তিনি অবস্থান করছিলেন) কে তীর নিক্ষেপের নিশানা বানায়। এমতাবস্থায় স্বয়ং মহানবীর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম পরিবারকে আশংকা জনক অবস্থায় দেখে বসরাবাসীগণ তাঁর হাওদা ঘিরে রাখেন। হযরত আয়িশা রাযি. কে আঘাত করতে ব্যর্থ হয়ে সাবায়ী গোষ্ঠী তাঁর উটের চালককে আক্রমণের লক্ষ্যবস্তু বানায় এতে একের পর এক সত্তর জন প্রাণ উৎসর্গ করেন।

রাতের অন্ধকারে উভয় দলের উপর সাবায়ীদের চরম রক্তক্ষয়ী ষড়যন্ত্রমূলক আক্রমণের মাধ্যমে পারস্পরিক যে ভুল বুঝাবুঝি ও অবিশ্বাস সৃষ্টি হয়েছিল তার রেশ কেটে অবশেষে যখন যুদ্ধ বন্ধ হলো তখন দেখা গেল যে, ইতিমধ্যে সাবায়ীদের চক্রান্তে মুসলমানদের পারস্পরিক ভুল বুঝাবুঝিতে তাদের হাতে দশ হাজার

মুসলমান শহীদ হয়ে গেছেন। যাদের মধ্যে আশারা মুবাশশারার অন্যতম দুই সাহাবী হযরত ত্বালহা ও যুবাইর রাযি. এবং হযরত ত্বালহার রাযি. দুই ছেলেও ছিলেন।

যুদ্ধ শেষে হযরত আলী রাযি. ময়দানের সকল প্রান্তে ঘুরে ঘুরে দেখলেন এবং নেতৃস্থানীয় সাহাবীদের রাযি. এই অনর্থক গৃহযুদ্ধের শিকার হয়ে রক্তাক্ত অবস্থায় মাটিতে লুটিয়ে পড়ে থাকতে দেখে তিনি অত্যন্ত আবেগাপ্লুত হয়ে উঠেন এবং আফসোস করতে থাকেন। হযরত ত্বালহার রাযি. লাশ দেখে আফসোস করে বললেন- কুরাইশ গোত্রীয় কোন ব্যক্তিকে আমি লুটে পড়ে থাকতে দেখা সহ্য করতে পারি না। অতঃপর তিনি তার অনেক গুন কীর্তন করার পর উভয় পক্ষের শহীদগণের জানাযা পড়ান ও তাদের কাফন দাফনের ব্যবস্থা করার নির্দেশ দেন। এভাবেই সাবায়ীদের ষড়যন্ত্র সফলতা লাভ করে এবং এ সময়ই সর্বপ্রথম এক মুসলমানের হাত অপর মুসলমান ভাইয়ের রক্তে রঞ্জিত হয়। ইতিহাসে এ যুদ্ধ জঙ্গে জামাল নামে প্রসিদ্ধ হয়ে আছে।

জঙ্গে সিফফীন মুসলিম বিশ্বকে স্থায়ীভাবে বিভক্ত করে রাখার আত্মঘাতী ষড়যন্ত্র

আল্লাহ তাআলা ইরশাদ করেছেনঃ

لَوْ خَرَجُوا فِيكُم مَّا زَادُوكُمْ إِلاَّ خَبَالاً وَلأَوْضَعُوا خِلاَلَكُمْ يَبْغُونَكُمُ الْفِتْنَةَ وَفِيكُمْ سَمَّاعُونَ لَهُمْ ۗ وَاللَّـهُ عَلِيمٌ بِالظَّالِمِينَ ﴿٤٧﴾ لَقَدِ ابْتَغَوُا الْفِتْنَةَ مِن قَبْلُ وَقَلَّبُوا لَكَ الأُمُورَ حَتَّىٰ جَاءَ الْحَقُّ وَظَهَرَ أَمْرُ اللَّـهِ وَهُمْ كَارِهُونَ ﴿٤٨﴾

অর্থঃ যদি মুনাফিকরা তোমাদের সাথে (তাবুকের) জিহাদে বের হত তবে তোমাদের অনিষ্ট ছাড়া আর কিছু বৃদ্ধি করত না। আর অশ্ব ছুটাত তোমাদের মধ্যে বিভেদ সৃষ্টি উদ্দেশ্যে। আর তোমাদের মাঝে রয়েছে তাদের গুপ্তচর। বস্তুতঃ আল্লাহ জালিমদের ভালভাবেই জানেন। তারা পূর্ব থেকেই বিভেদ সৃষ্টির জন্য সুযোগ সন্ধানে ছিল এবং আপনার কার্যসমূহ উলট পালট করে দিচ্ছিল। শেষ পর্যন্ত সত্য প্রতিশ্রুতি এসে গেল এবং জয়ী হল আল্লাহর হুকুম যে অবস্থায় তারা মন্দবোধ করছিল। (সূরাহ তাওবাহ ৪৭-৪৮)

মুনাফিকদের ব্যাপারে কুরআনে কারীমের উপরোক্ত ভবিষ্যদ্বানী সূচনালগ্ন থেকে আজ পর্যন্ত অব্যাহতভাবে জারী আছে দুনিয়ার শেষ মুহূর্ত পর্যন্ত জারী থাকবে। সেজন্য মুসলমানদের সতর্কতা অবলম্বন করতে হবে এবং নিম্মের ঘটনা প্রবাহ থেকে শিক্ষা গ্রহণ করতে হবে।

হযরত আলী রাযি. বসরা হতে কুফায় প্রত্যাবর্তন করেন। কুফায় কিছু দিন অবস্থান করার পর আবার তিনি মুসলিম বিশ্বের ঐক্যের লক্ষ্যে হযরত মুআবিয়া রাযি. এর উদ্দেশ্যে সিরিয়া যাওয়ার সিদ্ধান্ত নেন। এখানেও সাবায়ীরা হযরত আলি ও হযরত মুআবিয়া রাযি. এর মাঝে যাতে কিছুতেই কোনরূপ ঐক্য প্রতিষ্ঠিত হতে না পারে সে জন্য সর্বাত্মক চেষ্টা চালায় ও তৎপর থাকে। এই দুস্কৃতিকারীরা হযরত আলী রাযি. কে চতুর্দিক হতে এমনভাবে পরিবেষ্টিত করে রেখেছিল এবং তাঁর দলের সাথে এরূপ

একত্রিত হয়ে গিয়েছিল যে হযরত আলী রাযি. কিছুতেই তাঁদের পরিবেষ্টন হতে বেরিয়ে ‘আসতে পারছিলেন না এবং তাদের বিচারও করতে পারছিলেন না। হযরত উসমানের রাযি. বিরুদ্ধে বিদ্রোহ ও তার হত্যাকাণ্ডে সফল হওয়ার পর সংখ্যায় নগণ্য হলেও রাজনৈতিকভাবে সাবায়ীরা তখন একটি শক্তিশালী ও সুসংগঠিত দল হিসেবে সকলের মধ্যে প্রভাব ও ভীতি বিস্তারে সক্ষম হয়েছিল। সে সুবাদে তারা অনেক গুরুত্বপূর্ণ সরকারী পদ দখল করা ছাড়াও সকল ক্ষেত্রে প্রভাব খাটাতে সামর্থ্য হয়েছিল। এ সকল কারণে মুসলমানদের ঐক্যবদ্ধ খিলাফতের ভিত্তি মজবুত হওয়ার ব্যতিরেকে হযরত আলীর রাযি. পক্ষে তাদের বিরুদ্ধে কোন রূপ ব্যবস্থা গ্রহণ করা কিছুতেই সম্ভব ছিল না।

একদিকে যেমন হযরত আলী রাযি. সর্বদাই হযরত উসমানের রাযি. হত্যাকাণ্ডের বদলা নেয়ার পূর্বে মুসলমানদের ঐক্যবদ্ধ খিলাফতকে মজবুত করার প্রতি গুরুত্বারোপ করতেন। অপর দিকে হযরত আয়িশা রাযি. ত্বালহা, যুবাইর, মুআবিয়া রাযি. হযরত আলীর রাযি. চতুর্দিকে সাবায়ীদের দেখে তাঁকে খলীফা মানতে অস্বীকার করেন যাবত না তিনি সাবায়ীদেরকে স্বীয় সঙ্গ হতে বহিস্কার করে তাদের বিচার না করেন। আর তখনকার এরূপ জটিল পরিস্থিতিতে এ ধরনের বিপরীত মত পোষণ করা কোন অস্বাভাবিক ব্যাপার ছিল না।

লক্ষণীয় যে, আজ আমরা এর চেয়ে অনেক সাধারণ বিষয় নিয়েও বহুধাবিভক্ত হয়ে যাই। আর যদি এমন কোন কঠিন পরিস্থিতি সৃষ্টি হত তাহলে আমাদের মাঝে যে কত মত ও পথের সৃষ্টি হতো তা একমাত্র আল্লাহপাকই জানেন। যা হোক, তখন এরূপ জটিল রাজনৈতিক পরিস্থিতি সৃষ্টিতে সাবায়ী চক্র সফল হয়ে গেলে সাহাবায়ে কিরামের রাযি. মধ্যে মতানৈক্য দেখা দেয় যা ছিল খুবই স্বাভাবিক।

তবে যে কোন মতানৈক্যের ক্ষেত্রে সকল মতই পরিপূর্ণ সঠিক হতে পারে না। একটি সঠিক হলে অপরটি ভুল হবে এটাই স্বাভাবিক। সুতরাং আলোচ্য ঘটনার ক্ষেত্রে আহলুস সুন্নাহ ওয়াল জামাআতের আকাইদ হচ্ছে যে হযরত আলীর রাযি. মতই সঠিক ছিল।

আর ভিন্নমত পোষণকারী হযরত আয়িশা, ত্বালহা, যুবাইর ও মুআবিয়া রাযি. এর মত নির্ভুল ছিল না। কিন্তু তাদের সেই ভুল ইচ্ছাকৃত ও গোঁড়ামীপূর্ণ ছিল না বরং তা ছিল দীন ইসলামের স্বার্থে ও মহান আল্লাহ তা’আলার সন্তুষ্টির উদ্দেশ্যে তা ছিল তাদের উদ্ভাবিত পন্থায় অনিচ্ছাকৃত ইজতিহাদী ভুল।

আর শরী‘আতের বিধানমতে যে সকল ক্ষেত্রে মতানৈক্যের অবকাশ আছে সে সকল ক্ষেত্রে ‘মুজতাহিদগন’ তথা শরীয়ত স্বীকৃত প্রজ্ঞাবান ব্যক্তিগণ যদি সঠিক সিদ্ধান্তে পৌছার জন্য সম্ভাব্য চিন্তা-ফিকির করার পরও কোনরূপ ভুল করে ফেলেন তবুও তারা গুনাহগার তো হনই না বরং সঠিক সিদ্ধান্তে উপনীত মুজতাহিদ এর ন্যায় তারাও

সাওয়াবের অংশীদার হন। তবে সঠিক সিদ্ধান্তে উপনীত মুজতাহিদগণ দ্বিগুণ সাওয়াব পান আর সর্বাত্মক প্রচেষ্টার পর ভুল সিদ্ধান্তের উপনীত মুজতাহিদগণ পান তার অর্ধেক সাওয়াব। মহানবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তার এক চির অমর বানীতে স্পষ্টভাবে উল্লেখ করেছেন: যখন মুজতাহিদ বিচারক ইজতিহাদের মাধ্যমে সঠিক বিচার করে তখন সেই দুই সাওয়াবের অধিকারী হয়। আর যখন ইজতিহাদ করে অনিচ্ছাকৃতভাবে ভুল সিদ্ধান্ত দেয় তখন সে এক সাওয়াব পায়।

হযরত আলী রাযি. তাঁর মত অনুযায়ী সাবায়ীদের বিচারের পূর্বে ঐক্যবদ্ধ খিলাফত প্রতিষ্ঠার সর্বশেষ প্রচেষ্টা হিসেবে হযরত মুআবিয়া রাযি. ও তার অনুগত লোকদের ঐক্যবদ্ধ মুসলিম শক্তির পতাকাতলে আনার জন্য সিরিয়ার উদ্দেশ্যে বের হলে জঙ্গে জামালের ন্যায় এখানেও উভয় বাহিনী পরস্পর মুখোমুখি হয়েও যুদ্ধে লিপ্ত না হয়ে প্রথমে তারা আলোচনার মাধ্যমে শান্তি প্রতিষ্ঠার প্রয়াস পান। যদিও হযরত আলী ও হযরত মুআবিয়া রাযি. বা তাঁদের দলের কোন মুসলমানই পরস্পরের কোন্দল ও যুদ্ধ কামনা করতেন না। কিন্তু হযরত আলীর রাযি. পক্ষে আলোচনাকারী প্রতিনিধি দলে সাবায়ীরা তাদের প্রভাব ও শক্তি বলে (যা পরিস্থিতির নাজুকতার কারণে হযরত আলীর রাযি. নিয়ন্ত্রণের বাইরে ছিল) অন্যতম প্রতিনিধি হিসেবে অনুপ্রবেশ করে আলোচনায় আন্তরিক ও সৌহার্দ্যপূর্ণ পরিবেশ শুরুতেই ভণ্ডুল করে দেয়।

তারা হযরত মুআবিয়ার রাযি. সঙ্গে চরম অসৌজন্যমূলক আচরণ করা ছাড়াও তাকে যা ইচ্ছে তাই বলে গাল-মন্দ করতে থাকে এবং বার বার তাকে যুদ্ধের হুমকি দিতে থাকে। হযরত আলী রাযি. শান্তি চুক্তি কামিয়াব করার জন্য বার বার প্রতিনিধি দল পাঠানো সত্ত্বেও ঐ একই কারণে সকল প্রচেষ্টা নস্যাৎ হয়ে যায়। হযরত আলীর রাযি. পক্ষের লোক হয়ে সাবায়ীদের এহেন আচরণ ও স্পর্ধা অবলোকনে হযরত মুআবিয়া রাযি. সাবায়ীদের বহিস্কার ও বিচারের পূর্বে হযরত আলী রাযি. কে খলীফা না মানার দাবী আরো যুক্তিযুক্ত ও সুসংহত হয়। যার দরুন শান্তি আলোচনা ফলপ্রসূ হয়নি, পরিণতিতে যুদ্ধ অনিবার্য হয়ে পড়ে। যুদ্ধ বেধে গেলেও প্রথমে কোন পক্ষেরই তেমন উদ্যম ও স্পৃহা পরিলক্ষিত হচ্ছিল না। কারণ কোন পক্ষই মুসলমানদের পারস্পরিক যুদ্ধে আগ্রহী ছিল না বরং তারা যথাসাধ্য এ আত্মঘাতী যুদ্ধ এড়ানোর চেষ্টা করেছিলেন।

কিন্তু এতে কোন ফল হয়নি বরং ধীরে ধীরে যুদ্ধের তীব্রতা বাড়তে থাকে এবং হযরত আলী রাযি. জয় লাভের দিকে অগ্রসর হতে থাকেন। যখন হযরত আলীর রাযি. চূড়ান্ত বিজয় নিশ্চিত হয়ে এলো তখনই হঠাৎ হযরত মুআবিয়ার সিরিয় বাহিনীর লোকেরা তীরের মাথায় কুরআন শরীফ ঝুলিয়ে যুদ্ধ বন্ধ ও কুরআনের ফায়সালা মেনে নেয়ার জন্য উভয় পক্ষকে আহ্বান জানায়। হযরত আলী রাযি. এটাকে সিরিয়দের পরাজয় এড়ানোর কৌশল অভিহিত করে তার বাহিনীকে চূড়ান্ত বিজয় অর্জিত না হওয়া পর্যন্ত যুদ্ধ চালিয়ে যাওয়ার নির্দেশ দেন। কিন্তু সাবায়ী দল হযরত আলীর রাযি. চূড়ান্ত

বিজয়ে নিজেদের মৃত্যু ঘণ্টা শুনতে পায়। কেননা এ যুদ্ধে জয় লাভ করতে পারলে হযরত আলীর রাযি. জন্য ঐক্যবদ্ধ খিলাফত ব্যবস্থা পুনঃ প্রতিষ্ঠার ব্যাপারে আর কোন বাধাই থাকবে না। অতঃপর তিনি সাবায়ীদের সমূলে ধ্বংস করবেন। তাই তারা হযরত আলী রাযি. কে বিজয়ের দিকে অগ্রসর হতে দেখেই কোন ছুতা ধরে যে কোনভাবে চূড়ান্ত বিজয়ের পূর্বেই যুদ্ধ থামিয়ে দিয়ে মুসলমান ও মুসলিম বিশ্বকে স্থায়ীভাবে দুই শিবিরে বিভক্ত করে রাখতে এবং ঐক্যবদ্ধ খিলাফত ব্যবস্থা প্রতিষ্ঠিত না হতে দেয়ার জন্য ওঁত পেতে ছিল।

এ লক্ষ্যে সিরিয়দের কুরআন উঁচিয়ে যুদ্ধ বন্ধের আবেদন শোনা মাত্র হযরত আলীর রাযি. নির্দেশ উপেক্ষা করে তাঁর সৈন্যবাহিনীতে গুরুত্বপূর্ণ পদ দখল করে রাখা সাবায়ী নেতারা সুযোগ বুঝে এই বলে বেকে বসল এটা কিভাবে হতে পারে যে আমাদের 'আসমানী গ্রন্থ আল-কুরআনের প্রতি আহ্বান করা হবে আর আমরা তা অস্বীকার করব? এতদসত্ত্বেও হযরত আলী রাযি. যুদ্ধ অব্যাহত রাখার তাগিদ করলেন কমান্ডাররা তাঁকে সরাসরি এই বলে হুমকি দেয় আপনি যুদ্ধ বন্ধ করুন অন্যথায় আমরা আপনার সঙ্গেও তেমনি আচরণ করবো যেমনটি উসমানের রাযি. সাথে করেছি।

সাবায়ীরা কুরআনের দোহাই দিয়ে হযরত আলীর রাযি. সৈন্যবাহিনীর একটি বিরাট অংশকে বিভ্রান্ত করে ফেলতে সক্ষম হয়েছিল। তখন নিজের দলে বিশৃঙ্খলা দেখা দেয়ার আশংকায় হযরত আলী রা. অপারগ হয়ে তার সিপাহসালার 'আশতার' কে যুদ্ধ বন্ধ করে ফিরে আসার নির্দেশ দেন। আশতার যুদ্ধ বন্ধ ঘোষণা করে ফিরে আসেন। ইতিহাসে এ যুদ্ধ জঙ্গে সিফফীন নামে প্রসিদ্ধ।

যুদ্ধ বন্ধ হওয়ার পর হযরত আলী রাযি. হযরত মুআবিয়ার রাযি. নিকট দূত পাঠিয়ে কুরআন শরীফের ফয়সালা মেনে নেয়ার ব্যাখ্যা জানতে চাইলেন। হযরত মুআবিয়া রাযি. উত্তর পাঠালেন উভয় পক্ষ একজন করে সালিশ (তৃতীয় পক্ষ) নিয়োগ করবেন এবং তাদের নিকট হতে কুরআনের বিরুদ্ধে কোন ফয়সালা না করার অঙ্গীকার নিবেন। অতঃপর কুরআনের নির্দেশ মুতাবিক তারা দু'জনে আমাদের বিরোধ নিষ্পত্তির যে উপায় নির্ধারণ করবেন আমরা তা মেনে নিব। হযরত আলীর রাযি. বাহিনীর লোকেরা এটাকে সর্বান্তকরণে গ্রহণ করলেন।

অতঃপর হযরত আলীর রাযি. পক্ষ হতে বিশিষ্ট সাহাবী হযরত আবু মূসা আশআরী রাযি. কে এবং হযরত মুআবিয়ার রাযি. পক্ষ হতে অপর প্রসিদ্ধ সাহাবী হযরত আমার ইবনুল 'আস রাযি. কে সালিশ নির্ধারণ করা হয়। উভয় পক্ষই এ দুই সালিশ কুরআন অনুযায়ী যে ফয়সালা করবেন তা মেনে সেটার বাস্তবায়নে সার্বিক সহযোগিতার অঙ্গীকার করেন। এ লক্ষ্যে তাদেরকে ছয় মাসের সময় দেয়া হয় এবং উভয় সালিশের জান ও মালের সার্বিক নিরাপত্তা নিশ্চিত করা হয়।

সবচেয়ে বিশ্বস্ত ও প্রমাণভিত্তিক বর্ণনা অনুযায়ী পরবর্তী ঘটনার বিবরণ এরূপ জানা যায় যে চুক্তি সময়সীমা অতিক্রান্ত হওয়ার পর সালিশী সাহাবীদ্বয় রাযি. সদলবলে 'দাউমাতুল জান্দাল' নামক স্থানে একত্রিত হলেন। তাছাড়া নিরপেক্ষ আরো কয়েকজন বিশিষ্ট বুযুর্গ সাহাবীও রাযি. তথায় উপস্থিত হন।

দীর্ঘ আলোচনা পর্যালোচনার পর উভয় সালিশ হযরত আলীর রাযি. খিলাফত বিতর্কিত হয়ে যাওয়ার কারণে তাঁকে এ দায়িত্ব হতে অব্যাহতি দেয়ার সিদ্ধান্ত নেন এবং এ বিষয়টি লিখিত হয়ে যায় এবং তাতে উভয়ে দস্তখত করেন। আর হযরত মুআবিয়া রাযি. যেহেতু পূর্ব হতে খলীফাই ছিলেন না এবং তিনি নিজেও এখনো পর্যন্ত খিলাফতের দাবী করেন নি তাই তাঁকে খিলাফতের মসনদে বহাল রাখা বা অব্যাহতি দেয়ার প্রশ্নই ওঠে না।

অতঃপর উক্ত মজলিসে সমগ্র উম্মতের ঐক্যমতের ভিত্তিতে পরবর্তী খলীফা নির্বাচনের প্রসঙ্গে উত্থাপিত হয়। হযরত আবু মুসা আশআরী রাযি. হযরত আব্দুল্লাহ বিন উমরের রাযি. নাম প্রস্তাব করেন। তিনি মুসলমানদের এই পারস্পরিক হানাহানিতে বরাবরই নিরপেক্ষ ভূমিকা পালন করে 'আসছিলেন। অপর পক্ষে হযরত আমার ইবনুল 'আস রাযি. হযরত আব্দুল্লাহ ইবনে উমর রাযি. খিলাফতের দায়িত্ব গ্রহণ ও রাজনীতিতে অংশগ্রহণে অনীহার কথা উল্লেখপূর্বক তিনি বিশিষ্ট আনসারী রাযি. সাহাবী হযরত সা'আদ বিন আবী ওয়াক্কাসের রাযি. নাম প্রস্তাব করেন। কিন্তু হযরত আবু মুসা আশআরী রাযি. তাতে দ্বিমত পোষণ করেন। অতঃপর হযরত আমর ইবনুল 'আস রাযি. আরো একাধিক বুযুর্গ সাহাবী রাযি. নাম প্রস্তাব করেন। কিন্তু কারো ব্যাপারেই তাঁরা উভয়ে একমত হতে পারেননি।

অবশেষে সালিশ সাহাবীদ্বয় রাযি. নতুন খলীফা মনোনয়নের বিষয়টি তখন পর্যন্ত যে সকল প্রবীণ সাহাবী রাযি. জীবিত ছিলেন তাঁদের দায়িত্বে ছেড়ে দিয়ে নিজেদের দায়িত্ব পালন শেষ করেন। অবশ্য নতুন খলীফা নিযুক্ত হওয়ার পূর্ব পর্যন্ত হযরত আলী এবং মুআবিয়া রাযি. কে আঞ্চলিক হামি বা প্রশাসক হিসেবে এদের অধীনস্থ এলাকার মধ্যে একথার উপর বহাল রাখা হয় যে, তাঁরা দুজন এ অন্তর্বর্তীকালীন সময়ে নিজ নিজ এলাকার প্রশাসনিক দায়িত্ব পালন করবেন। এ কথার উপর হযরত আবু মুসা আশআরী ও আমর ইবনুল আসের রাযি. সালিশী বৈঠক শেষ হয়। (আল-আওয়াসিম-মিনাল ক্বাওয়াসিম-১৮৪)

এখানে উল্লেখ্য যে, তাহ্কীম তথা সালিশ গঠন ও সালিশ কর্তৃক ফয়সালা ঘোষণার পর হযরত আলী রাযি. ও মুআবিয়ার রাযি. দলের মধ্যে আর কোন যুদ্ধ-বিগ্রহ সংঘটিত হয়নি। বরং উভয় পক্ষই যুদ্ধ বিরতি মেনে নেয় এবং তার উপর বহাল থাকে।

কল্পিত ইতিহাসের গোড়ার কথা

এ স্থানে এসে কতিপয় ঐতিহাসিক মহানবীর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তিরোধানের পর ৫/৭ জন সাহাবী রাযি. ব্যতিরেকে অবশিষ্ট সকল সাহাবীর রাযি. মুরতাদ হয়ে যাওয়ার জঘন্য আক্বীদায় বিশ্বাসী শিয়াদের মিথ্যা ও জাল বর্ণনার উপর ভিত্তি করে সালিশী চুক্তি ও পরবর্তী ঘটনা এরূপে লিখেছেন যে নির্ধারিত সময়ে যখন সাহাবীদ্বয়ের রাযি. সালিশী বৈঠক আরম্ভ হয় তখন উভয় সালিশ হযরত আলী ও মুআবিয়া রাযি. উভয়কেই বরখাস্ত করার সিদ্ধান্তে একমত হন। অতঃপর হযরত আমর ইবনুল 'আস রাযি. চাতুরীর আশ্রয় নিয়ে হযরত আবু মুসা আশআরী রাযি. কে প্রথমে তাঁর সিদ্ধান্ত জনসমক্ষে ঘোষণার আহ্বান জানান। চুক্তি অনুযায়ী তিনি স্বাভাবিক ভাবে উভয়কেই খলীফার পদ হতে বরখাস্ত বলে ঘোষণা করেন। আর আমর ইবনুল 'আস রাযি. বললেন- বরখাস্ত করছি কিন্তু মুআবিয়া রাযি. কে খলীফা হিসেবে বহাল রাখছি। মিথ্যা রচনাকারী শিয়ারা অতঃপর এ বিশিষ্ট দুই বুযুর্গ সাহাবীর রাযি. মধ্যে এমন অশ্লীল বাক্য বিনিময়ের কল্পিত বর্ণনাও দিয়েছে যা একদিকে নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এর সাহাবী রাযি. চরিত্রের সাথে মোটেও সংগতিপূর্ণ নয় এবং অপর দিকে তা মেনে নেয়া শুধু ঐ সকল পাপিষ্ঠ দুরাচারীদের পক্ষেই সম্ভব যারা সাহাবীগণের রাযি. সমালোচনার ব্যাপারে মহানবীর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম স্পষ্ট সতর্কবাণী উপেক্ষা করে তাদের দোষ চর্চা ও দোষ রচনায় লিপ্ত হয়।

হযরত আমর ইবনুল আসে রাযি. বিশ্বাসঘাতকতা ও চাতুরীর ঘটনা যে শুধুই কল্পিত ও মিথ্যা তা সামান্য চিন্তা করলেই অনুমতি হয়। কেননা পূর্বেই উল্লেখ করা হয়েছে যে হযরত মুআবিয়া রাযি. এ পর্যন্ত কখনোই খিলাফতের দাবীই করেননি এবং তাকে খলীফা হিসেবে মানার জন্য তাঁর সমর্থকদের নিকট হতে তিনি কোনরূপ বাইআতও গ্রহণ করেননি। বরং তিনি শুধু হযরত উসমানের রাযি. নিকটাত্মীয় হওয়ার কারণে তাঁর হত্যাকাণ্ডের বিচারের দাবীদার ছিলেন। সে হিসেবে তিনি তার কিসাসের দাবীতে যুদ্ধ করে 'আসছিলেন এবং বরাবর হযরত আলী রাযি. কেও এ কথাই বলে 'আসছিলেন যে, আপনি হযরত উসমানের রাযি. হত্যাকারীদের বিচার করুন। আমি আপনাকে খলীফা মেনে নিয়ে আপনার হাতে বাই'আত হচ্ছি। তাছাড়া যখন সর্বপ্রথম এ কথার উপর সালিশী চুক্তি হয়েছিল যে, উভয় সালিশ ঐক্যমতের ভিত্তিতে কুরআন অনুযায়ী যে ফয়সালা করবেন- তা উভয় পক্ষ মেনে নিবেন, তখন হযরত আমর ইবনুল আসের রাযি. এ কথিত মিথ্যাচার ও বিশ্বাসঘাতকতার আশ্রয় নিয়ে তাঁর কি লাভ হবে? কেননা- তাদের বর্ণনা অনুযায়ী তো হযরত আলী রাযি. কে বরখাস্ত করে হযরত মুআবিয়া রাযি. কে খলীফা বানানোর তথাকথিত ঘোষণা তার একক সিদ্ধান্ত ছিল, উভয়ের ঐক্যমতের ভিত্তিতে ছিল না। কাজেই তা গ্রহণযোগ্য হতে পারে না। সুতরাং এ ধরনের অর্থহীন কাজ হযরত আমর ইবনুল 'আস রাযি.- এর মত বিচক্ষণ সাহাবীর রাযি. পক্ষ থেকে কল্পনাও করা যায় না। তাই সেই কল্পকথা অপবাদমূলক ও মিথ্যাচার স্বার্থ প্রণোদিত।

মূলতঃ সন্ধি চুক্তির পরবর্তী ঘটনার এরূপ বিবরণ সর্বপ্রথম ঐতিহাসিক ইমাম ইবনে জারীর ত্বাবারী তাঁর বিখ্যাত ইতিহাস গ্রন্থ 'তারীখে ত্বাবারী' তে উল্লেখ করেন। অতঃপর তাঁরই অনুসরণে অপরাপর ইতিহাসবিদগণ তাঁদের রচিত ইতিহাসগ্রন্থ সমূহে উক্ত কিতাবের রেফারেন্স দিয়ে কোনরূপ মন্তব্য ছাড়াই এ ঘটনাটি উল্লেখ করেছেন। এভাবে সংশ্লিষ্ট ঘটনার এ মিথ্যা ও জাল বিবরণটি জগদ্বিখ্যাত হয়ে পড়েছে।

কিন্তু এ অন্যায়ের দোষ ইমাম ইবনে জারীর ত্বাবারীর উপর বর্তাবে না। কারণ, তাঁর গ্রন্থের ভূমিকায় তিনি স্পষ্টতঃ বলে দিয়েছেন যে, সব কথার সত্যতা ও শুদ্ধতা যাচাই করে আমি এ গ্রন্থ রচনা করিনি, বরং যার নিকট যেরূপ বর্ণনা পেয়েছি- তাই উল্লেখ করেছি। তবে সুধীবৃন্দের জন্য প্রতিটি ঘটনার সত্যতা যাচাইয়ের সুবিধার্থে বর্ণনার তথ্যসূত্র তথা বর্ণনাকারীদের নাম- পরিচয় উল্লেখ করে দিয়েছি। যাদের বিস্তারিত জীবনালেখ্য 'আসমাউর রিজাল বিষয়ক গ্রন্থসমূহে বর্ণিত আছে। পাঠকবৃন্দ 'আসমাউর রিজাল গ্রন্থের মাধ্যমে বর্ণনাকারীর নির্ভরযোগ্যতা যাচাই করে ঘটনার সত্যতার বা জাল হওয়া নির্ণয় করবেন।

তারীখে ত্বাবারীতে এ ঘটনা বর্ণনাকারী হিসেবে কুখ্যাত আবু-মিখনাফের নাম পরিলক্ষিত হয়। 'আসমাউর রিজালের কিতাবসমূহ অধ্যয়ন করলে তার নামে ইসলামের ইতিহাসের বিভিন্ন ঘটনাবলীর ব্যাপারে অসংখ্য মিথ্যা ও জাল বর্ণনা তৈরীর অভিযোগ পাওয়া যায়। সকল মুহাদ্দিসীনের বর্ণনা অনুযায়ী জানা যায় যে, সে ছিল কট্টর শিয়া। যারা আব্দুল্লাহ্ বিন সাবার সাবায়ী গোষ্ঠীর অন্তর্ভুক্ত একটি জঘন্য বাতিল পন্থী দল ছিল। দীন ও ইসলাম সম্পর্কে যাদের জঘন্যতম বিশ্বাস সমূহের মধ্যে একটি বিশ্বাস এও ছিল যে, মহানবীর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তিরোধানের পর পাঁচ বা সাত জন সাহাবা রাযি. ব্যতীত সকল সাহাবীই রাযি. কাফির ও মুরতাদ হয়ে গিয়েছিল। (নাউযুবিল্লাহ) এ কারণে তারা বুযুর্গ সাহাবীদের রাযি. প্রতি উম্মতের আস্থা বিনষ্টের ষড়যন্ত্র হিসেবে তাঁদের নামে নানা ধরনের মিথ্যা অপবাদ আরোপ করে জাল ঘটনা তৈরী করে। হযরত আলী ও হযরত মুআবিয়ার রাযি. মধ্যে সিফফীনের যুদ্ধের পরে যে সন্ধি চুক্তি হয়, তার দুই সালিশদ্বয় হযরত আমর ইবনুল 'আস ও হযরত আবু মুসা আশ'আরীর রাযি. ব্যাপারে মিথ্যাবাদী আবু মিখনাফের রচিত বর্ণনা সে সকল জাল বর্ণনারই অন্তর্ভুক্ত। (তথ্যসূত্র: আল্-'আওয়াসিম-মিনাল ক্বাওয়াসিম, পৃঃ ১৭৪-১৭৯')

এদিকে হযরত আলী ও হযরত মুআবিয়ার রাযি. সালিশী চুক্তির পর নতুন করে আবার সমগ্র মুসলিম উম্মাহর ঐক্যমত্যের ভিত্তিতে খিলাফত ব্যবস্থা পুনঃপ্রতিষ্ঠার সম্ভাবনা দেখা দেয়ায় সাবায়ীরা রাযি. নিজেদের প্রমাদ গোনে। তাই তারা এ সালিশী চুক্তির বিরোধিতা করে এ বিপক্ষে অপপ্রচার চালিয়ে জনমনে সে সম্পর্কে বিভ্রান্তি সৃষ্টিতে সচেষ্ট হয়। অথচ সিফফীনের যুদ্ধে হযরত আলীর রাযি. নিশ্চিত বিজয়কে বানচাল করার জন্য তারাই হযরত আলী রাযি. কে চুক্তি মেনে নিতে বাধ্য করেছিল।

জঙ্গে সিফফীনের পর হযরত আলীর রাযি. পক্ষ থেকে সালিশী চুক্তি সম্পাদনের ঘোষণা দেয়ার সঙ্গে সঙ্গে একদল সাবায়ী এ বলে বিরোধিতা আরম্ভ করে যে, আল্লাহ্‌র ফয়সালা ব্যতীত কোন মানুষ তথা সালিশের ফয়সালা মানা ইসলাম বিরোধী ও কুফরী কাজ। এই বলে তারা হযরত আলীর রাযি. দল হতে 'খুরুজ' (বিদ্রোহ) করে বের হয়ে যায়। তখন হতে এ দলটি 'খারেজী' নামে প্রসিদ্ধ হয়। হযরত আলী রাযি. তাদের বুঝালেন- আমরা তো সালিশদ্বয় হতে এ অঙ্গীকার নিয়েছি যে, তারা আল্লাহর বিধান তথা কুরআন অনুযায়ীই ফয়সালা করবেন। তারা যদি আল্লাহর বিধান মে ফয়সালা করেন, তবেই আমরা তা মেনে নিব। নতুবা তা আমরা মানব না। তখন খারেজী দল পাল্টা প্রশ্ন করল- তাহলে আপনি কি অন্যায় ভাবে হত্যার ব্যাপারে কোন মানুষের ফয়সালা মানাকে বৈধ মনে করেন? অথচ কুরআনে তার শাস্তি নির্ধারিত আছে। হযরত আলী রাযি. উত্তর দিলেন- আমি তো কোন মানুষের ফয়সালা কখনো মেনে নেয়নি; বরং আমি কুরআনের ফয়সালাই গ্রহণ করেছি। তবে এ ফয়সালার ঘোষণা দিবেন সালিশদ্বয়। কুরআন শরীফ তো একটি কিতাব, তাতো নিজে ফয়সালা ঘোষণা করতে পারে না।

হযরত আলী রাযি. এত সব যুক্তি-তর্ক দিয়ে বুঝানোর পর বাহ্যিকভাবে মেনে নিলেও বস্তুতঃ খারেজীরা তাদের মতের ব্যাপারে অটল থাকে।

খারেজী সম্প্রদায়ের আত্মপ্রকাশ ও তাদের অপকীর্তি

আব্দুল্লাহ বিন সাবার এ দলটি এত দিনে অনেক শক্তি অর্জন করেছিল। তাই তারা এখন হযরত আলীর রাযি. দল হতে বিচ্ছিন্ন হয়ে তাঁর বিরুদ্ধে আলাদা দল গঠন করে যুদ্ধ করারও দুঃসাহস দেখায়। তারা সালিশী চুক্তিকে কুফরী কাজ আখ্যা দিয়ে হযরত আলী ও হযরত মুআবিয়া রাযি. উভয়কেই কাফির ঘোষণা করে এবং তাদের বিরুদ্ধে অপপ্রচার শুরু করে দেয়। তাছাড়া সালিশী চুক্তির সমর্থক সাধারণ মুসলিম জনগণকেও তারা কাফির ঘোষণা করে এবং তাঁদের হত্যা করা ও তাঁদের সম্পদ লুণ্ঠন করাকে বৈধ ঘোষণা দিয়ে বিভিন্ন স্থানে খুন, জখম, লুণ্ঠনসহ বিভিন্ন ধরনের বিশৃঙ্খলা সৃষ্টিতে লিপ্ত হয়।

তাদের এ অপতৎপরতা হযরত আলীর রাযি. ভূখণ্ডেই বেশী ছিল। হযরত আলী রাযি. তখন জনগণের জানমালের নিরাপত্তা রক্ষায় খারেজীদের বিরুদ্ধে কঠোর ব্যবস্থা গ্রহণ করেন এবং একাধিক অভিযানে তাঁদের অধিকাংশকেই হত্যা ও বন্দী করেন।

খারেজীদের বিরুদ্ধে হযরত আলীর রাযি. এ সকল অভিযানের কারণে হযরত আলী রাযি. ও অপরাপর মুসলিম নেতৃবৃন্দের বিরুদ্ধে তাদের প্রতিশোধস্পৃহা অনেকগুণে বেড়ে যায়। এ জন্য তারা এক সঙ্গে হযরত আলী, মুআবিয়া ও আমর ইবনুল 'আস রাযি. কে হত্যা ও খিলাফত ব্যবস্থা পুনঃপ্রতিষ্ঠার পথ চিরতরে রুদ্ধ করার গভীর ষড়যন্ত্র আঁটে। সে মতে তিন খারেজী আব্দুর রহমান বিন মুলজিম, বারক বিন আব্দুল্লাহ ও আমর বিন বাকর মক্কায় মিলিত হয়ে আলোচনা করল যে, আমাদের

(খারেজী) ভাইদের মৃত্যুর পর জীবনের স্বাদ নেই। আমরা এখন আলী, মুআবিয়া ও আমর বিন 'আস রাযি. কে হত্যা করে আমাদের ভাইদের হত্যার প্রতিশোধ নেয়ার মাঝেই জীবনের সর্বশেষ স্বার্থকতা দেখতে পাচ্ছি। অতঃপর তারা সিদ্ধান্ত নিলো যে, আব্দুর রহমান বিন মুলজিম হযরত আলী রাযি. কে, বারক হযরত মুআবিয়া রাযি. কে এবং আমর হযরত আমর ইবনুল 'আস রাযি. কে একই দিন একই সময়ে শহীদ করবে। এর জন্য তারা ১৭ই রমজান ৪০ হিজরী তারিখকে দিনক্ষণ হিসেবে নির্ধারণ করলো।

হযরত আলী রাযি. -এর শাহাদাত

সিদ্ধান্ত অনুযায়ী আব্দুর রহমান ইবনে মুলজিম হযরত আলী রাযি. আবাসস্থল কুফায় এলো। এখানে এসে যে, খারেজী গোত্রের এক মহিলার সঙ্গে বিবাহ বন্ধনে আবদ্ধ হয়ে স্বামী-স্ত্রী উভয়ে মিলে হযরত আলী রাযি. কে হত্যার ফন্দি আঁটতে লাগল। তারা উভয়ে এ কাজে আরো দু'জন খারেজীকে অন্তর্ভুক্ত করল। অবশেষে রমজানের ১৭ তারিখে ইবনে মুলজিম ও তার দুই সহযোগী কুফার জামে মসজিদে আত্মগোপন করে বসে রইল। ফজরের নামাযের সময় হযরত আলী রাযি. মসজিদে প্রবেশ করে যথারীতি ঘুমন্তদের জাগ্রত করতে লাগলেন। ঘাতকদের একজন গুপ্তস্থান হতে বের হয়ে তাঁর উপর তলোয়ারের আঘাত হানল। হযরত আলী রাযি. মিহরাবে লুটে পড়লেন, ইবনে মুলজিম তাঁর মাথায় পুনরায় আঘাত কর। এতে- তার সমস্ত শরীর ও দাড়ি রক্তে রঞ্জিত হয়ে গেল। ইবনে মুলজিম ধরা পড়ল ও অপর দু'জন পালিয়ে যেতে সক্ষম হল। আশংকাজনক অবস্থায় হযরত আলী রাযি. কে তাঁর বাসভবনে নিয়ে যাওয়া হল। অবশেষে সেদিন রাতেই তিনি শাহাদাতের অমিয় সুধা পান করেন। অতঃপর হযরত হাসান রাযি. খলীফা নির্বাচিত হওয়ার পর ইবনে মুলজিমের মৃত্যুদণ্ড কার্যকর করেন।

এদিকে ইবনের মুলজিমের অপর সাথী বারক বিন আব্দুল্লাহও দামেস্ক (সিরিয়ার রাজধানী) পৌঁছে ঐ তারিখেই হযরত মুআবিয়া রাযি. যখন ফজরের নামাজ পড়ে মসজিদ হতে বেরুচ্ছিলেন, তখন তাঁর উপর আক্রমণ করে। তিনি সামান্য আহত হন। অতঃপর ঘাতক বারককে গ্রেফতারের পর হত্যা করা হয়। এ ঘটনার পর বিশেষতঃ নামাযের সময়ের জন্য হযরত মুআবিয়া রাযি. নিজের জন্য দেহ রক্ষী নিয়োজিত করেন। ইবনে মুলজিমের তৃতীয় সঙ্গী আমর বিন বাকরও মিসরে নির্দিষ্ট দিনক্ষণে হযরত আমর ইবনুল 'আসের রাযি. হত্যার চেষ্টা চালায়। কিন্তু সৌভাগ্যক্রমে তিনি সেদিন অসুস্থ থাকার কারণে মসজিদে 'আসতে পারেননি। তাঁর পরিবর্তে সেদিক খারিজা বিন আবী হাবীবা নামাযের ইমামতি করেন। ঘাতক তাকেই কাঙ্খিত ব্যক্তি মনে করে আক্রমণ চালায় এবং শহীদ করে ফেলে। অতঃপর নিজেও বন্দী হয়ে নিহত হয়।

পঞ্চম খলীফা হযরত হাসান রাযি. ও তাঁর পরবর্তী খলীফা হযরত মুআবিয়া রাযি.: হযরত আলী রাযি. চতুর্থ খলীফা ছিলেন। তাঁর শাহাদাতের পর কূফাবাসী তথা হযরত আলীর রাযি. অনুসারীগণ এক বাক্যে হযরত আলী রাযি. জেষ্ঠ্যপুত্র হযরত হাসান ইবনে আলী রাযি. কে খলীফা মনোনীত করে তাঁর হাতে বাই'আত হন। এদিকে শাম (সিরিয়া) বাসীগণ হযরত আলী রাযি. শাহাদাতের সংবাদ শ্রবণ করতঃ সকলে মিলে হযরত মুআবিয়া রাযি. কে খিলাফতের দায়িত্ব গ্রহণের আহবান জানান এবং সকলে তাঁকে খলীফা মনোনীত করে তাঁর হাতে বাই'আত হন।

হযরত হাসান ও হযরত মুআবিয়া রাযি. উভয়েই ইসলামী বিশ্বের ভিন্ন ভিন্ন প্রান্তে খলীফা মনোনীত হন। যদ্দরুন ইসলামী বিশ্বে প্রথমবারের মত দুই খলীফার আবির্ভাব এবং ইসলামী দুনিয়া স্থায়ীভাবে দুই শিবিরের বিভক্ত হয়ে যাওয়ার আশংকা দেখা দেয়। অথচ আল্লাহ ও রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম- এর নির্দেশ মুতাবিক ইসলামী খিলাফত ব্যবস্থার রূপরেখা অনুযায়ী সমগ্র মুসলিম বিশ্ব ঐক্যবদ্ধ থেকে একই খলীফার অধীনে একাধিক 'আমিল' বা গভর্নর- এর মাধ্যমে পরিচালিত হওয়ার কথা। এমতাবস্থায় এ দায়িত্ববোধের প্রেক্ষিতে হযরত হাসান ও হযরত মুআবিয়া রাযি. সদলবলে কুফা অভিমুখে রওয়ানা হন।

হযরত হাসান রাযি. এ খবর জানতে পেলে তিনি হযরত মুআবিয়া রাযি. কে বাধা দানের জন্য 'মাদায়েন' অভিমুখে রওয়ানা হন। উভয় পক্ষ বিশাল বাহিনীসহ মুখোমুখি অবস্থান গ্রহণ করেন। এমতাবস্থায় অতীতের চেয়ে আরো ব্যাপক ও ভয়াবহ গৃহযুদ্ধ এড়ানোর জন্য হযরত হাসান ও হযরত মুআবিয়া রাযি. উভয়ই শান্তির লক্ষ্যে আলোচনা ও সন্ধির প্রয়াস চালান।

এখানেও সাবায়ী ও খারেজীরা ঐক্য প্রচেষ্টা- ব্যর্থ করার সর্বাত্মক চেষ্টা চালায়। সন্ধিতে সম্মত হওয়ায় একমত খারেজী হযরত হাসান রাযি. কে ও তাঁর পিতার ন্যায় কাফির হয়ে যাওয়ার অপপ্রচার চালিয়ে তাঁর বাহিনীতে বিভ্রান্তি ছড়ায়। এমনকি এক খারেজী দূর হতে তীর নিক্ষেপে হযরত হাসান রাযি. কে হত্যার চেষ্টা করে। তিনি আহত হয়ে কিছুদিনের চিকিৎসায় সুস্থ হন।

হযরত হাসান রাযি. ও হযরত মুআবিয়া রাযি.- এর মতৈক্যে একক খিলাফত প্রতিষ্ঠা

অতঃপর হযরত মুআবিয়া রাযি. হযরত হাসানের রাযি. নিকট দূত মারফত সন্ধি প্রস্তাব পাঠান। হযরত মুআবিয়ার রাযি. বিশেষ দূত আব্দুল্লাহ বিন 'আমির তাঁর দলবল সহ হযরত হাসানের রাযি. দলের মুখোমুখি হলে, তিনি চিৎকার করে বললেনঃ হে ইরাকবাসী ভাইয়েরা! আমরা যুদ্ধের উদ্দেশ্যে আসিনি, বরং মুআবিয়ার রাযি. পক্ষ হতে সন্ধি প্রস্তাব নিয়ে এসেছি। হযরত হাসান রাযি. কে আমার সালাম পৌঁছে দাও এবং আমার পক্ষ হতে তাঁর দরবারে এ নিবেদন পেশ কর যে, মুসলমানদের যেন ধ্বংসের হাত থেকে রক্ষা করেন।

ইরাকবাসী হযরত মুআবিয়ার রাযি. প্রস্তাব শুনে যুদ্ধ না করাকেই পছন্দ করল। হযরত হাসান রাযি. ও স্বীয় বাহিনী নিয়ে শিবিরে প্রত্যাবর্তন করলেন। হযরত মুআবিয়ার রাযি. দূতের নিকট হযরত হাসান রাযি. এ উত্তর পাঠান যে, আমি কিছু শর্তের সাথে হযরত মুআবিয়ার রাযি. সাথে সন্ধি করতে ও খিলাফতের দায়িত্ব হতে সরে দাড়াতে প্রস্তুত আছি। আব্দুল্লাহ বিন আমির ফিরে এসে হযরত মুআবিয়া রাযি. কে সন্ধি আলোচনা শুনান। হযরত মুআবিয়া রাযি. মুসলিম বিশ্বের ভয়াবহ গৃহযুদ্ধে আশংকা হতে মুক্তির আশা দেখা দেয়ায় অত্যন্ত আনন্দিত হন এবং একটি সাদা কাগজে দস্তখত ও সিলমোহর দিয়ে আব্দুল্লাহ বিন আমিরের হাতে দিয়ে বলেন- এটা হাসান রাযি. কে দিয়ে বলল- যে শর্ত ইচ্ছা লিখে দিন। আমি (মুআবিয়া) তা মেনে নিব।

হযরত হাসান রাযি.- এর শর্তাবলী:

১. ইরাকবাসীকে পূর্ণ নিরাপত্তা দিতে হবে এবং অতীতের ঘটনাবলীর কারণে কাউকে যেন গ্রেফতার না করা হয়।

২. আহওয়াজের সম্পূর্ণ রাজস্ব আমার নামে লিখে দিতে হবে।

৩. অনুরূপভাবে আমার ভাই হুসাইন রাযি. কে বৎসরে বিশ লক্ষ দিরহাম দিতে হবে।

৪. রাষ্ট্রীয় অনুদান ও উপহারের বেলায় বনু হাশিমের হক অন্যদের চেয়ে অগ্রগণ্য মনে করতে হবে।

হযরত হাসানের রাযি. শর্তাবলীর উদ্দেশ্যঃ

হযরত হাসান রাযি. আহওয়াজের রাজস্ব নিজের নামে লিখে দেয়া ও হযরত হুসাইন রাযি. কে বাৎসরিক বিশ লক্ষ দিরহাম দেয়ার যে দাবী করছিলেন, তা তাদের ব্যক্তিগত খরচ বা পারিবারিক ভোগ-বিলাসে রাষ্ট্রীয় সম্পদ অপব্যয়ের জন্য ছিল না। বরং হযরত আলী রাযি. খলীফা থাকার বৎসরগুলোতে প্রচুর সংখ্যক গরীব-মিসকিন ও বিধবা-অনাথদের রাষ্ট্রীয় তহবিল হতে দান করতেন। তার মৃত্যুর পর তারা সকলের তাঁর দুই পুত্র হাসান ও হুসাইনের রাযি. নিকটই 'আসত ও ভীড় জমাত। হযরত হাসান রাযি. যে অল্প সময় (ছয়মাস) খলীফা ছিলেন, তখন তিনি ও তাঁর ভাই হুসাইন রাযি. রাষ্ট্রীয় তহবিল হতে তাদের দান করতেন। খিলাফতের দায়িত্ব হতে সরে দাঁড়াবার পর যেন ঐ সকল গরীব-মিসকীনদের অসহায় অবস্থায় খালি হাতে ফিরিয়ে দিতে না হয়, যে জন্য হযরত হাসান রাযি. খিলাফতের পদত্যাগ কালে এ প্রস্তাব করেন।

সন্ধি চুক্তি সম্পাদনের পর হযরত হাসান রাযি. খিলাফতের দায়িত্ব হতে সরে আসেন। অতঃপর হযরত হাসান ও হযরত মুআবিয়া রাযি. উভয়ে কুফায় আগমন করেন। কুফার জামে মসজিদে হযরত মুআবিয়া রাযি. কুফাবাসীর নিকট হতে বাই'আত গ্রহণ করেন। সর্বপ্রথম হযরত হাসান রাযি. তাঁর হাতে বাই'আত হন।

খিলাফতের দায়িত্ব থেকে মুক্ত হয়ে হযরত হাসান রাযি. মদীনা শরীফে আগমন করেন এবং অবশিষ্ট জীবন স্বীয় নানা মহানবীর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম সান্নিধ্যে অতিবাহিত করেন। এভাবে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর এই ভবিষ্যদ্বানী বাস্তবায়িত হলোঃ "আমার এ ছেলে সাইয়িদ-নেতা হবে। আমার ধারণা- আল্লাহ তা'আলা তার দ্বারা মুসলমানদের দু'টি বিরাট দলের মধ্যে সন্ধি স্থাপন করাবেন।" উল্লেখ্য, হযরত হাসান রাযি. সর্বমোট ছয় মাস খলীফা ছিলেন।

ইতিপূর্বে উল্লেখ করা হয়েছে যে, কুখ্যাত আব্দুল্লাহ বিন সাবার ষড়যন্ত্রকারী ও সন্ত্রাসবাদী গোষ্ঠীর দ্বারা গঠিত খারিজী দলের এক ঘাতক কর্তৃক হযরত আলী রাযি. শহীদ হন। অতঃপর তাঁর বড় ছেলে হযরত হাসান রাযি. খলীফা মনোনীত হন। হযরত হাসান রাযি. ছিলেন অত্যন্ত বুদ্ধিমান, বিচক্ষণ ও ব্যক্তিত্বসম্পন্ন একজন সাহাবী রাযি. । তাঁর সম্পর্কে রাসূলুল্লাহর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম একটি সুপ্রসিদ্ধ ভবিষ্যদ্বানী এই ছিল যে, তাঁর দ্বারা মুসলমানদের দুটি বিরোধী পক্ষের বিরোধের অবসান ঘটবে। আল্লাহর কুদরতে হযরত হাসান রাযি. খলীফা নির্বাচিত হওয়ার সঙ্গে সঙ্গেই রাসূলুল্লাহর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম উক্ত অকাট্য ভবিষ্যদ্বানী বাস্তবায়িত হওয়ার কাজ অগ্রসর হতে লাগল। এদিকে হযরত হাসান রাযি. এবং তাঁর সমর্থক কুফা ও ইরাকবাসী মুসলমান, অপর দিকে হযরত মুআবিয়াহ রাযি. ও তার সমর্থক সিরিয়াবাসী মুসলমান- এ দুই পক্ষের মধ্যে আব্দুল্লাহ বিন সাবার মুনাফিক দল ধারাবাহিক ষড়যন্ত্রের মাধ্যমে রক্তক্ষয়ী বিরোধ সৃষ্টি পাঁয়তারা করছিল। সেই বিরোধ অবসানের কাজ অর্থাৎ হযরত মুআবিয়াহ রাযি. সঙ্গে সন্ধির প্রয়াস আরম্ভ করলেন। এতে ইবনে সাবার দল চিরাচরিতরূপে মুসলমানদের ঐক্যের মাঝে নিজেদের অস্তিত্ব নিয়ে প্রমাদ গুনলো এবং হযরত হাসানের রাযি. উপর ক্ষেপে উঠল। এমনকি এক পর্যায়ে তারা তাঁর উপর আক্রমণ করে বসল এবং তাঁর সবকিছু লুণ্ঠন করে নিলো। এরপর হযরত হাসান রাযি. মুসলমানদের ঐক্য প্রতিষ্ঠায় দৃঢ় প্রতিজ্ঞ এবং আরো অধিক তৎপর হলেন। মুসলমানদের সর্বনাশকারী খিলাফতের শত্রু এই পঞ্চম বাহিনীকে দমনের কাজে একমাত্র হযরত মুআবিয়াহ রাযি. কেই উপযুক্ত ব্যক্তি মনে করে তাঁর পক্ষে তিনি খিলাফতের পদত্যাগ করলেন এবং স্বতঃস্ফূর্তভাবে তাঁর হাতে বাই'আত হয়ে তাঁকে খলীফা হিসেবে বরণ করে নিলেন। এভাবে হিজরী ৪১ সনে হযরত মুআবিয়াহ রাযি. হাজার হাজার সাহাবায়ে কিরামের রাযি. উপস্থিতিতে মুসলিম জাহানের সর্বসম্মত খলীফা নির্বাচিত হন। সমগ্র মুসলিম মিল্লাতের মুখে এবং ইতিহাস গ্রন্থে এবং বৎসরকে "আমুল-জামা'আহ বা ঐক্যের বৎসর" বলা হয়েছে।

দ্বিতীয় অধ্যায়

হযরত মুআবিয়ার রাযি. কীর্তিগাঁথা শাসনামল

হযরত মুআবিয়ার রাযি. খিলাফতকালে সামরিক, রাজনৈতিক ও অর্থনৈতিক দিক থেকে মুসলিম উম্মাহর শক্তি ও গুরুত্ব বহুগুণ বৃদ্ধি পেয়েছিল। হযরত উসমানের রাযি. শাহাদাতের পর মুনাফিক সাবায়ীদের প্রচেষ্টায় মুসলমানদের দুঃখজনক পারস্পরিক হানাহানিতে মুসলিম শাসনের দিগ্বিজয়ের যে ধারা দীর্ঘদিন যাবৎ বন্ধ ছিল, হযরত মুআবিয়াহ রাযি. খলীফা নির্বাচিত হয়ে কাফির শাসকদের বিরুদ্ধে জিহাদ ও মুসলিম জাহানের সীমান্ত সম্প্রসারণের সেই ধারা আবার পুরোদমে উজ্জীবিত করেন। তাঁর শাসনামলেই মধ্য এশিয়ার সিজিস্তান, সুদান, কাবুল ও সিন্ধুর অংশ বিশেষ বিজিত হয়। পঁয়তাল্লিশ হিজরীতে আফ্রিকা অভিযান পরিচালনা করে তিনি বিস্তীর্ণ ভূখণ্ড ইসলামী খিলাফতের মানচিত্রে সংযোজন করেন। এছাড়া সিসিলি অভিযান এবং কনস্টান্টিনোপল ও সকরকন্দ যুদ্ধ তাঁর আমলেই সংঘটিত হয়। তাঁর খিলাফতকালেই হিন্দুস্তানের ভূখণ্ডে এবং আমু দরিয়া অতিক্রম করে বুখারায় সর্বপ্রথম মুসলিম ফৌজ প্রবেশ করে। মুসলিম ফৌজের এই অব্যাহত বিজয় যাত্রা কাফিরদের শিবিরে নতুন করে ত্রাস সৃষ্টি করে।

হযরত উসমানের রাযি. খিলাফতকালে সিরিয়ার গভর্নর থাকাবস্থায় তিনি হযরত উসমানের রাযি. অনুমতিতে ইসলামী রাষ্ট্রের জন্য বিশ্বের প্রথম নৌবাহিনী প্রতিষ্ঠা করেছিলেন এবং ২৭ হিজরীতে ইসলামের ইতিহাসে সর্বপ্রথম নৌবহর যোগে সাইপ্রাস অভিযান পরিচালনা করে নবী কারীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম- এর নিম্নোক্ত সুসংবাদের অধিকারী হনঃ

“আমার উম্মতের যে প্রথম সৈন্যদলটি নৌ অভিযানে অংশ নিবে, তারা নিজেদের জন্য জান্নাত ওয়াজিব করে নিয়েছে।” এ অভিযানে সাহাবীগণের রাযি. এক মুবারক জামা’আত তাঁর সাথে ছিলেন।

খিলাফত লাভের পর নৌশক্তির উন্নয়নের প্রতি তিনি বিশেষ মনোযোগ নিবিষ্ট করেন। ফলে মিসর ও সিরিয়ার উপকূলীয় অঞ্চলে অসংখ্য জাহাজ নির্মাণ কেন্দ্র প্রতিষ্ঠিত হয়। এভাবে অল্প কয়েক বছরে এক হাজার সাতশ’ বৃহদায়তন ও মজবুত জাহাজের সমন্বয়ে গড়ে উঠে এক বিরাট নৌবহর যা রোমদের মুকাবিলায় থাকত সদা প্রস্তুত। এ বিরাট নৌবহরের সাহায্যেই স্বীয় খিলাফত আমলে (হিজরী ৪৯ সনে) তিনি সুফিয়ান বিন আওফের পরিচালনায় কনস্টান্টিনোপলের পথে এক বিরাট বাহিনী প্রেরণ করেন। বহুসংখ্যক বিশিষ্ট সাহাবী রাযি. তাতে শরীক ছিলেন। এ বাহিনী সম্পর্কেই আল্লাহর রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম সুসংবাদ দিয়ে গিয়েছিলেন-

“মুসলমানদের প্রথম যে বাহিনী কনস্টান্টিনোপলের জিহাদে যাবে, তাদের জন্য মহান আল্লাহর মাগফিরাত নির্ধারিত।”

হযরত উমরের রাযি. আমলে প্রতিষ্ঠিত ডাক বিভাগ পুনর্বিন্যাস, সম্প্রসারণ ও আধুনিকায়নে হযরত মুআবিয়া রাযি. উল্লেখযোগ্য অবদান রাখেন। বিশাল ইসলামী

খিলাফতের সর্বত্র তিনি ডাক বিভাগের জাল বিছিয়ে দেন। এছাড়া সিল মোহর বিভাগ নামে নতুন একটি গুরুত্বপূর্ণ বিভাগও তিনি প্রতিষ্ঠা করেছিলেন। বাইতুল্লাহ শরীফের খিদমতের জন্য তিনি স্থায়ী সেবক নিযুক্ত করেছিলেন এবং আল্লাহর ঘরের জন্য মূল্যবান রেশমী কাপড়ের গিলাফ তৈরী করেছিলেন।

সুদীর্ঘ একচল্লিশ বছর তিনি খিলাফতের বিভিন্ন দায়িত্ব আঞ্জাম দিয়েছিলেন। এ সুদীর্ঘ শাসনকালের সামগ্রিক পর্যালোচনা শেষে ঐতিহাসিক আল্লামা ইবনে কাছীর রহ. মন্তব্য করে বলেন, "তাঁর শাসনামলে জিহাদের ধারা অব্যাহত ছিল। আল্লাহর দীন অপ্রতিহত গতিতে প্রাধান্য বিস্তার করে চলছিল এবং বিভিন্ন অঞ্চল থেকে গনীমতলব্ধ সম্পদের ঢল নেমে এসেছিল। মোটকথা, তাঁর শাসন ছায়ায় মুসলিম জনসাধারণ সুখ-শান্তি এবং ইনসাফ ও সমৃদ্ধপূর্ণ জীবন-যাপন করছিল।"

জনসাধারণের মনোরঞ্জন, অধিকার ও প্রাপ্য আদায়, ইনসাফ ও ন্যায় বিচার প্রতিষ্ঠা এবং শরী'আতের বিধান প্রয়োগের ক্ষেত্রে তিনি অত্যন্ত সতর্কতা অবলম্বন করতেন। আর তাই জান্নাতের সুসংবাদ প্রাপ্ত দশ সাহাবার অন্যতম বিশিষ্ট সাহাবী হযরত সা'আদ বিন আবী ওয়াক্কাস রাযি. হযরত মুআবিয়ার রাযি. বাড়ীর দিকে ইঙ্গিত করে স্বতঃস্ফূর্ত ভাষায় বলেছেনঃ "হযরত উসমানের রাযি. পর এই ঘরের বাসিন্দার (মুআবিয়ার) চেয়ে অধিক ইনসাফকারী কাউকে আমি দেখিনি।"

হযরত আবু ইসহাক রহ. বলেনঃ হযরত মুআবিয়ার রাযি. শাসনকাল যদি দেখতে, তাহলে ন্যায় ও ইনসাফের কারণে নিঃসন্দেহে তাকে তোমরা 'মাহদী' নামে আখ্যায়িত করতে। বিশিষ্ট ঐতিহাসিক হযরত মুজাহিদ রহ. ও অনুরূপ মন্তব্য করেছেন।

ইমাম আ'মাশের রহ. মজলিসে একবার হযরত উমর বিন আব্দুল আযীযের রহ. ন্যায়পরায়ণতার আলোচনা শুরু হলে, তিনি বলেনঃ তোমরা উমর বিন আব্দুল আযীযের রহ. প্রশংসা করছো, হযরত মুআবিয়ার রাযি. শাসন যুগ দেখলে কি করতে? লোকে জিজ্ঞেস করল- আপনি কি তাঁর সহনশীলতার কথা বলছেন? তিনি বললেন- না, তাঁর ইনসাফ ও ন্যায় বিচারের কথাই বলছি।

হযরত মুআবিয়ার রাযি. ধৈর্য্য ও সহনশীলতা ছিল প্রবাদ তুল্য। এ দু'টো গুণ ছিল তাঁর জীবন ও চরিত্রে অবিচ্ছেদ্য অংশ। চরম বিরুদ্ধাচারণকারীও তার কোন কোন কথার সরাসরি প্রতিবাদ করতো, অশালীন ভাষা ব্যবহার করতো, কিন্তু তা তিনি সহ্য করে নিতেন। বিশিষ্ট মুরুব্বী সাহাবী হযরত জাবির রাযি. বলেনঃ মুআবিয়ার চেয়ে সহনশীল ব্যক্তি আমি আর দেখিনি। হযরত মুআবিয়ার রাযি. নিজেও বলতেনঃ ক্রোধ হজম করায় যে স্বাদ আমি পাই, তা অন্য কিছুতে পাই না।

কিন্তু এ সহনশীলতা ছিল ততক্ষণ, যতক্ষণ প্রতিপক্ষ শান্তি-শৃঙ্খলা বিঘ্নিত করে প্রশাসনিক ক্ষেত্রে বিশৃঙ্খলা সৃষ্টি না করত। নীতি ও আইনের প্রশ্নে সামান্যতম

নমনীয়তা ছিল না তাঁর চরিত্রে। কোথাও কঠোরতার প্রয়োজন হলে দৃঢ়তার সাথে কঠোর পদক্ষেপ গ্রহণ করতেন।

হযরত মুআবিয়ার রাযি. ধৈর্য্য ও ক্ষমা সুন্দর চরিত্রের অসংখ্য ঘটনা ছড়িয়ে ছিটিয়ে আছে ইতিহাসের পাতায় পাতায়। ইবনে আওন বলেনঃ হযরত মুআবিয়ার রাযি. আমলে একজন সাধারণ মানুষও তাঁর পথ রোধ করে বলত- মুআবিয়া আমাদের সাথে তোমার আচরণ দুরস্ত করে নাও। নইলে কিন্তু আমরাই তোমাকে দুরস্ত করে ছাড়ব, হযরত মুআবিয়াহ রাযি. বলতেন- ভাই! কি দিয়ে দুরস্ত করবে শুনি? তারা বলত- হাতের এই লাঠি দিয়ে। মুআবিয়া রাযি. বলতেন- আচ্ছা তাহলে এমনিতেই আমি দুরস্ত হয়ে যাচ্ছি।

খলীফা হযরত মুআবিয়া রাযি. প্রতিদিন একটি নির্দিষ্ট সময়ে মসজিদে কুরসী পেতে বসে যেতেন। এ সময় সর্বস্তরের জনসাধারণ বিভিন্ন নালিশ-অভিযোগ এবং অভাব ও প্রয়োজন নিয়ে হাজিত হত। একে একে সবার কথা তিনি মনোযোগ সহকারে শুনতেন এবং যথাসাধ্য তাদের সন্তুষ্ট করতে ও অভাব-অভিযোগ পূরণের ব্যবস্থা করতেন। এভাবে সর্বশেষ ফরিয়াদী বিদায় হওয়া পর্যন্ত তিনি বসে থাকতেন। অতঃপর নেতৃস্থানীয়দের সাক্ষাৎকার দিতেন এবং তাদের বলতেন- "আপনারা স্ব-স্ব গোত্রের ও এলাকার নেতৃস্থানীয় হওয়ার সুবাদের এই বিশেষ মজলিসে উপস্থিত হতে পেরেছেন। সুতরাং এখানে উপস্থিত হওয়ার সুযোগ যারা পায় না, সেসব সাধারণ জনগণের অভাব-অভিযোগ ও তাদের কথা আমার কাছে তুলে ধরা আপনাদের পবিত্র দায়িত্ব।"

এভাবে দিনের পাঁচটি সময় তিনি নির্ধারণ করে রেখেছিলেন সাধারণ লোকদের জন্য সর্বস্তরের জনসাধারণের জন্য সেখানে সাক্ষাৎ ও অভিযোগ উত্থাপনের অবাধ অনুমতি ছিল। সবাই সেখানে আমীরুল মুমিনীনের দরবারে নালিশ দাখিল করতে পারতেন।

হযরত মুআবিয়ার রাযি. বলিষ্ঠ ব্যক্তিত্ব অমায়িক চরিত্র, অতুলনীয় অবদান ও অনুপম শাসনামলের তুলনাহীন ও বৈচিত্র্যময় সকল দিকের যতটুকু বিবরণ আরবী ভাষার রচিত মুসলিম ঐতিহাসিকগণের নির্ভরযোগ্য ইতিহাস গ্রন্থসমূহে পাওয়া যায়, তার বঙ্গানুবাদের জন্য বিশাল কলেবরের গ্রন্থ রচনার প্রয়োজন।

বস্তুতঃ সকল বিচারেই হযরত মুআবিয়ার রাযি. শাসনকাল খিলাফতে রাশিদা পরবর্তী ইসলামী ইতিহাসের সফলতম ও স্বর্ণযুগ সমস্ত উম্মাহর ব্যক্তি ও সামাজিক জীবনে ছিল পর্যাপ্ত সুখ, শান্তি, নিরাপত্তা, সচ্ছলতা ও সমৃদ্ধি। জনসাধারণের জীবনযাত্রা, চরিত্র ও নৈতিকতার উপর তাঁর ছিল সদা সতর্ক দৃষ্টি।

সাবায়ী ফিৎনা নির্মূলে হযরত মুআবিয়ার রাযি. অবদান

এক কথায় দীর্ঘ প্রায় এক দশকের গৃহ যুদ্ধে ক্ষত-বিক্ষত মুসলিম উম্মাহ্ হযরত মুআবিয়ার রাযি. খিলাফতকালেই ফিরে পায় তাদের হৃত গৌরব। খিলাফত শাসন ব্যবস্থায় ফিরে আসে পূর্ণ শৃঙ্খলা মুসলিম জাতি মুক্তি পায় আব্দুল্লাহ বিন সাবার

ইসলামী খিলাফত ব্যবস্থা ধ্বংসের গভীর ষড়যন্ত্রের ভয়াল থাবা থেকে। যে ষড়যন্ত্র শুরু হয়েছিল হযরত উসমানের রাযি. শাসনামলের মাঝামাঝি সময় হতে। অবশেষে তা ফুলে ফেঁপে বীভৎসরূপে ভয়াল মরণ কামড় নিয়ে স্বরূপে আত্মপ্রকাশ করে মহানবীর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম দুই জামাতা মুসলিম জাহানের তৃতীয় ও চতুর্থ খলীফা হযরত উসমান ও আলীর রাযি. শাহাদাত পঞ্চম খলীফা হযরত হাসান মুআবিয়া ও আমর ইবনুল আসের ন্যায় ইসলামী দুনিযার মহান নেতাগণের হত্যা প্রচেষ্টা এবং মুসলিম উম্মাহকে দীর্ঘস্থায়ী গৃহযুদ্ধের দিকে ঠেলে দিয়ে হাজার হাজার সাহাবায়ে কিরাম ও তাবেয়ীদের রাযি. জান কেড়ে নেয়া এবং খিলাফত ব্যবস্থাকে চিরতরে ধুলিস্যাৎ করে দিয়ে মুসলমানদের দুনিয়া হতে নিশ্চিহ্ন করে দেযার প্রচেষ্টার মাধ্যমে।

পঞ্চম খলীফা হযরত হাসান রাযি. অন্যান্য বিচক্ষণতা তৎপরতা শৃঙ্খলা ও সুষ্ঠু ব্যবস্থাপনা ফিরিয়ে আনার ক্ষেত্রে যেমনি অবদান রাখেন ঠিক তেমনিভাবে মহানবীর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম খাস দু'আয় ধন্য হযরত মুআবিয়ার রাযি. অনবদ্য শাসন ও নিরলস প্রচেষ্টার বদৌলতে আল্লাহ রাব্বুল আলামীন মুসলমানদের উদ্ধার ও রক্ষা করেন। হযরত মুআবিয়ার রাযি. অক্লান্ত পরিশ্রমে শাসনকার্যে ফিরে আসে স্থিতিশীলতা। ইসলামী রাষ্ট্রের শাসন ব্যবস্থা পুনরায় সু-সংহত হয় এবং মুসলিম বীর যোদ্ধার পুনরায় আরম্ভ করে তাদের স্বভাবসুলভ ইসলামের বিজয়াভিযান। ফলে ইসলামী সীমান্তের পরিধি বৃদ্ধি পেতে থাকে দিক হতে দিকান্তরে।

কিন্তু মুসলিম জাহানের এই বিজয়াভিযান ও মুসলমানদের উন্নতি প্রগতি ও যাবতীয় জাগতিক উৎকর্ষতা সাধনের মাধ্যম ঐক্যবদ্ধ খিলাফত ব্যবস্থা ও শাসন ব্যবস্থার এই স্থিতিশীলতা ইয়াহুদী খৃষ্টানচক্র ও তাদের তল্পিবাহক মুনাফিক সাবায়ী গোষ্ঠীর সহ্য হওয়ার নয়। তাই তারা আবার মেতে উঠে পুরোনো ষড়যন্ত্রে। শুরু হয় হযরত উসমানের রাযি. হযরত মুআবিয়ার রাযি. সুশাসনের বিরুদ্ধে মিথ্যা অপবাদ। রটনা করতে থাকে অত্যাচার জুলুম ও স্বজনপ্রিয়তা গোয়েবলসীয় অপপ্রচার। কিন্তু এবার আর মুসলিম জনসাধারণ অতীতের ন্যায় ভুল করে শাসন ক্ষমতায় অধিষ্ঠিত ব্যক্তির বিরুদ্ধে রাজনৈতিক কায়দায় সাবায়ীদের আরোপিত চটকদার ও গতানুগতিক মিথ্যা অভিযোগ সমূহে কান দেয়নি এবং তাদের পরীক্ষিত নেতার বিরুদ্ধে বিদ্রোহ তো করেইনি, বরং বিদ্রোহীদের বিরুদ্ধে ব্যবস্থা গ্রহণে সরকারকে সর্বত্র সহযোগিতা করে।

যেহেতু হযরত উসমানের রাযি. যুগে মাথাচাড়া দিয়ে উঠা সাবায়ী দল মুসলমানদের অভ্যন্তরীণ গৃহযুদ্ধের (যা ছিল তাদেরই সৃষ্ট) সুযোগে বিরাট শক্তি ও প্রভাবশালী দলরূপে আত্মপ্রকাশ করে প্রকাশ্যেই মুসলমানদের বিরুদ্ধে অস্ত্র তাক করা আরম্ভ করে দিয়েছিল। হযরত হাসান রাযি. খলীফা হয়ে তাদেরকে দমনের জন্য একমাত্র হযরত মুআবিয়া রাযি. কেই উপযুক্ত ব্যক্তি মনে করে তাঁর হাতে খিলাফতের দায়িত্ব অর্পণ করে দিয়েছিলেন। তাই তিনি সর্বসম্মত ও ঐকমত্যপূর্ণ খলীফা মনোনীত হয়ে

ঐ মুনাফিক সন্ত্রাসবাদী দলকে দমন করাকেই নিজের প্রথম ও প্রধান কর্তব্য মনে করলেন।

অবশ্য হযরত মুআবিয়া রাযি. প্রথম তাঁর প্রবাদতুল্য স্বভাবসুলভ সহনশীলতা ও নম্রতার ব্যবহার করেন। সাবায়ী খারিজীরা সংখ্যায় নগণ্য হলেও তারা স্বীয় বিশ্বাসে ছিল কট্টর এবং লক্ষ্য উদ্দেশ্যের ব্যাপারে ছিল অনড়। শেষ রক্ত বিন্দু বাকি থাকা পর্যন্ত জান হাতে নিয়ে প্রতিদ্বন্দ্বীদের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করে যাওয়া ছিল তাদের স্বভাব ।এতে কোন লোভ লালসা ভয় ভীতি বা অন্য কোন চিন্তা কখনই তাদের পথে বাধা হয়ে দাড়াতে পারত না। এ প্রেক্ষিতে এ ধরনের একটি সুসংগঠিত ও চরমপন্থি দলের নিয়ন্ত্রণ ও দেশে শান্তি শৃঙ্খলা বজায় রাখার জন্য অত্যন্ত বিচক্ষণ শাসকের প্রয়োজন ছিল যা হযরত মুআবিয়ার রাযি. মাঝে যথাযথভাবেই বিদ্যমান ছিল। তিনি তাদের সংগে অত্যন্ত সৌহার্দ্যপূর্ণ ও নম্র আচরণ প্রদর্শন করলেন এবং তাদের বাড়াবাড়ি সমূহের মুকাবিলার ধৈর্য্য ও সহ্যের এমন এক অনন্য দৃষ্টান্ত স্থাপন করলেন যার নজীর পৃথিবীর শাসকদের ইতিহাসে মেলা ভার।

এতদসত্ত্বেও সাবায়ী গোষ্ঠী সৃষ্ট খারেজী দল শান্তির পথে না এসে অনবরত দেশের শান্তি শৃঙ্খলা বিনষ্টে ও মুসলিম উম্মাহর ঐক্যবদ্ধ। নিযামকে ষড়যন্ত্রের মাধ্যমে টুকরা টুকরা করার প্রচেষ্টায় মত্ত থাকে। সুতরাং তাদের রক্তখেলা হতে দেশ ও জাতির রক্ষা কল্পে হযরত মুআবিয়া রাযি. তাদের বিরুদ্ধে সামরিক ব্যবস্থা গ্রহণে বাধ্য হন এবং প্রবল প্রতিরোধী হয়ে উঠেন। বিশেষতঃ উক্ত দলের আবির্ভাব সম্পর্কে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ভবিষ্যদ্বানী করতে গিয়ে হাত মুবারক উঁচিয়ে ইরাকের দিকে ইশারা করতঃ বলেছিলেন- ঐ অঞ্চল হতে তাদের আবির্ভাব হবে। বস্তুতঃ ঘটেছিলও তাই। ইরাকের কেন্দ্রীয় এলাকা বসরা ও কুফাই উক্ত সন্ত্রাসবাদী দলটির অপতৎপরতার ঘাঁটি ছিল। হযরত মুআবিয়া রাযি.তাই বসরা ও কুফায় সন্ত্রাসী তৎপরতা বন্ধের জন্য কঠোর ব্যবস্থা গ্রহণ করলেন। এই কঠোরতা ছাড়া আমীরুল মুমিনীন হযরত মুআবিয়ার রাযি. দীর্ঘ প্রায় চল্লিশ বৎসরের শাসন আমলের সুন্দর অবস্থা ইতিহাসের নিম্নবর্ণিত সার সংক্ষিপ্ত বিবৃতি থেকেই অনুধাবন করা যায়ঃ

হযরত মুআবিয়াহ রাযি. ৪১ হিজরী সনে সর্বসম্মতরূপে খলীফা নির্বাচিত হয়ে স্বীয় পদে বহাল থাকাবস্থায় মৃত্যু পর্যন্ত বহিঃশত্রুদের এলাকায় পূর্ণোদ্দমে জিহাদ অব্যাহত ছিল। আল্লাহর কালিমা তথা দীন ইসলামের প্রতিপত্তি সর্বত্র বিরাজমান ছিল। চতুর্দিক হতে শত্রুপক্ষের বিজিত ধন সম্পদের সমাগম ছিল। তার শাসনামলে মুসলমানগণ শান্তি ও ন্যায়পরায়ণতার মাঝে দিনাতিপাত করছিলেন এবং দয়া ও ক্ষমা উপভোগ করছিলেন। কঠোরতার কোন প্রশ্নই ছিল না।

অপপ্রচারণার কবলে হযরত মুআবিয়া রাযি.

ঘটনা পরম্পরায় হযরত মুআবিয়া রাযি. উক্ত মুনাফিক সন্ত্রাসবাদী ও ষড়যন্ত্রকারী দলটির বিরুদ্ধে যেরূপ প্রতিরোধী হয়েছিলেন, তদ্রূপ তারাও তাঁর বিরুদ্ধে ওঠে পড়ে

লেগেছিল। খলীফা হযরত উসমানের রাযি. বিরুদ্ধে তারা তাদের যে স্বভাবসুলভ মিথ্যার বহর ছড়িয়ে জনসাধারণকে উত্তেজিত ও বিভ্রান্ত করার অস্ত্র ব্যবহার করেছিল সেই অস্ত্রই তারা হযরত মুআবিয়ার রাযি. বিরুদ্ধে আরো অধিক ধারালো রূপে বিরামহীনভাবে চালিয়ে গেল।

গোয়েবলসের মিথ্যা প্রচারের নীতি অনুসারে সেই সব প্রচারণা কতিপয় বিভ্রান্ত ঐতিহাসিকের ইতিহাসের পাতায় ঠাঁই পেয়েছিল। অথচ হযরত মুআবিয়ার রাযি. শাসনামলের সঠিক ও বাস্তব চিত্র এই ছিল যা ইতিপূর্বে মুসলিম ঐতিহাসিকগণের বিশুদ্ধ ইতিহাস গ্রন্থসমূহ হতে উদ্ধৃত হয়েছে। ঘটনার সত্য-মিথ্যা সব রকমের বিবরণ সংগ্রহে যে সকল ঐতিহাসিকগণ আত্মতৃপ্তি অনুভব করতেন তাদের এ লেখায় প্রভাবান্বিত হয়ে অনেক খাঁটি মুসলমানও বিভ্রান্ত হয়েছেন এবং নিজেদের ঈমান আমলকে হুমকির সম্মুখীন করেছেন।

আর সেসব জাল ইতিহাসের উপর নির্ভর করে কতিপয় সাহাবী রাযি. বিদ্বেষী তথাকথিত ইসলামী চিন্তাবিদ হযরত মুআবিয়ার রাযি. খিলাফতকালের যে চিত্র এঁকেছেন তা আগাগোড়া যুক্তি বিরুদ্ধ ও বাস্তবতা বিবর্জিত এবং তা মহানবীর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ভবিষ্যদ্বাণী অনুযায়ী উম্মতে মুহাম্মাদিয়ার ৭৩ ফেরকার মধ্যে একমাত্র সঠিক ও মুক্তিপ্রাপ্ত দল আহলুস সুন্নাহ ওয়াল জামাআতের আক্বীদা ও মৌলিক বিশ্বাসের সাথে কেবল অসংগতি পূর্ণই নয় বরং সংঘর্ষপূর্ণও। সুতরাং কোন ক্রমেই উক্ত বর্ণনাসমূহ গ্রহণযোগ্য নয়। ঐ সব তথাকথিত চিন্তাবিদদের লেখার কেরামতিতে সাধারণ পাঠকের মনে এ ধারণাই বদ্ধমূল হয় যে, ক্ষমতার লোভে সাহাবীগণ রাযি. জঙ্গে জামাল ও জঙ্গে সিফফীনে পারস্পরিক সংঘর্ষ বাঁধিয়ে বহু লোককে হত্যা করেছিলেন। হযরত আলীর রাযি. শাহাদাতের সাথে সাথেই গোটা পরিস্থিতি হঠাৎ বুঝি ডিগবাজি খেয়েছিল এবং ইসলামী খিলাফত ব্যবস্থা তার সকল বৈশিষ্ট্য হারিয়ে তা শুধু আগ্রাসী শাসনের হাতিয়ারে পরিণত হয়েছিল। খিলাফতে রাশিদা ছিল যাবতীয় কল্যাণ ও সৌন্দর্যের এক অনুকরণীয় আদর্শ। কিন্তু হযরত মুআবিয়া রাযি. খিলাফতের দায়িত্বভার হাতে নেয়ার সাথে সাথে মুসলিম উম্মাহর জীবন থেকে সেগুলো হঠাৎ করে উবে গিয়েছিল এবং শেষ পর্যন্ত হযরত মুআবিয়া রাযি. রাজতন্ত্র কায়িমের মাধ্যমে ইসলামী খিলাফত ব্যবস্থা ধ্বংস করে ছেড়েছেন। (নাউজুবিল্লাহ) এমনিভাবে সেসব বিভ্রান্ত পাঠকদের হৃদয়ে এ ধারণা জন্মে যে, খিলাফতে রাশিদার স্বর্ণ যুগে মুসলিম সমাজ ছিল মানব ইতিহাসের শ্রেষ্ঠতম সমাজ। কিন্তু মুহূর্তের ব্যবধানে (হযরত মুআবিয়ার যুগে) সে সমাজেই প্রবৃত্তি ও পাশবিকতা সকল বিভৎসতা ও জঘন্যতা নিয়ে শিকড় গেড়ে বসল। চল্লিশ হিজরী পর্যন্ত খলীফার পক্ষে শরীআতের একটি সাধারণ বিধান লঙ্ঘনও ছিল কল্পনার অতীত। কিন্তু একচল্লিশ হিজরী তথা হযরত মুআবিয়ার রাযি. খিলাফতকাল শুরু হওয়ার সাথে সাথেই পরিস্থিতি শরী'আত লঙ্ঘন, দীনের বিকৃতি ও বিদ'আত প্রবর্তনের রূপ ধারণ করল। চল্লিশ হিজরীতে ঘুষ, লেন-দেনের পাপ ধারণা কারো হৃদয়ের পূর্ণ ভূমিতে

ছায়াও ফেলতে পারেনি কিন্তু একচল্লিশ হিজরীতে শাসক শাসিত সবার কাছে তা হয়ে উঠল মায়ের দুধের চেয়ে প্রিয়। চল্লিশ হিজরীতে কাফিরকে পর্যন্ত লা'নত ও গাল মন্দ করা হত না, আর একচল্লিশ হিজরীতে হযরত আলীর রাযি. বিরুদ্ধে ইসলামী খিলাফতের সর্বত্র গালাগালের ঝড় শুরু হল। চল্লিশ হিজরীতে সাধারণ সৈনিকের মনেও গনীমতের মালে খিয়ানতের কু-বাসনা জাগ্রত হত না কিন্তু একচল্লিশ হিজরীতে খোদ খলীফাতুল মুসলিমীন গনীমতের মাল আত্মসাতের মতলবে রীতিমত ফরমান জারী করতে লেগে গেলেন। চল্লিশ হিজরীতে খিলাফত ছিল ন্যায়-ইনসাফের উজ্জ্বল প্রতীক আর একচল্লিশ হিজরীতে জুলুম ও স্বেচ্ছাচারী হয়ে দাঁড়াল কেন্দ্রের নীতি। চল্লিশ হিজরীতে শাসক-শাসিতের ঈমানী বল এবং আল্লাহু ভীতি এমনই প্রবলভাবে জাগ্রত ছিল যে, সাধারণ মানুষও প্রকাশ্যে রাজপথে খলীফার পথ রোধ করে দাড়াতে পারত। অথচ মাত্র এক বছরের ব্যবধানে খলীফাতুল মুসলিমীনের জুলুম-নির্যাতন এমনই চরম রূপ ধারণ করল যে মুখে তালা ঝুলিয়ে দেয়া হল বিবেকের টুটি চেপে ধরা হল এবং চাবুকের নির্মম কষাঘাত হল সত্য ভাষণের পুরষ্কার।

মোট কথা চল্লিশ হিজরী শেষ হতে না হতেই ব্যক্তিস্বার্থ ও ক্ষমতা কেন্দ্রিক রাজনীতির এমন সর্বনাশা প্লাবন দেখা দিল যা বিংশ শতকের সভ্য মানুষ হিসেবে পৃথিবীতে আমরা আজ দেখতে পাই।

এ প্রেক্ষিতে আমরা শুধু এটুকু বলতে চাই যে, এসব আবোল তাবোল বকে অজ্ঞদের মধ্যে মিথ্যা আবেগ সৃষ্টি করা যায় নিজেকে চিন্তাবিদ ও গবেষক বলে জাহির করা যায় কিন্তু বাস্তব পর্যন্ত পৌছা যায় না বরং এ হচ্ছে এক ধরনের সংকীর্ণতা ইসলাম সম্পর্কে সামগ্রিক জ্ঞানের অভাব এবং অপরিণত মানসিকতার পরিচায়ক।

রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ভবিষ্যদ্বানীঃ

জ্ঞান-পাপী কতিপয় লেখকের হাতে আঁকা মুসলিম উম্মাহর অবক্ষয়ের এ চিত্র যেমন ইতিহাসের উত্থান পতনের ক্রম বিবর্তন ধারার বিরোধী তেমনি তা রাসূলুল্লাহর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম মহান ভবিষ্যদ্বানীরও পরিপন্থী। আল্লাহর রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ইরশাদ করেছেনঃ

"আমার যুগই হল সর্বোত্তম যুগ অতঃপর এর পরবর্তী (সাহাবাগণের রাযি.) যুগ অতঃপর তৎপরবর্তী (তাবে'ঈনগণের রহ.) যুগ।"

বস্তুতঃ হযরত মুআবিয়ার রাযি. স্বর্ণযুগ তুল্য ও মুসলিম জাহানের হৃত গৌরব পুনরুদ্ধারের সুন্দর শাসনামলের এ বীভৎস চিত্র সাবায়ী খারেজী ও শিয়া রাফেজীদেরই কল্পিত মিথ্যা ও জাল বর্ণনায় অংকিত।

শিয়া-রাফেজীর স্বরূপ:

যে সমস্ত শিয়ারা হযরত আলীর রাযি. ভক্তির আতিশয্যে এরূপ জঘন্য আক্বীদা পোষণ করে যে-

(ক) হযরত আলীই প্রকৃতপক্ষে সর্বশেষ নবী হওয়ার যোগ্য ও আল্লাহর মনোনীত ব্যক্তি ছিলেন, কিন্তু আল্লাহ পাক যখন ফেরেশতা হযরত জিবরাইল আ. মারফত হযরত আলীর রাযি. নিকট ওহী পাঠালেন তখন জিবরাঈল আ. ভুলবশতঃ মুহাম্মদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এর নিকট ওহী নিয়ে আসেন। ফলে তিনিই শেষ নবী হয়ে যান। অতঃপর মহানবীর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তিরোধানের পর হযরত আলীই রাযি. খিলাফতের হকদার ছিলেন। কিন্তু আবু বকর, উমর ও উসমান রাযি. তাঁর খিলাফত ছিনিয়ে নেন। এ জন্য তারা এবং অপরাপর সাহাবী রাযি. যারা তাদের সমর্থন করে সবাই মুরতাদ ও কাফির হয়ে গেছেন। (নাউযুবিল্লাহ)।

(খ) এমনকি তাদের মধ্য হতে একদল হযরত আলীর রাযি. জীবদ্দশায় তাকে খোদা পর্যন্ত ডাকতে আরম্ভ করেছিলেন। স্বয়ং হযরত আলী রাযি. তাদের বুঝিয়ে ব্যর্থ হয়ে এহেন কুফরী কাজের জন্য হত্যার হুমকি দিলে তারা বলতে থাকে আপনি আমাদের মা'বুদ। আপনার যা খুশী তা করার অধিকার আছে। আমাদের তাতে আপত্তি করার অধিকার নেই। অতঃপর হযরত আলী রাযি. তাদের একাংশকে হত্যা করলেও তাদের অপরাংশকে এ ভ্রষ্টতা হতে ফিরিয়ে আনতে ব্যর্থ হন।

(গ) শিয়া-রাফিজীদের আরেক দল বিশ্বাস করত এবং একথা তারা ব্যাপকভাবে ছড়িয়ে মুসলিম জনসাধারণকে বিভ্রান্ত করার চেষ্টা করত যে, কুরআন বিকৃত হয়ে গেছে। আসল কুরআন হযরত আলীর রাযি. কাছে সংরক্ষিত আছে। তাছাড়া হযরত আলী রাযি. কে মহানবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম অতিরিক্ত নব্বই হাজার কালাম দিয়ে গেছেন ইত্যাদি। স্বয়ং হযরত আলী রাযি. কে তাঁর জীবদ্দশায় একাধিক স্থানে বিভিন্ন তাবেয়ী রহ. এ সম্পর্কে জিজ্ঞাসা করলে তিনি দ্ব্যর্থহীন কণ্ঠে এসব কথা নাকচ করে দিয়েছেন। যার অসংখ্য দৃষ্টান্ত হাদীসগ্রন্থ সমূহে বিদ্যমান রয়েছে।

(ঘ) বার ইমামপন্থী শিয়া ইছনা আশারিয়া রা হযরত আলী রাযি. হযরত হাসান ও হুসাইন রাযি. সহ তাঁর বংশধরের মধ্যে বারজন বুযুর্গ ব্যক্তিবর্গকে ইমাম হিসেবে নবী সম বরং কোন কোন ক্ষেত্রে নবীদের উর্ধ্বে মর্যাদা দিয়ে তাদের নামের সংগে "আলাইহিস সালাম" বলেও লিখে থাকে। যা সাধারণতঃ নবী ও ফেরেশতাগণের নামের সাথেই ব্যবহার করার কথা। এমনকি ইসলামী হুকুমতের দাবীদার শিয়া ইছনা আশারিয়া পন্থী বর্তমান ইরান সরকারের প্রতিষ্ঠাতা আয়াতুল্লাহ খোমেনী তার আরবী ভাষায় রচিত আল-হুকুমাতুল ইসলামিয়াহ, গ্রন্থে দ্ব্যর্থহীন ও স্পষ্টভাবে লিখেছেনঃ "ইমাম এর মর্যাদা নবুওয়াতের উপরে। আর আমাদের ইমামগণ এমন মর্যাদার অধিকারী যেথায় আল্লাহ্‌র কোন নবী রাসূল এবং নিকটতম ফেরেশতাও পৌছতে পারেন না। যে কারণে তাঁদের রয়েছে শরী'আতের যে কোন বিধি বিধান যে কোন মুহূর্তে পরিবর্তনের সীমাহীন অধিকার। (নাউযুবিল্লাহ)

কত বড় জঘন্য ও দুঃখজনক কথা যে, এহেন জঘন্য আক্বায়িদে বিশ্বাসী শিয়া রাফিজীদের অকাট্য মিথ্যাচারকে পুঁজি করেই কেবল খলীফাতুল মুসলিমীন হযরত

মুআবিয়ার রাযি. ন্যায় রাসূলুল্লাহর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ঘনিষ্ঠ অতি প্রিয় ও বিশিষ্ট সাহাবী রাযি. এবং আল্লাহর প্রেরিত কালামে পাকের ওহী লেখকরূপে স্বীয় রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম কর্তৃক নিয়োজিত ব্যক্তির ব্যক্তিত্বের উপর অত্যন্ত জঘন্যভাবে হামলা করা হয়েছে। বস্তুতঃ এ অপপ্রচার পৃথিবীর একমাত্র অপরিবর্তিত অবিকৃত ও স্বীয় আল্লাহ পাক কর্তৃক হিফাজতকৃত আল-কুরআনের প্রতি মুসলিম উম্মাহর ইস্পাত কঠিন অবিচল আস্থা ও বিশ্বাসকে দুর্বল করার লক্ষ্যে ইয়াহুদী খৃষ্টানদের প্ররোচনায় উদ্ভাবিত ষড়যন্ত্র বৈ কিছু নয়।

হযরত মুআবিয়া রাযি. তো সেই ভাগ্যবান সাহাবী রাযি. যিনি মহানবীর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম আপন শ্যালক ও কাতিবে ওহী বা ওহী লিপিবদ্ধকারী হওয়ার সাথে সাথে মহানবীর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম একাধিক মাকবুল দু'আয় ধন্য হয়েছেন। যেমন তিরমিযী শরীফে বর্ণিত হয়েছে একবার নবীজী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তাঁকে এভাবে দু'আ দিয়েছেনঃ

"হে আল্লাহ্ তাকে (মুআবিয়াকে) হিদায়াতের পথ প্রদর্শক ও হিদায়াত প্রাপ্ত করে দাও এবং তাঁর মাধ্যমে মানুষকে হিদায়াত দান কর।"

অন্য হাদীসে ইরশাদ হয়েছেঃ "হে আল্লাহ! মুআবিয়াকে কিতাবী ইলম ও গণনা জ্ঞান দান কর এবং জাহান্নামের আযাব থেকে তাকে রক্ষা কর।"

তাঁর সম্পর্কে একদা ফেরেশতা হযরত জিবরাইল আ. হুজুর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম কে বলেছিলেন হে মুহাম্মদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম মুআবিয়াকে সালাম জানাবেন তাঁর মঙ্গলের প্রতি বিশেষ নজর রাখবেন। কেননা তিনি আল্লাহর কিতাব ও ওহীর উপর স্বীয় আল্লাহরই নিযুক্ত আমানতদার এবং তিনি অতি উত্তম আমানতদার।

এমনিভাবে বড় বড় সাহাবায়ে কিরাম ও তাবিয়ীগনের রাযি. দৃষ্টিতে হযরত মুআবিয়া রাযি. যে কত উঁচু মর্যাদার অধিকারী ছিলেন এবং তাঁর মহান মর্যাদার স্বীকৃতি স্বরূপ তাঁর প্রতি তাদের আচরণ ও প্রশংসামূলক বাণীসমূহ হাদীস ও ইতিহাস গ্রন্থসমূহে এত অধিক হারে লিপিবদ্ধ রয়েছে যে, বক্ষ্যমাণ নিবন্ধে তার ক্ষুদ্র একটি অংশের স্থান সংকুলান হওয়াও অসম্ভব। হযরত উমর ফারুক রাযি. এর ন্যায় বিচক্ষণ খলীফা হযরত মুআবিয়া রাযি. কে দীর্ঘদিন শাসন কার্যে নিয়োজিত রেখেছিলেন এবং তার শাসনকার্য পরিচালনার ব্যাপারে আমানতদারী ও দক্ষতার ভিত্তিতে বার বার পদোন্নতি দান করেছিলেন। এটা এ বিষয়ের একটা মজবুত প্রমাণ যে, সাবায়ীচক্র কর্তৃক হযরত মুআবিয়ার রাযি. বিরুদ্ধে আরোপিত অভিযোগসমূহ একেবারেই অবাস্তব, মিথ্যা ও গর্হিত।

হযরত মুআবিয়ার রাযি. এ সকল কামালাত ও ফজীলতের কথা স্মরণ রেখেই তৎকালীন মুসলমানগণ সাবায়ীদের এ সকল অপপ্রচারে কান দেননি। কিন্তু দুর্ভাগ্য

যে, আজ চৌদ্দশত বছর পর আবারো সেই কুখ্যাত ইবনে সাবা ও সাবায়ীদের উত্তরসূরীরা এহেন বুযুর্গ সাহাবী রাযি. সম্পর্কে সাধারণ মুসলমানদেরকে তাদের ধর্মীয় জ্ঞানের স্বল্পতা ও সঠিক ইসলামী ইতিহাস অধ্যয়নের অভাবের সুযোগ নিয়ে বিভ্রান্ত করার প্রয়াস পাচ্ছে। এ শ্রেণীর লোকদের থেকে মুসলমানদের সতর্ক থাকতে হবে।

হযরত মুআবিয়ার রাযি. উত্তরসূরী নির্বাচন ও ইয়াযীদ প্রসঙ্গ

হযরত মুআবিয়া রাযি. মৃত্যু পর্যন্ত প্রায় চল্লিশ বৎসরকাল ইসলামী রাষ্ট্র ও মুসলিম উম্মাহর খিদমত করেন। এর মধ্যে তিনি সাবায়ীদের ধ্বংসাত্মক ষড়যন্ত্রের হাত থেকে মুসলিম জাতিকে উদ্ধার করেন এবং সাবায়ীদের ভয়াবহ ষড়যন্ত্রে লণ্ডভণ্ড হয়ে যাওয়া খিলাফত ব্যবস্থাকে পুনঃপ্রতিষ্ঠা করেন। তিনি বিশৃঙ্খলা সৃষ্টিকারী ও সন্ত্রাসবাদী সাবায়ীদের দমন করে রাষ্ট্রে শান্তি-শৃঙ্খলা ফিরিয়ে আনেন। মুসলমানদের পারস্পরিক গৃহযুদ্ধের ক্ষতির প্রত্যক্ষদর্শী ও প্রথম কাতারের ভুক্তভোগী হিসেবে তিনি একজন যোগ্য উত্তরসূরী মনোনয়ন পূর্বক নিজের জীবদ্দশায় তাঁর হাতে জনসাধারণের বাই'আত নিয়ে রাখার আকাঙ্খা পোষণ করতেন। যাতে তার মৃত্যুর পর পর খলীফা নির্বাচনের ব্যাপারে শত্রুদের ষড়যন্ত্রে বা অন্য কোন কারণে পুনরায় মুসলিম জাতির মাঝে বিভেদ সৃষ্টির কোন অবকাশ না থাকে।

বর্তমান খলীফা তাঁর জীবদ্দশায় মুসলিম উম্মাহর নেতৃস্থানীয় ও গুণীজনদের সংগে পরামর্শক্রমে যে কোন যোগ্য ব্যক্তিকে পরবর্তী খলীফা মনোনীত করে তার হাতে জনসাধারণের বাইআত গ্রহণের পর তাকে খলীফা ঘোষণা করে যেতে পারেন। এমনকি পিতৃত্ব বা অন্য কোন রক্ত সম্পর্কের কারণেও মনোনয়ন দানের বৈধতার রদবদল হবে না। অবশ্য পিতা-পুত্রের ক্ষেত্রে অর্থাৎ পূর্ববর্তী খলীফা যদি নিঃস্বার্থ ও নিরপেক্ষ দৃষ্টিতে শুধুমাত্র দক্ষতা ও যোগ্যতার ভিত্তিতে তার পুত্রকে ভাবী খলীফারূপে মনোনয়ন দিতে চান তাহলে এর জন্য শর্ত হচ্ছে- খলীফাকে মুসলিম উম্মাহর নেতৃস্থানীয় ব্যক্তিবর্গের সমর্থন ও অনুমোদন নিতে হবে। কেবলমাত্র তখনই পুত্রের মনোনয়ন ও তার হাতে জনসাধারণের বাই'আত গ্রহণ বৈধ হবে। এবং এটাকে রাজতন্ত্র বলা হবে না। রাজতন্ত্র বলা হয় যোগ্যতার বিচার না করে শুধু বংশানুক্রমিক হারে শাসনের ধারাকে।

এ উদ্দেশ্যে পরামর্শ চেয়ে হযরত মুআবিয়া রাযি. নিজের এক গভর্নরের বরাবর যে চিঠি লিখেন, তাতে তিনি উল্লেখ করেছেন যে, "আমার মৃত্যু অতি নিকটবর্তী। আমার আশংকা হয় যে আমার মৃত্যুর পর উম্মাহর ঐক্যে আবার ফাটল দেখা দিতে পারে। এ কারণে আমার ইচ্ছা হয় নিজের জীবদ্দশাতেই কোন যোগ্য ব্যক্তিকে আমার স্থলাভিষিক্ত মনোনীত করে দিয়ে যাই। অন্যত্র তিনি একবার বলেন জনসাধারণকে আমি রাখালবিহীন বকরীর পালের মত ছেড়ে যেতে চাই না।"

এ লক্ষ্যে সর্বপ্রথম রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এর অন্যতম ও প্রিয় সাহাবায়ে কিরামের মধ্য হতে বিচক্ষণ ও দূরদর্শী বিশিষ্ট সাহাবী রাযি. কুফার গভর্নর হযরত মুগীরাহ বিন শুবাহ রাযি. এই বলে পরামর্শ দেন যে হযরত উসমানের রাযি. শাহাদাতের পর সাবায়ীদের ষড়যন্ত্রে মুসলমানদের মাঝে যে মতানৈক্য ও ভয়াবহ রক্তপাতের সূত্রপাত হয় তা কেউ বিস্মৃত হয়নি। সুতরাং আপনার স্থলাভিষিক্ত হওয়ার জন্য পূর্ণ যোগ্যতাধারী ইয়াযীদের পক্ষে জনগণের বাই'আত নিয়ে তাকে আপনার স্থলাভিষিক্ত বানিয়ে যান। যাতে আপনার মৃত্যুর পর শত্রুপক্ষ হতে কোন বিশৃঙ্খলা সৃষ্টি হলে তিনি মুসলমানদের আশ্রয়স্থল হতে পারেন এবং খিলাফতের ব্যাপারে কোনরূপ গণ্ডগোল ও রক্তপাতের আশংকা না থাকে।

বলাবাহুল্য ইয়াযীদ আমীরুল মুমিনীনের প্রিয়পুত্র ও সাহেবজাদা হিসেবে গোটা ইসলামী উম্মাহর বিশেষ শ্রদ্ধার পাত্র ছিলেন। তার নৈতিকতা, ধার্মিকতা, পারিবারিক সম্ভ্রম, প্রশাসনিক দক্ষতা ও একাধিক সমর নৈপূণ্যের বিচারে তিনি খিলাফতের জন্য যোগ্য ব্যক্তি ছিলেন। স্বয়ং হযরত মুআবিয়া রাযি. তাকে বিশিষ্ট সাহাবীগণের রাযি. উপস্থিতিতে বিচ্ছিন্নতাবাদী খারিজীদের দমনে এবং তৎকালের অন্যতম পরাশক্তি রোমীয়দের বিরুদ্ধে গুরুত্বপূর্ণ অভিযানে প্রেরণ করে তার সাহসিকতা ও সময় নৈপুন্যের স্বাক্ষর অবলোকন করেন। সুতরাং ইয়াযীদের তৎকালীন এসকল গুণাবলী শুধু হযরত মুগীরাহ বিন শুবাহ রাযি. বা হযরত মুআবিয়ারই রাযি. দৃষ্টিগোচর ছিল না বরং অধিকাংশ জীবিত সাহাবী রাযি. তখন ইয়াযীদের মনোনয়নকে সমর্থন করেন এবং তার পক্ষে তারা নিয়মিত প্রচারণাও চালিয়ে যান। ফলে মুসলিম জাহানের বিভিন্ন অঞ্চলে সুধী ও গুণীজনেরা স্ব-স্ব এলাকার প্রতিনিধিসহ আমীরুল মুমিনীনের আবাসস্থল দামেস্ক আগমন করে হযরত মু'আবিয়ার রাযি. সঙ্গে সাক্ষাত করে তারা নিজেদের পক্ষ হতে ইয়াযীদকে পরবর্তী খলীফারূপে মনোনয়ন দানের প্রস্তাব পেশ করতে থাকেন।হযরত মুআবিয়া রাযি. তাদের এ ব্যাপারে বিবেচনার আশ্বাস দেন এবং বলেন- এমন গুরুত্বপূর্ণ বিষয়ে তড়িঘড়ি সিদ্ধান্ত নেয়া ঠিক হবে না। যা আল্লাহর মঞ্জুর আছে তাই হবে। এরই মধ্যে সকল গুরুত্বপূর্ণ প্রদেশ সমূহের প্রতিনিধিদল এসে হযরত মুআবিয়ার রাযি. প্রতি ইয়াযীদের মনোনয়নের ব্যাপারেই অনুরোধ জানাতে থাকেন। তখন হযরত মুআবিয়াও রাযি. স্বীয় পুত্র ইয়াযীদকে মনোনয়ন দানে মনস্থ করেন।

অতঃপর প্রশাসন ও মুসলিম উম্মাহর অন্যান্য নেতৃস্থানীয়গণের সংগে এ ব্যাপারে পরামর্শ করলে তারাও এ ব্যাপারে সমর্থন দান করেন। তখন শুধু হিজায তথা মক্কা মদীনার নেতৃবৃন্দের মতামত জানা বাকি ছিল। মক্কা মদীনাবাসীদের মধ্যে শুধু কয়েকজন বিশিষ্ট ব্যক্তিত্ব ইয়াযীদের ব্যাপারে একারণে আপত্তি জানালেন যে, হযরত হুসাইন, ইবনে আব্বাস, ইবনে উমর, আবদুল্লাহ বিন যুবাইর ও আবদুর রহমান বিন আবু বকর রাযি. তখনো জীবিত ছিলেন। আর তাঁরা সকলেই সাহাবী রাযি. হওয়ার

কারণে ইয়াযীদের চেয়ে উত্তম ছিলেন এবং ধার্মিকতা ও প্রশাসনিক যোগ্যতার ক্ষেত্রেও তারা ইয়াযীদের চেয়ে উত্তম ছিলেন।

কিন্তু তাদের মতামত এজন্য প্রাধান্য পেল না যে সাহাবায়ে কিরামের এক বিরাট অংশ এ কারণে ইয়াযীদের মনোনয়নের পক্ষে ছিলেন যে ইমাম হুসাইন প্রমুখগণ ইয়াযীদের চেয়ে যোগ্যতম হলেও ইয়াযীদ এক দিকে খিলাফতের দায়িত্ব পালনে বাহ্যিকভাবে কম যোগ্য ছিল না। যার বিবরণ পূর্বে উল্লেখিত হয়েছে। আর যোগ্যতর ব্যক্তির বর্তমানে যোগ্য ব্যক্তিকে খলীফা মনোনীত করার বৈধতা ইসলামে আছে। অন্যদিকে ইয়াযীদ আমীরুল মুমিনীন হযরত মুআবিয়া রাযি. এর মত বিচক্ষণ প্রশাসক সাহাবীর রাযি. পুত্র হওয়ার সুবাদে সর্বদা পিতার সান্নিধ্যে থাকার বদৌলতে খিলাফত শাসনকার্য ও রাজ্য পরিচালনায় বেশ অভিজ্ঞতা ও দক্ষতা অর্জন করেছিলেন। আর এ ব্যাপারে কোন দ্বিমত নেই যে প্রয়োজনীয় যোগ্যতা থাকার পর অতিরিক্ত যোগ্যতা ও পাণ্ডিত্যের চেয়ে অভিজ্ঞতার গুরুত্ব অনেক বেশী সে কারণে হযরত মুআবিয়া রাযি. ও আন্তরিকভাবে ইয়াযীদকেই খিলাফতের যোগ্য বিবেচনা করতেন। তাঁর ধারণায় উম্মাহর সামগ্রিক কল্যাণও এতে নিহিত ছিল। এ কারণে একবার হযরত উসমানের রাযি. পুত্র সাঈদের অনুযোগের উত্তরে তিনি বলেছিলেনঃ আল্লাহর কসম তোমার এ দাবী যথার্থ যে, তোমার পিতা আমার চেয়ে উত্তম এবং রাসূলুল্লাহর নৈকট্যভাজন ছিলেন। আর তোমার মাও ইয়াযীদের মায়ের চেয়ে উত্তম ছিলেন। কিন্তু ইয়াযীদ সম্পর্কে আমাকে বলতেই হবে যে গোটা ভূখণ্ড তোমার মত লোকে ভরে গেলেও ইয়াযীদের যোগ্যতার পাল্লা ভারী হবে। তাই উম্মাহর ঐক্য ও সম্প্রীতি রক্ষার স্বার্থে ইয়াযীদকে পরবর্তী খলীফা বানানোর বিকল্প ছিল না।

অপরদিকে বনু উমাইয়া গোত্রই তখন কুরাইশের প্রধান শক্তি ছিল। উম্মাহর সংখ্যাগরিষ্ঠ অংশও ছিল তাদেরই অনুবর্তী। আর বনু উমাইয়ার সকল নেতৃস্থানীয় ব্যক্তিবর্গ এক বাক্যে ইয়াযীদের ব্যাপারে সংঘবদ্ধ হয়ে গিয়েছিলেন। এ সকল কারণে উম্মাহর ঐক্য ও সম্প্রীতি রক্ষার স্বার্থে ইয়াযীদকে পরবর্তী খলীফা বানানোই যুক্তিযুক্ত ছিল। ফলে ইয়াযীদই চূড়ান্তরূপে পরবর্তী খলীফা হিসেবে মনোনয়ন লাভ করেন এবং ৬০ হিজরীতে হযরত মুআবিয়ার রাযি. ইন্তিকালের পর ইয়াযীদই যথারীতি খলীফা নিযুক্ত হন।

ইয়াযীদকে চূড়ান্তরূপে মনোনয়ন দানের পূর্বে ও পরে হযরত মুআবিয়া রাযি. বিভিন্ন সময় আপন প্রভুর নিকট যেসব দু'আ করেন সেগুলো তার ইখলাস এবং পুত্র ইয়াযীদের মনোনয়নে পিতা হিসেবে তাঁর ভূমিকা নিঃস্বার্থ ও নিরপেক্ষ হওয়ার প্রমাণ বহন করে। যেমন-জুমু'আর এক খুতবায় 'আসমানের দিকে তাকিয়ে তিনি এই দু'আ করেছিলেনঃ হে আল্লাহ! খিলাফতের যোগ্য বিবেচনা করেই যদি আমি ইয়াযীদকে মনোনয়ন দিয়ে থাকি তাহলে তার পক্ষে আমার এ সিদ্ধান্তকে তুমি পূর্ণতা দান করো।

পক্ষান্তরে পুত্রের প্রতি পিতার মোহই যদি হয় এর কারণ তাহলে তা তুমি ব্যর্থ করে দাও।

অন্য এক খুতবায় তিনি বলেছিলেনঃ হে আল্লাহ! ইয়াযীদকে যদি তার যোগ্যতার কারণেই মনোনীত করে থাকি, তাহলে সে মর্যাদায় তাকে উন্নীত কর এবং তাকে মদদ কর। আর যদি পুত্রের প্রতি পিতার সহজাত ভালবাসাই এ কাজে আমাকে প্ররোচিত করে থাকে তাহলে আগেই তাকে তুমি তুলে নাও। বলার অপেক্ষা রাখে না যে তার মনে যদি সংশয় থাকত বা তিনি যদি রাজতন্ত্র প্রতিষ্ঠা ও পুত্রত্বের মোহে পড়ে পরবর্তী খলীফা হিসেবে পুত্রের মনোনয়নের অপচেষ্টায় লিপ্ত হতেন তবে তিনি জুমুআর দিনে হাজার হাজার লোকের সম্মুখে মসজিদের মিম্বরে দাড়িয়ে দুআ কবুল হওয়ার যথার্থ মুহূর্তে পুত্রের নামে এরূপ কঠিন দু'আ কখনো করতে পারতেন না।

সাবায়ী ও খারিজীদের অপকীর্তির কথা বলাই বাহুল্য যারা হযরত মুআবিয়াকে রাযি. আপন চক্ষুশূল মনে করত এবং তাঁর বিরুদ্ধে নিকৃষ্টতম অপপ্রচারেও কুণ্ঠাবোধ করত না। তারা যে ইয়াযীদের মনোনয়নকে ব্যক্তি স্বার্থে প্রণোদিত বলে আখ্যা দিবে সেটাই ছিল স্বাভাবিক। আর বাস্তবে হয়েছেও তাই। তারা ইয়াযীদের বাই'আত গ্রহণে বল প্রয়োগ ঘুষ প্রদান ও প্রতারণার আশ্রয় গ্রহণের ন্যায় ঘৃণিত অসুদপায় অবলম্বনের মিথ্যা ও উদ্ভট অভিযোগ পর্যন্ত আনতে দ্বিধাবোধ করেনি। কিন্তু দুঃখবোধ হয় সে সকল বিবেকবান মুসলমান ভাইদের প্রতি যারা পরবর্তীতে ইয়াযীদের শাসনামলে কুফার গভর্নর উবাইদুল্লাহ বিন যিয়াদের নির্দেশে কারবালা প্রান্তরে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম প্রিয় দৌহিত্র সাইয়িদু শাবাবি আহলিল জান্নাহ হযরত হুসাইন রাযি. এর মর্মন্তুদ শাহাদাতের ঘটনাকে পুঁজি করে এর সকল দায় দায়িত্ব রাসূলুল্লাহর-ই সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম অপর প্রিয় ও বিশ্বস্ত বন্ধু হযরত মু'আবিয়ার রাযি. উপর চাপিয়ে দেন এবং তার অযোগ্য পুত্রকে খলীফা বানিয়ে ইসলামী খিলাফতের পরিবর্তে রাজতন্ত্র প্রতিষ্ঠার মিথ্যা ও কাল্পনিক অভিযোগে তাঁকে অভিযুক্ত করে নিজেদের ঈমানের প্রতি হুমকি সৃষ্টি করেন।

সাহাবীগণের রাযি. সমালোচনাকারী বা তাদের ব্যাপারে মনে মনে সংকীর্ণতা পোষণকারীদের প্রতি মহানবীর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম স্পষ্ট সতর্কবাণী হচ্ছেঃ

আল্লাহুকে ভয় কর! আল্লাহুকে ভয় কর! আমার সাহাবীগণের রাযি. ব্যাপারে। আমার পরে তাঁদেরকে তোমরা সমালোচনার পাত্র বানিও না। যে আমার সাহাবীগণকে রাযি. ভালবাসে সে আমার মুহাব্বাতেই তাদেরকে ভালবাসে। আর যে আমার সাহাবীগণের রাযি. প্রতি বিদ্বেষ পোষণ করে সে আমার প্রতি বিদ্বেষ রাখার দরুনই তাদের প্রতি বিদ্বেষ পোষণ করে। (বুখারী শরীফ-হাদীস নং-৩৬৭৩)

বস্তুতঃ রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এর দৌহিত্রের মর্মান্তিক শাহাদাতের সাথে কিঞ্চিত পরিমাণ হলেও যে নরাধম জড়িত, ইসলামী খিলাফতের পবিত্র আসনে

মুহূর্তের জন্যও তাকে অধিষ্ঠিত রাখার কল্পনা করা যে কোন মুসলমানের পক্ষে কষ্টকর। কিন্তু ঘটনার নিরপেক্ষ পর্যালোচনাই যদি উদ্দেশ্য হয়, তাহলে একথা আমাদের ভুলে গেলে চলবে না যে, ইয়াযীদকে যখন মনোনয়ন দেয়া হচ্ছিল তখন কিন্তু কারবালা ট্রাজেডির কোন অস্তিত্ব ছিল না। এমনকি পরবর্তী কালের দোষ ত্রুটিগুলো ইয়াযীদের চরিত্রে তখন বিদ্যমান ছিল না। পূর্বেই উল্লেখ করা হয়েছে যে, তখন সে আমীরুল মুমিনীনের প্রিয় পুত্র ও সাহাবীজাদা রাযি. হিসেবে গোটা মুসলিম জাতির বিশেষ শ্রদ্ধার পাত্র ছিল এবং তার নৈতিকতা, ধার্মিকতা, পারিবারিক সম্ভ্রম প্রশাসনিক দক্ষতা ও সমর নৈপূণ্যের বিচারে তাকে খিলাফতের যোগ্য বিবেচনা করার পূর্ণ অবকাশ ছিল। তদুপরি ইয়াযীদের এ যোগ্যতা শুধু যে পিতা মুআবিয়ার রাযি. চোখেই ধরা পড়েছিল তা নয়। বরং বহু নেতৃস্থানীয় সাহাবী রাযি. ও তাবিয়ীগণও ইয়াযীদের প্রতি উচ্চ ধারণা পোষণ করতেন। যে কারণে তারাই প্রথমে হযরত মুআবিয়ার রাযি. প্রস্তাবটির ভাল-মন্দ বিবেচনা করে তা কার্যকর করেন মাত্র। পূর্বে এ কথাও উল্লেখিত হয়েছে যে প্রায় সব সাহাবী রাযি. ও তাবিয়ীগণই তখন ইয়াযীদের খলীফা মনোনয়নের পক্ষে ছিলেন। ইমামুল মুফাসসিরীন হযরত ইবনে আব্বাস রাযি. সম্পর্কে বর্ণিত আছে পানাহারের এক মজলিসে তাঁর নিকট হযরত মুআবিয়ার রাযি. মৃত্যু সংবাদ এসে পৌছলে তিনি অনেকক্ষণ ঝিম ধরে বসে থাকলেন। অতঃপর বললেন- হে আল্লাহ মুআবিয়ার রাযি. প্রতি রহমত নাযিল কর পূর্ববর্তীদের তুলনায় তিনি উত্তম ছিলেন না বটে তবে পরবর্তীরাও তাঁর তুলনায় উত্তম হবে না। ইয়াযীদ অবশ্যই তাঁর খান্দানের যোগ্য উত্তরসূরী। সুতরাং তোমরা (উপস্থিত হাজিরানে মজলিস) স্ব-স্ব জ্ঞানে থেকে তাঁকে আনুগত্য ও বাইআত দান কর।

এ অবস্থায় ইয়াযীদের কোন দুস্কর্মের জন্য সাহাবী হযরত মুআবিয়া রাযি. কে দায়ী করে তাঁর সম্পর্কে কোনরূপ সমালোচনা করা শুধু যে অযৌক্তিক তাই নয়। বরং কুরআন হাদীসের আলোকে তা জগণ্যতম অন্যায় ও নাজায়িয কাজ। কেননা সাহাবায়ে কিরাম রাযি. হতে বাহ্যিক দৃষ্টিতে আপত্তিজনক কোন কাজ সংঘটিত হলেও সেখানে শরী'আতের বিধান হচ্ছে তার যথা সম্ভব এমন ব্যাখ্যা প্রদান করা যা সাহাবিয়্যাতের মহান মর্যাদার সাথে সর্বদিক দিয়ে সংগতিপূর্ণ হয়। পক্ষান্তরে এমন কোন ব্যাখ্যা প্রদান কিছুতেই বৈধ নয় যা তাদের জীবন চরিত্র ও সাহাবীসুলভ পবিত্রতার সাথে সংঘর্ষপূর্ণ অনুমিত হয়। কারণ এর ভিত্তি মূলতঃ রাসূলুল্লাহর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম কোন সাহাবীর রাযি. প্রতি বিদ্বেষ, অশ্রদ্ধা ও অবজ্ঞা পোষণের উপর প্রতিষ্ঠিত যা নিঃসন্দেহে ঈমান বিধ্বংসী আচরণ। সে ক্ষেত্রে ইয়াযীদের অন্যায়ের কারণে হযরত মুআবিয়ার রাযি. ন্যায় বিশিষ্ট সাহাবীকে রাযি. দায়ী করা যে কত বড় পাপ এবং নিজের ঈমানকে সংকটে ফেলার নামান্তর তা সহজেই অনুমেয়।

তৃতীয় অধ্যায়

কারবালার সঠিক ইতিহাস শুরুর কথাঃ

হায়াতের শেষের দিকে বেশ কিছু দিন মদীনায় অবস্থান করার পর হযরত মু'আবিয়া রাযি. ও হজ্বের উদ্দেশ্যে মক্কায় এসে হাজির হলেন এবং হযরত আব্দুল্লাহ ইবনে উমর, হযরত আব্দুর রহমান ইবনে আবু বকর ও হযরত আব্দুল্লাহ ইবনে যুবায়ের রাযি. কে ইয়াযীদকে খলীফা ঘোষণার ব্যাপারে পৃথক পৃথক ভাবে বুঝাতে চেষ্টা করলেন। কিন্তু কোনক্রমেই তাদেরকে রাজী করানো যাচ্ছিল না। হযরত আব্দুল্লাহ ইবনে উমর রাযি. বললেন -আপনার পূর্বে যারা খলীফা ছিলেন তাঁদেরও অনেক যোগ্য সন্তানাদি ছিল। যোগ্যতার মাপকাঠিতে তারা ইয়াযীদের চেয়ে অনেক উর্ধ্বে ছিল, তবুও তাঁরা তাঁদের সন্তানদের এ দায়িত্ব অর্পণ করেননি। তাঁরা মুসলমানদের সার্বিক কল্যাণের প্রতি লক্ষ্য রেখে খেলাফতের দায়িত্ব অন্যের হাতে অর্পণ করে গেছেন। অথচ আপনি আপনার সন্তানের জন্য এ কাজটি করে যাচ্ছেন।

এমনিভাবে প্রত্যেকের সাথে হযরত মু'আবিয়ার রাযি. মতবিনিময় হয় এবং সকলেই ইয়াযীদের হাতে বাই'আত গ্রহণ থেকে বিরত থাকার ব্যাপারে কঠোর মনোভাব প্রকাশ করেন।

সর্বোপরি হযরত হুসাইন, হযরত আব্দুল্লাহ ইবনে যুবায়ের রাযি. সহ আরও কতিপয় শীর্ষস্থানীয় সাহাবায়ে কিরাম হযরত মু'আবিয়া রাযি. সাথে সাক্ষাৎ করে তাঁকে পরামর্শ দেন আপনি আমাদেরকে ইয়াযীদের হাতে বাই'আতের জন্য শক্তি প্রয়োগ করবেন না। আমরা আপনার নিকট তিনটি প্রস্তাব পেশ করছি তার যে কোন একটি আপনি গ্রহণ করতে পারেন। আমাদের সাথে আপনার অন্য কোন বিরোধ নেই। প্রস্তাব তিনটি হলঃ

একঃ খলীফা নির্বাচনের ব্যাপারে আপনি রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এর নীতি অনুসরণ করুন। অর্থাৎ আপনি কাউকে মনোনীত না করে মুসলমানদের উপর এ দায়িত্বভার ছেড়ে দিন। তারা যাকে ভাল মনে করেন তিনিই মনোনীত হবেন সকলের আমীরুল মুমিনীন।

দুইঃ আপনি আমীরুল মুমিনীন হযরত আবু বকর রাযিয়াল্লাহু আনহু'র পন্থা অবলম্বন করুন। অর্থাৎ আপনি এমন এক ব্যক্তির নাম পেশ করুন যার সাথে আপনার বংশের কোন সম্পর্ক থাকবে না, থাকবে না আপনার আত্মীয়তার কোন বন্ধন এবং দায়িত্ব পালনের যোগ্যতাও তার মাঝে পাওয়া যাবে।

তিনঃ আপনি ফারুকে আযম হযরত উমর রাযিয়াল্লাহু আনহু'র পদ্ধতি অবলম্বন করুন। অর্থাৎ আপনি ছয় জন বিশ্বস্ত ব্যক্তিত্বের উপর এ দায়িত্ব অর্পণ করে যান তারাই নির্ধারণ করবেন পরবর্তী খলীফা কে হবেন। এ ছাড়া চতুর্থ আর কোন প্রস্তাব আমরা মানতে রাজী নই।

কিন্তু হযরত মু‘আবিয়া রাযি. তদুত্তরে বললেন- সারা মুসলিম বিশ্ব ইয়াযীদের হাতে বাই’আত গ্রহণ করেছে। এখন আপনাদের এ কয়জনের বিরোধিতার পরিণাম মুসলমানদের জন্য আদৌ কল্যাণকর হবে না। এ পরিস্থিতিতে সকলেরই উচিত ইয়াযীদের হাতে বাই’আত গ্রহণ করা।

হযরত মু‘আবিয়ার রাযি. খেলাফত কালে পরিস্থিতি আর ঘোলাটে হওয়ার সুযোগ পায়নি। মুসলমানদের পরস্পর মতভেদ এড়ানোর জন্য সিরিয়া ও ইরাকবাসীদের বৃহৎ অংশের পর মুসলিম জনতার আরও একটি বৃহদাংশ ইয়াযীদের হাতে বাই’আত গ্রহণ করে। কিন্তু মদীনার অধিবাসীগণ বিশেষতঃ হযরত হুসাইন, হযরত আব্দুল্লাহ ইবনে যুবায়ের এবং হযরত আব্দুল্লাহ ইবনে উমর রাযি. ইয়াযীদের হাতে বাই’আত গ্রহণ না করার উপর দৃঢ় প্রতিজ্ঞ রইলেন। তাঁরা কারও ভয়ে ভীত সন্ত্রস্ত না হয়ে প্রকাশ্যে ঘোষণা করলেন- ইয়াযীদ কোন অবস্থাতেই খলীফাতুল মুসলিমীন হওয়ার যোগ্য নয়।

এ অবস্থায় হযরত মু‘আবিয়া রাযি. এর ইন্তিকালের পরে ৬০ হিজরীতে ইয়াযীদ সিংহাসনে আরোহণ করেন। হযরত মুআবিয়া রাযি. স্বীয় জীবদ্দশায় বিভিন্ন এলাকার মুসলমানদের থেকে তার উত্তরাধিকারী হওয়ার বাই’আত গ্রহণ করেছিলেন। কিন্তু কুরাইশের খ্যাতনামা লোকজন এবং হেজাযের নেতৃবৃন্দ যেমন- হযরত ইমাম হুসাইন রাযি., আব্দুল্লাহ ইবনে যুবাইর, আব্দুল্লাহ ইবনে উমর এবং আব্দুর রহমান ইবনে আবু বকর রাযি. বাই’আত করলেন না, এর বিস্তারিত আলোচনা ইসলামী ইতিহাসে বর্ণিত হয়েছে।

একথা স্পষ্ট যে, এসব হযরত নিজেদের ব্যক্তিগত গুণাবলী আর বংশীয় মর্যাদার কারণে সমস্ত উম্মতে উপরে প্রভাব প্রতিপত্তির অধিকারী ছিলেন। তাদের এই মতবিরোধ কোন সাধারণ ব্যাপার ছিল না। তাই সিংহাসনে আরোহণের সাথে সাথেই ইয়াযীদ এদের ব্যাপারে দুশ্চিন্তাগ্রস্থ হয়ে পড়লেন।

ওলীদ ইবনে উতবা ইবনে আবু সুফিয়ান তখন মদীনার শাসক ছিলেন। ইয়াযীদ তার নিকট হযরত মু‘আবিয়ার রাযি. মৃত্যুর সংবাদ পাঠালেন আর এসব হযরতের নিকট থেকে বাই’আত গ্রহণের তাকিদ করলেন। ওলীদ ইবনে উতবা এ বিষয়ে সফলতার জন্য মারওয়ান ইবনে হাকামের সাথে পরামর্শ করলেন যিনি তখন মদীনাতেই থাকতেন। মারওয়ান বলল আব্দুল্লাহ ইবনে উমর রাযি. আর আব্দুর রহমান ইবনে আবু বকরের রাযি. ব্যাপারে চিন্তার কোন কারণ নেই কেননা তারা ক্ষমতার দাবীদার নয়। তবে হুসাইন ইবনে আলী রাযি. আর আব্দুল্লাহ ইবনে যুবাইরকে রাযি. এক্ষুনি ডেকে ইয়াযিদ এর পক্ষে বাই’আত করতে বাধ্য কর। যদি তারা না শোনে তাহলে জীবিত বাইরে যেতে দিওনা। যদি আমীরের মৃত্যুর খবর ছড়িয়ে পড়ে আর তারা বাই’আত না করে তাহলে এরা নিজ নিজ সমর্থকদের নিয়ে ময়দানে ঝাঁপিয়ে পড়বে এবং বিরোধিতার সুর উঁচু হয়ে যাবে।

ইমাম হুসাইন এবং আব্দুল্লাহ ইবনে যুবাইরের বাইআতে অস্বীকৃতি জ্ঞাপনঃ

ওলীদ হযরত হুসাইন এবং আব্দুল্লাহ ইবনে যুবাইর রাযি. কে ডেকে পাঠালেন। বুযুর্গদ্বয় তখন মসজিদে ছিলেন। এই অসময়ে ডাকার কারণে তারা ঘটনার গভীরে পৌঁছে গেলেন। তারা পরস্পরে মন্তব্য করলেন যে মনে হয় আমীরের ইন্তিকাল হয়ে গেছে আর আমাদেরকে ইয়াযিদের পক্ষে বাই'আতের জন্য ডাকা হচ্ছে। হযরত হুসাইন রাযি. কিছু লোকজন সঙ্গে নিয়ে ওলীদের নিকট পৌঁছলেন তিনি সাথিদেরকে বাইরে অপেক্ষা করতে বললেন এবং আরো বললেন তোমরা যদি কোন শোরগোল শুনতে পাও তাহলে তৎক্ষণাত ভেতরে চলে আসবে। ওলীদ হযরত হুসাইন রাযি. কে হযরত মু'আবিয়ার রাযি. মৃত্যুর সংবাদ জানালেন। হযরত হুসাইন রাযি. ইন্নালিল্লাহ পড়লেন আর আমীরের জন্য মাগফিরাতের দু'আ করলেন। এবার ওলীদ মূল প্রসঙ্গে ফিরে এসে বাই'আতের আহবান জানালেন। হযরত হুসাইন রাযি. বললেন আমার মত ব্যক্তি গোপনে বাই'আত করতে পারেনা। আপনি সাধারণ লোকদের কে এই উদ্দেশ্যে একত্রিত করুন আমিও তাদের সাথে আসব। সকলের যেটা মত হবে সেটাই করা হবে।

ওলীদ দুশ্চরিত্রের লোক ছিলেন না। তিনি বললেন খুব ভাল কথা, তাশরীফ নিয়ে যান। হযরত হুসাইন রাযি. এর প্রস্থানের পর ওলীদ মারওয়ানকে বললেন বড়ই পরিতাপের বিষয় তুমি চাচ্ছ আমি রাসূল দৌহিত্রকে হত্যা করি। খোদার শপথ কিয়ামতের দিন যার নিকটে হুসাইনের রক্তপণ চাওয়া হবে সে বড়ই হতভাগ্য হবে।

আব্দুল্লাহ ইবনে যুবাইর রাযি. ওলীদের নিকট একদিনের সময় চাইলেন। কিন্তু রাতেই তিনি মদীনা ত্যাগ করে মক্কার পথে পাড়ি জমালেন। ওলীদ সংবাদ পেয়ে নিজের লোকদের দিয়ে তার পিছু ধাওয়া করলেন। আব্দুল্লাহ ইবনে যুবাইর অপরিচিত রাস্তা বেছে নিয়েছিলেন তাই এরা তার টিকিটিও খুঁজে পেলনা। অবশেষে ব্যর্থ মনোরথ হয়ে ফিরে এলো।

ইমাম হুসাইনও মক্কার পথে :

দ্বিতীয় রাতে হযরত হুসাইন রাযি. স্বীয় ভগ্নি উম্মে কুলসুম আর যয়নব এবং ভাতিজা ও ভাগ্নে যথাক্রমেঃ- আবুবকর জাফর, আব্বাস এবং আহলে বাইতের অন্যান্য সদস্যদেরকে সাথে নিয়ে মক্কার পথে পাড়ি জমালেন। তবে তার ভ্রাতা মুহাম্মদ ইবনে হানাফিয়া মদীনা ত্যাগ করা পছন্দ করলেন না এবং বিদায়ের প্রাক্কালে এই নসীহত করলেন- প্রিয় ভ্রাতা, তোমার চেয়ে বেশি প্রিয় আর মাহবুব আমার নিকট অন্য কেউ নাই ইয়াযীদের পক্ষে বাই'আতের অস্বীকৃতি বিষয়ে আমি তোমার সাথে একমত। তুমি তার বাই'আত করনা বরং নিজের দূতদেরকে বিভিন্ন জায়গায় প্রেরণ করে তোমার পক্ষে বাই'আতের আহবান জানাবে। দেশবাসী যদি তোমার হাতে বাইআত করে তাহলে আল্লাহ পাকের শুকরিয়া আদায় করবে। আর যদি অস্বীকার করে তাহলে তুমি এমন কোন শহরে যেওনা যেখানকার লোকেরা দুদলে বিভক্ত হয়ে গেছে।

একদল তোমার পক্ষে অপরদল বিপক্ষে। অতঃপর সেই দুই দলের মধ্যে লড়াই হয় আর তুমি সর্বপ্রথম লড়াইয়ের জন্য বেরিয়ে আস। আর ফলাফল এই দাঁড়ায় যে, যে ব্যক্তি ব্যক্তিগত গুণাবলী আর বংশীয় মর্যাদার দিক দিয়ে উম্মতের মধ্যে সর্বোত্তম ব্যক্তি ছিল নিকৃষ্ট পন্থায় তার রক্তপাত ঘটানো হয় আর তার পরিবার পরিজনকে লাঞ্ছিত করা হয়।

ইমাম হুসাইন রাযি. জিজ্ঞাসা করলেন, ভাই তাহলে আমি কোথায় যাব? মুহাম্মদ ইবনে হানাফিয়া বললেন তুমি মক্কায় অবস্থান করতে থাক সেখানে যদি শান্তি-নিরাপত্তা লাভ কর তাহলে তো ভাল। নতুবা মরুভূমি কিংবা পাহাড়ি এলাকার দিকে চলে যেও। এবং এক জায়গা থেকে আরেক জায়গায় সফর করতে থাক। এই অবস্থায় খেয়াল রাখবে দেশের পরিস্থিতি কোন দিকে মোড় নিচ্ছে। যাতে করে স্থায়ী একটা সিদ্ধান্ত নিতে পার। পরিস্থিতির প্রতি পূর্ণ দৃষ্টি রেখে কাজ করা ভাল, সুযোগ হাতছাড়া হয়ে যাওয়ার পরে আফসোস করে কি লাভ? (আল কামেল / ৩/ পৃ. ৩৭৯, তারীখে ত্বাবারী ৩/ পৃ.২৭১, আল বিদায়া ৭-৮/১৫৫).

পথিমধ্যে ইমাম হুসাইনের রাযি. সাথে আব্দুল্লাহ ইবনে মুতীর সাক্ষাত হল। অবস্থা জানার পর তিনি ইমামের কাছে আরয করলেন, হযরত! আপনি যদি মক্কা ছেড়ে অন্য কোথাও যাওয়ার ইরাদা করে থাকেন তাহলে কুফায় মোটেও যাবেন না। সেটি বড়ই অমঙ্গলের শহর। আপনার পিতাকে সেখানেই শহীদ করা হয়েছে আপনার ভাইয়ের উপর সেখানেই আততায়ীর হামলা হয়েছে এবং তাকে সহায় সম্বলহীন ভাবে পরিত্যাগ করা হয়েছে। বরং যতদূর সম্ভব আপনি হারাম শরীফ ছাড়বেন না। কেননা হেজাযবাসীরা আপনার তুলনায় অন্য কাউকে প্রাধান্য দেবে না। সেখানে বসে আপনি আপনার সমর্থক আর কল্যাণকামীদেরকে অতি সহজেই নিজের পাশে হাজির করতে পারবেন।

কুফাবাসীদের দাওয়াতী চিঠি :

হযরত ইমাম হুসাইন রাযি. মক্কা পৌঁছে আবু তালেবের ঘাঁটিতে অবস্থান নিলেন। মক্কার অধিবাসী এবং অন্যান্য এলাকার লোকজন যারা হজ্জের উদ্দেশ্যে মক্কায় আগমন করেছিল তারা যখন হযরত ইমামের আগমনের সংবাদ অবহিত হল তখন দলে দলে তার খেদমতে হাজির হতে লাগল। এরা সর্বদা তাকে বেষ্টন করে থাকত এবং নিজেদের আনুগত্য আর প্রাণ উৎসর্গের প্রমাণ রাখতে সচেষ্ট হত। আব্দুল্লাহ ইবনে যুবাইর রাযি. খানায়ে কাবার এক প্রান্তে অবস্থান করছিলেন। তিনি সারাটি দিন নামায আর তাওয়াফের মধ্যে কাটিয়ে দিতেন। কখনো কখনো ইমাম হুসাইনের রাযি. নিকট এসে পরামর্শে শরীক হতেন।

কুফাবাসীরা প্রথম থেকেই আহলে বাইতের প্রতি সমর্থনের দাবীদার ছিল। তাদের কারণেই হযরত আলী রাযি. খেলাফতের রাজধানী মদীনা থেকে কুফায় স্থানান্তর

করেছিলেন। এটা ভিন্ন কথা যে, তাদের এই দাবী কখনো পরীক্ষার কষ্টি পাথরে টিকতে পারেনি।

কুফাবাসীরা যখন হযরত মু'আবিয়ার রাযি. মৃত্যু সংবাদ অবগত হল তখন তারা উল্লাসিত হয়ে উঠল। সুলাইমান বিন যরদ খুযাই তদের সরদার ছিল। তার গৃহে গোপন পরামর্শ হল এবং সেখানে এই সিদ্ধান্ত গৃহীত হল যে, ইমাম হুসাইনকে রাযি. কুফায় এনে তার হাতে বাই'আত করে খেলাফতকে আবারো আহলে বাইতের নিকট ফিরিয়ে দেয়ার চেষ্টা করা হবে। কারণ তারাই এর উপযুক্ত ইয়াযীদ আদৌ এ পদের উপযুক্ত নয়।

এই সিদ্ধান্ত অনুযায়ী কুফার নেতৃস্থানীয় লোকদের পক্ষ থেকে প্রায় দেড়শত চিঠি হযরত ইমামের নামে প্রেরণ করা হল। সে সব চিঠির সারমর্ম ছিল নিম্নরূপ: আল্লাহর পাকের শোকর যে, আপনার প্রতিপক্ষ মৃত্যু নিদ্রায় শায়িত। এখন আমরা ইমাম বিহীন অবস্থায় আছি। আপনি দ্রুত তাশরীফ নিয়ে আসুন যাতে আপনার সাহায্যে আমরা সত্যের উপর একত্রিত হতে পারি। নুমান বিন বশীরের (কুফার গভর্নর) পিছনে আমরা জুমার নামায ও পড়ি না আর ঈদের নামাযও পড়ি না। আমরা যদি অবগত হই যে, আপনি তাশরীফ নিয়ে আসছেন তাহলে আমরা তাকে সিরিয়ার সীমান্তে ঠেলে দেব। (ইবনে কাসীর ৪ খণ্ড-৮পৃ:)

এসব চিঠি পত্র ছাড়াও কুফার বিভিন্ন নেতৃস্থানীয় ব্যক্তিবর্গ ইমাম হুসাইনের রাযি. খেদমতে উপস্থিত হয়ে তাকে কুফায় পাওয়ার অনুরোধ করতে লাগল। (আল কামেল ৩/পৃ. ৩৮৫, তারীখের ত্ববারী ৩/পৃ.২৭৩) আর বিদায়া ৮/১৫৮)

মুসলিম ইবনে আকীলের যাত্রা: অনুরোধের মাত্রা যখন সীমা ছাড়িয়ে গেল তখন হযরত হুসাইন রাযি. অবস্থা পর্যবেক্ষণের জন্য স্বীয় চাচাত ভাই মুসলিম ইবনে আকীলকে কুফায় প্রেরণ করলেন এবং তাদের নামে এই জওয়াব লিখলেন: আমি আপনাদের আগ্রহ সম্বন্ধে অবগত হয়েছি। আমি আপনাদের নিকট আমার ভাই এবং বিশ্বস্ত মুসলিম ইবনে আকীলকে পাঠাচ্ছি। তিনি সব কিছু পর্যবেক্ষণ করে আমাকে সংবাদ দেবেন। আমি যদি জানতে পারি যে কুফার আম-খাছ, ছোট-বড় সকলেই আমাকে খলীফা বানানোর প্রত্যাশী তাহলে ইনশাআল্লাহ আর দেরী করব না। বাস্তব কথা হল ঐ ব্যক্তিই ইমাম হওয়ার যোগ্য যে আল্লাহর কিতাবের ধারক, ন্যায় বিচারক এবং সত্য দীনের অনুসারী। মুসলিম ইবনে আকীল মদীনা হতে কুফায় পৌঁছলেন এবং মুখতারের গৃহে অবস্থান করতে লাগলেন। হযরত আলীর রাযি. ভক্তবৃন্দরা তাকে ঘিরে ধরল। তারা দলে দলে আসত মুসলিম ইবনে আকীল তাদেরকে হযরত হুসাইনের চিঠি পড়ে শোনাতেন আর তারা কেঁদে কেঁদে অঙ্গীকার করত যে, ইমাম হুসাইনের সহযোগিতার ব্যাপারে কোন রকম শৈথিল্য আমরা প্রদর্শন করব না। নিজেদের জীবন তার জন্য উৎসর্গ করে দেব।

নুমান ইবনে বশীর তখন হযরত মুআবিয়া কর্তৃক কুফার গভর্নর ছিলেন। তিনি সৎচরিত্র আর সন্ধি-প্রিয় ছিলেন। সব ঘটনা তিনি জানতে পারছিলেন। কিন্তু তিনি শুধু এতটুকু করলেন যে, জামে মসজিদে বক্তৃতা করতে যেয়ে বললেন- হে লোক সকল তোমরা ফেৎনার দিকে ধাবিত হয়ো না। মুসলমানদের মধ্যে বিভেদ সৃষ্টি করনা। এতে জান-মাল বরবাদ হবে আমি অপবাদ আর কু-ধারণার বশবর্তী হয়ে কোন শাস্তি দিতে চাইনা তবে তোমর যদি প্রকাশ্যে বিরোধিতা শুরু কর তাহলে আমিও কিন্তু হাত গুটিয়ে বসে থাকব না।

বনু উমাইয়ার তথা ইয়াযীদ এর সমর্থকদের মধ্যে একজন নুমানকে বাধা দিয়ে বলল, হে আমীর! আপনি দুর্বলতা প্রকাশ করছেন। এভাবে কাজ হবে না। কিন্তু নুমান জবাব দিলেন আল্লাহ তা'আলার আনুগত্যে দুর্বল হওয়া তার নাফরমানীতে শক্তিশালী হওয়ার চেয়ে ভাল।

এই ব্যক্তিই ইয়াযীদকে সব কিছু লিখে জানাল এবং এ কথাও বলল যে, কুফায় যদি নিজের শাসন কর্তৃত্ব বজায় রাখতে চাও তাহলে শক্ত কোন ব্যক্তিকে গভর্নর করে পাঠাও। নুমানের মত দুর্বল ব্যক্তির দ্বারা এখানের ফেতনা নির্মূল হবে না।

ইয়াযীদ সারজুন রুমীর পরামর্শ মত বসরার গভর্নর উবাইদুল্লাহ ইবনে যিয়াদকে কুফার গভর্নর নিযুক্ত করল এবং আদেশ দিল কুফায় যেয়ে মুসলিম ইবনে আকীলকে সেখান থেকে বহিস্কার কর অথবা হত্যা কর।

উবাইদুল্লাহ ইবনে যিয়াদের আগমন:

উবাইদুল্লাহ ইবনে যিয়াদ আপন ভ্রাতা উসমান ইবনে যিয়াদকে বসরায় নিজের স্থলাভিষিক্ত করে কুফায় রওয়ানা হয়ে গেল। সে কাপড় দিয়ে মুখ ঢেকে কুফায় প্রবেশ করল। এখানে লোকেরা ইমাম হুসাইনের আগমনের অপেক্ষায় ছিল। তারা মনে করল হযরত হুসাইন রাযি. আগমন করেছেন। সুতরাং ইবনে যিয়াদ যে রাস্তা দিয়ে যেত সেখানেই মারহাবা হে রাসূল দৌহিত্র এই শ্লোগান উঠত।

ইবনে যিয়াদ পরের দিন কুফার জামে মসজিদে এই বক্তৃতা দিল-আমীরুল মুমিনীন আমাকে কুফার গভর্নর নিযুক্ত করেছেন। আমাকে মজলুমদের সাথে ইনসাফ আর অনুগতদের সাথে সৎ ব্যবহার এবং গাদ্দার ও অবাধ্যদের সাথে কঠোরতা করার নির্দেশ দেয়া হয়েছে। আমি এই নির্দেশ অবশ্যই পালন করব। বন্ধুদের সাথে আমার ব্যবহার আপন ভাইয়ের মত হবে। আর বিরোধীদেরকে তরবারীর খাদ্য বানানো হবে। সুতরাং প্রত্যেকেই যেন নিজের উপর দয়া করে।

অতঃপর সে হুকুম জারী করল, প্রতিটি মহল্লার দায়িত্বশীল ব্যক্তি তার মহল্লায় বসবাসরত বহিরাগত এবং সন্দেহভাজন ব্যক্তিদের তালিকা যেন আমার নিকট প্রেরণ করে। কোন মহল্লার দায়িত্বশীল যদি এই আদেশ পালনে শিথিলতা করে এবং উক্ত মহল্লার যদি কেউ রাষ্ট্রদ্রোহিতায় লিপ্ত হয় তাহলে মহল্লার দায়িত্বশীলকে তার বাড়ির

দরজায় ফাঁসি দেওয়া হবে এবং মহল্লার সকল লোকদের ভাতা বন্ধ করে তাদেরকে গ্রেফতার করা হবে।

হানীর গৃহে মুসলিম: মুসলিম ইবনে আকীল যখন উবাইদুল্লাহ ইবনে যিয়াদের আগমন এবং ব্যবস্থাপনা সম্পর্কে অবগত হলেন তখন মুখতারের গৃহ ত্যাগ করে হানী ইবনে উরওয়া মারবীর গৃহে আসলেন এবং সেখানে থাকার অনুমতি চাইলেন। হানী বললেন আপনি আমাকে আমার শক্তি বহির্ভূত কাজে বাধ্য করছেন। কিন্তু আপনি যেহেতু আমার গৃহে প্রবেশ করেছেন তাই এখন অস্বীকার করার সুযোগ নেই। হানী তাকে মহিলাদের কামরায় থাকার ব্যবস্থা করে দিলেন।

হানীর গ্রেফতারী: ইমাম হুসাইনের রাযি. সমর্থকরা এবার হানীর গৃহে একত্রিত হতে শুরু করল। ইবনে যিয়াদ গুপ্তচরদের মাধ্যমে সংবাদ অবগত হয়ে হানীকে তলব করে বলল হানী আমীরুল মুমিনীনের বিরুদ্ধে তোমার গৃহে ষড়যন্ত্র হচ্ছে? তুমি মুসলিমকে নিজের ঘরে আশ্রয় দিয়েছ আর তার জন্য জনবল ও অস্ত্রশস্ত্রের অপেক্ষা করছ আবার এটাও মনে করছ যে, এসব বিষয়ে আমি অবগত নই? হানী দেখলেন অস্বীকার করে কোন লাভ নেই তাই তিনি স্বীকার করে নিলেন যে, মুসলিম ইবনে আকীল আমার গৃহেই আছে। কিন্তু লাঞ্ছনা গঞ্জনার ভয়ে তাকে যিয়াদের হাতে তুলে দিতে অস্বীকার জানালেন। ইবনে যিয়াদ হানীর সাথে কঠোরতা করল এবং তাকে নিজের গৃহে বন্দী করে রাখল।

রাজ ভবন অবরোধ: মুসলিম ইবনে আকীল যখন স্বীয় মেজবানের বন্দী হওয়ার সংবাদ অবগত হলেন তখন তিনি ‘ইয়া মানসূর উম্মাহ’ শ্লোগান লাগালেন। মুসলিম ইবনে আকীলের হাতে ঐ সময় পর্যন্ত ১৮ হাজার মানুষ বাই’আত হয়েছিল। তাদের মধ্যে চার হাজার লোক আশপাশের গৃহ সমূহে অবস্থান করছিল। শ্লোগান শুনতেই তারা সকলে বাইরে বেরিয়ে এলো। মুসলিম ইবনে আকীল তাদেরকে সাথে নিয়ে রাজ ভবন ঘেরাও করলেন। অন্যরা সংবাদ পেয়ে তারাও মুসলিমের সাহায্যার্থে ছুটে এলো। এমনকি জামে মসজিদ আর বাজার ইমাম হুসাইনের রাযি. সমর্থকদের দ্বারা পরিপূর্ণ হয়ে গেল।

মুসলিমের গ্রেফতারী আর শাহাদাত: ইবনে যিয়াদের নিকট তখন পুলিশের ৩০ জন লোক এবং শহরের গণ্যমান্য আর তার খানদানের ২০ জন লোক উপস্থিত ছিল। ইবনে যিয়াদ শহরের গণ্যমান্য লোকদের বলল আপনার নিজ নিজ গোত্রের উপর প্রভাব খাটিয়ে তাদেরকে মুসলিমের সংগ ত্যাগ করতে বলুন। তারা বাইরে এসে স্বীয় গোত্রের লোকদেরকে হুমকি ধমকি দিতে শুরু করল।

অতঃপর নিরাপত্তার পতাকা উড্ডয়ন করল। মুসলিম ইবনে আকীলের সাথীরা তার থেকে পৃথক হতে শুরু করল। শেষ পর্যন্ত তার সাথে মাত্র ত্রিশ জন লোক রয়ে গেল। মুসলিম এই অবস্থা দেখে আশ্রয়ের জন্য কিনদাহ মহল্লার দিকে চললেন। মহল্লা পর্যন্ত

পৌছতে পৌছতে সম্পূর্ণ একা হয়ে গেলেন। রাত ছিল অন্ধকার। ক্লান্তিতে শরীর ভেঙ্গে পড়ছিল। কোথায় মাথা গুজবেন এই চিন্তায় অস্থির হয়ে পড়লেন।

একটি ঘরের দরজায় একজন বৃদ্ধাকে দন্ডায়মান দেখতে পেয়ে তিনি তার নিকট পৌঁছে নিজের মুসীবতের উপাখ্যান শোনালেন। বৃদ্ধার মনে দয়ার উদ্রেক হল। তাই নিজের গৃহের একটি প্রকোষ্ঠে তাকে লুকিয়ে রাখলেন। ইবনে যিয়াদ ইশার নামাযের পরে জামে মসজিদে ঘোষণা করে দিল, যে ব্যক্তি মুসলিম ইবনে আকীলকে আশ্রয় দেবে তাকে হত্যা করা হবে। আর যে ব্যক্তি তাকে ধরিয়ে দেবে তাকে পুরস্কৃত করা হবে। অতঃপর পুলিশকে অর্ডার দিল কুফার সকল ঘর বাড়ি তন্ন তন্ন করে তালাশ করার । বৃদ্ধার ছেলে প্রাণের ভয়ে সরকারী লোকদেরকে সংবাদ দিয়ে দিল। ইবনে যিয়াদ মুসলিম ইবনে আকীলকে গ্রেফতারের জন্য মুহাম্মদ ইবনে আশ'আসকে পাঠাল। ইবনে আশ'আস মুসলিম ইবনে আকীলের অবস্থানস্থল ঘিরে ফেলল। মুসলিম যখন জানতে পারলেন দুশমন মাথার উপর দন্ডায়মান অথচ তিনি একা আর তার মোকাবিলায় ৭০ জন তবুও তিনি দীর্ঘক্ষণ যাবৎ বাহাদুরীর সাথে লড়াই করলেন এবং কাউকে নিকটে ঘেষতে দিলেন না। পরিশেষে মুহম্মদ ইবনে আশ'আস বলল: আমরা আপনাকে নিরাপত্তা দিচ্ছি, আপনি নিশ্চিন্তে আমাদের আশ্রয়ে আসতে পারেন। আপনিতো আমাদের পর নন। মুসলিম ইবনে আকীল আঘাতে আঘাতে জর্জরিত ছিলেন, বাধ্য হয়ে তিনি মুহাম্মদ ইবনে আশআসের নিকট নিজেকে সপে দিলেন। রাস্তায় তিনি ইবনে আশ'আসকে বললেন আমার মনে হয় তুমি আমার প্রাণ বাঁচাতে পারবে না। তবে আমার একটা দরখাস্ত আছে তুমি সেটা অবশ্যই গ্রহণ কর। ইবনে আশ'আস জিজ্ঞেস করল কি সেটা? মুসলিম বললেন কাউকে পাঠিয়ে আমার অবস্থা সম্বন্ধে ভাই হুসাইনকে জানিয়ে দিও। আর আমার পক্ষ থেকে তাকে বলে দিও তিনি যেন কুফাবাসীদের ধোঁকায় না পড়েন এরা তো তারাই যাদের হাত থেকে মুক্তি আশা তার পিতা সব সময় করতেন। আরো বলে দিও তিনি যেন পরিবার পরিজন নিয়ে মক্কা ফিরে যান।

মুহাম্মদ ইবনে আশ'আস ওয়াদা করল যে, এই পয়গাম ইমামের নিকট পৌঁছে দেবে। অতঃপর সে তার এই ওয়াদা রক্ষা করেছিল। (আল কামেলা ৩/পৃঃ/ ৩৮৭-৮৮-৮৯-৯৮)

মুসলিম ইবনে আকীল ইবনে যিয়াদের সামনে নীত হলেন। ইবনে যিয়াদ তিরস্কার করলে তিনিও কঠোরভাবে প্রতিউত্তর দিলেন। অবশেষে ইবনে যিয়াদ তাকে শহীদ করে দিল। মুসলিমের পরে ইবনে যিয়াদ হানী ইবনে উরওয়াকে হত্যার আদেশ দিল। শহরে হানীর প্রভাব প্রতিপত্তির কারণে মুহাম্মদ ইবনে আশ'আস তার প্রাণ রক্ষার চেষ্টা করলেন। কিন্তু ইবনে যিয়াদ কোন কথা গ্রাহ্য না করে তাকেও শহীদ করে দিল।

ইবনে যিয়াদ উভয় শহীদের মাথা ইয়াযীদের নিকট পাঠিয়ে দিল। ইয়াযীদ কৃতজ্ঞতা জানিয়ে লিখে পাঠাল আমি জানতে পারলাম হুসাইন ইরাকের পথে যাত্রা শুরু করেছে তুমি কঠোর পাহারাদারীর ব্যবস্থা গ্রহণ কর। কারো পক্ষ থেকে সামান্য সন্দেহ প্রকাশ

পেলে তাকে গ্রেফতার কর। তবে যতক্ষণ পর্যন্ত কেউ তোমার মোকাবিলায় তরবারী না উঠায় তুমিও তার বিরুদ্ধে তরবারী ধারণ করনা।

হযরত হুসাইনের রাযি. কুফা যাওয়ার সংকল্প আর সহমর্মিদের নসীহতঃ

মুসলিম ইবনে আকীল যখন কুফায় পৌঁছলেন তখন হযরত হুসাইন রাযি. এর পক্ষে ১৮ হাজার মানুষ তার হাতে বাই'আত করেছিল। এই পরিপ্রেক্ষিতে তিনি হযরত হুসাইনকে রাযি. লিখে জানালেন:- আপনি নিশ্চিন্তে তাশরীফ নিয়ে 'আসতে পারেন। ইরাকবাসীরা আপনার সমর্থক এবং বনু উমাইয়ার তথা ইয়াযীদ এর প্রতি অসন্তুষ্ট। সুতরাং হযরত ইমাম হুসাইন রাযি. কুফা যাত্রার আয়োজন করতে লাগলেন। তার কল্যাণকামীরা যখন এ বিষয়ে অবগত হল তখন তারা ইমাম হুসাইন এর ইচ্ছা থেকে বিরত রাখার জন্য সর্বতোভাবে চেষ্টা চালাতে লাগল। উমর ইবনে আব্দুর রহমান ইবনে হারস বলল আমি জানতে পারলাম আপনি ইরাক যাওয়ার মনস্থ করেছেন। অথচ সেখানকার সরকারী কর্মকর্তারা বনু উমাইয়ার সমর্থক। সেখানকার ধনভাণ্ডারও তাদের কবজায়। পাবলিকের কোন ভরসা নেই। তারা ঘরের গোলাম। আমার আশংকা হয় যেসব লোকেরা আপনাকে সহযোগিতার আশ্বাস দিয়েছে তারাই কাল আপনার সাথে মোকাবিলা করবে। হযরত ইমাম বললেন ভাই! তোমার কথা মানি আর না মানি তুমি যে সত্যিকারের হিতাকাঙ্খী তাতে কোন সন্দেহ নেই।

হযরত আব্দুল্লাহ ইবনে আব্বাস রাযি. বললেন হে চাচাত ভাই! মশহুর হয়ে গেছে তুমি নাকি ইরাকে যাচ্ছ। আল্লাহর ওয়াস্তে এরকম এরাদা মোটেও করনা। ইরাকবাসীরা কি বনু উমাইয়ার শাসকদেরকে বহিস্কার করে সে এলাকার নিয়ন্ত্রণ নিয়ে নিয়েছে? যদি এরকম হয় তাহলে অবশ্যই যাও। কিন্তু অবস্থা যদি এই হয় যে তাদের শাসকরা এখনো ক্ষমতায় অধিষ্ঠিত, ধনভাণ্ডারের চাবি তাদেরই হাতে তাহলে কুফাবাসীরা তোমাকে এই জন্য ডাকছে যে, তারা তোমাকে যুদ্ধের আগুনে ঠেলে দিয়ে নিজেরা পৃথক হয়ে যাবে। এই আচরণই তারা তোমার পিতা আর ভাইয়ের সাথেও করেছে। হযরত হুসাইন উত্তরে বললেন আমি এস্তেখারা করে দেখব।

দ্বিতীয় দিন আব্দুল্লাহ ইবনে আব্বাস রাযি. আবার এলেন আর বললেন, চাচার বেটা! আপনি কুফার ধারে কাছেও যাবেন না। কুফাবাসীরা বিশ্বাস ঘাতক। আপনি মক্কায় অবস্থান করে আপনার বাইআতের আহবান জানান। আপনি হেজাযবাসীদের সরদার তারা আপনার কথা গ্রহণ করবে। আর যদি মক্কা থেকে চলে যেতেই চান তাহলে ইয়ামানের দিকে যান। যেটি একটি বিশাল রাজ্য। সেখানে আত্মরক্ষার ব্যবস্থা আছে। আর আপনার পিতার হিতাকাংক্ষীরাও সেখানে বিদ্যমান আছেন।

সেখানে অবস্থান করে ইসলামী প্রদেশ সমূহে স্বীয় খেলাফতের পয়গাম পৌঁছে দিন। আমি আশা করি আপনি সফলকাম হবেন।

ইমাম হুসাইন রাযি. বললেন ভাই! তোমার স্নেহশীল হওয়ার ব্যাপারে আমার কোন সন্দেহ নেই। কিন্তু আমি তো ইরাকে যাওয়ার সিদ্ধান্ত নিয়ে ফেলেছি।

আব্দুল্লাহ ইবনে আব্বাস রাযি. বললেন এই সিদ্ধান্ত যদি অটল হয়ে থাকে তাহলে নারী ও শিশুদেরকে সাথে নিয়ে যাবেন না। আমার আশংকা হয় হযরত উসমানের রাযি. মত আপনাকেও নারী ও শিশুদের সামনে মাটি আর রক্তের মধ্যে তড়পাতে না হয়।

আব্দুল্লাহ ইবনে যুবাইর যখন জানতে পারলেন তখন তিনিও বুঝিয়ে বললেন আপনি হারাম শরীফে অবস্থান করে বিভিন্ন এলাকায় নিজ খেলাফতের দাওয়াত দিন আর ইরাকের সমর্থকদেরকে লিখুন তারা যেন এখানে এসে আপনার সাহায্য করে। আমিও আপনার সাহায্যের জন্য উপস্থিত থাকব। হারাম শরীফ এমনিতেও ইসলামী বিশ্বের কেন্দ্রবিন্দু। বিভিন্ন দেশের মুসলমানরা এখানে আসা যাওয়া করতে থাকে। সুতরাং এখানে অবস্থান করা আপনার জন্য মঙ্গলজনক হবে।

কিন্তু হযরত হুসাইন জবাব দিলেন আমি স্বীয় পিতার নিকট শুনেছি যে হারাম শরীফের একটি মেষ হারাম শরীফের ইজ্জত ভূলুণ্ঠিত করার কারণ হবে আমি সেই মেষ বনতে চাইনা। (আল কামেল ৩/৩৯৯-৪০১)

কুফার পথে ইমাম হুসাইন রাযি.:- পরিশেষে ৬০ হিজরীর ৮ই যিলহজ্জ তিনি পরিবার পরিজন আর বন্ধু বান্ধবদেরকে সাথে নিয়ে মক্কা থেকে কুফার পথে রওয়ানা হলেন। সাফফাহ নামক স্থানে পৌঁছে তার সাক্ষাত হল বিখ্যাত ইসলাম কবি ফারাযদাকের সাথে যিনি ইরাক থেকে ফিরছিলেন। তিনি তার নিকট ইরাকের অবস্থা জানতে চাইলেন। ফারাযদাক বললেন ইরাকবাসীদের অন্তর আপনার সাথে কিন্তু তাদের তরবারী বনু উমাইয়ার সাথে। আর ফয়সালা তো আল্লাহর হাতে।

হযরত হুসাইন রাযি. বললেন তুমি সত্য বলেছ। আল্লাহর ফায়সালা যদি আমাদের মর্জিমত হয় তাহলে আমরা আল্লাহ পাকের শুকরিয়া আদায় করব। আর যদি মৃত্যু আমাদের আশা-আকাঙ্খার মাঝে অন্তরায় হয়ে দাড়ায় তাহলেও কোন অসুবিধা নাই কেননা আমাদের নিয়ত ভাল।

আরো কিছু দূর যেয়ে তার সাক্ষাত হল স্বীয় চাচাত ভাই আব্দুল্লাহ ইবনে জাফরের সাথে তিনি অত্যন্ত জোরালো ভাবে ফিরে আসার অনুরোধ জানালেন আর বললেন আমার আশংকা হয় এই রাস্তায় আপনার প্রাণ সংহার আর আপনার পরিবারের ধ্বংস না নেমে আসে।

মদীনার গভর্নর আমর ইবনে সাঈদের নিকট হতে হযরত হুসাইনের রাযি. নামে তিনি একটি নিরাপত্তাও লিখিয়ে এনেছিলেন। তিনি ইমাম হুসাইনকে নাছোড়বান্দা হয়ে বাধা প্রদান করলেন তার হাত থেকে বাচার জন্য ইমাম হুসাইন নিজের স্বপ্ন শুনাতে বাধ্য হলেন, যে নানাজী রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম কে স্বপ্নে দেখেছি

তিনি আমার জন্য অপেক্ষা করেছেন। আমাকে নিয়ে ইফতার করবেন। সুতরাং পরিস্থিতি যাই হোক না কেন আমাকে সামনে অগ্রসর হতে হবে। অতঃপর ইমাম হুসাইন রাযি. নিজের সিদ্ধান্তে অটল থেকে সামনে অগ্রসর হতে থাকলেন।

সা'লাবিয়া নামক স্থানে পৌঁছে তিনি মুসলিম ইবনে আকীলের শাহাদাতের সংবাদ পেলেন। কয়েকজন সাথি তাকে বললেন, আপনাকে আল্লাহর কসম, আপনি ফিরে চলুন। কুফায় আপনার কোন সমর্থক ও সাহায্যকারী আছে বলে মনে হয় না। কিন্তু মুসলিম ইবনে আকীলের আত্মীয়-স্বজনরা বলল আমরা ফিরব না। মুসলিম হত্যার বদলা নেব অথবা আমাদের জানও দিয়ে দেব।

একথা শুনে হযরত হুসাইন রাযি. বললেন, এদেরকে পরিত্যাগ করে জীবনের কোন স্বাদ নেই। যাবালা নামক স্থানে পৌঁছে তিনি স্বীয় দুধভাই আব্দুল্লাহ ইবনে বাকতারের শাহাদাতের সংবাদ পেলেন। হযরত হুসাইন রাযি. আব্দুল্লাহ ইবনে বাকতারকে একটি চিঠি দিয়ে মুসলিমের নিকট পাঠিয়েছিলেন। তিনি যখন পৌঁছলেন তখন মুসলিমের হত্যাকাণ্ড সংঘটিত হয়ে গিয়েছিল। ইবনে যিয়াদ তাকেও বিল্ডিংয়ের ছাদ থেকে ফেলে দিয়ে হত্যা করল।

এসব সংবাদ দ্বারা তিনি কুফার অবস্থা সম্পর্কে একটা ধারণা লাভ করতে পারলেন। তিনি স্বীয় সাথিদেরকে বললেন কুফাবাসীরা আমাদের সাথে বিশ্বাসঘাতকতা করেছে। তাদের নিকট থেকে সাহায্য পাওয়ার কোন আশা নেই। সুতরাং আমার যেসব সাথিরা ফিরে যেতে ইচ্ছুক তারা খুশি মনে ফিরে যেতে পারে। আমার পক্ষ থেকে পূর্ণ অনুমতি আছে। এই এলান শুনে তার বেশির ভাগ সাথি ইমাম হুসাইন রাযি. কে ছেড়ে নিজেদের বাড়ির দিকে ফিরে গেল। শুধু তার পরিবারের সদস্যবর্গ এবং খাস কয়েকজন প্রাণ উৎসর্গকারী রয়ে গেল।

ইমাম হুসাইনকে রাযি. বাধা প্রদান :- ইবনে যিয়াদ ইমাম হুসাইনের রাযি. যাত্রার সংবাদ অবগত হয়েছিল। তাই সে ইয়াযীদের নির্দেশমতো মক্কা মদীনা থেকে ইরাক অভিমুখি সকল রাস্তা বন্ধ করে দিয়েছিল এবং হুর ইবনে ইয়াযীদ তামীমীকে এক হাজারের বাহিনী দিয়ে হযরত হুসাইনের সন্ধানে এবং তাকে ঘিরে ফেলার জন্য পাঠিয়ে দিয়েছিল।

হযরত হুসাইন রাযি. যখন হাশাম নামক স্থানে পৌঁছলেন তখন হুর ইবনে ইয়াযীদ ও তার সন্ধান করতে করতে সেখানে এসে উপস্থিত হল এবং তার মুখোমুখি তাঁবু স্থাপন করল। ইমাম হুসাইন রাযি. স্বীয় সাথিদেরকে হুকুম দিলেন ওদেরকে পানি পান করাও আর ওদের ঘোড়াগুলিরও তৃষ্ণা নিবারণ কর এরা ঠিক দুপুরে এসে উপস্থিত হয়েছে।

যোহরের নামাযের সময় হলে ইমাম হুসাইন রাযি. হুরকে জিজ্ঞাসা করলেন, তোমরা আমাদের সাথে নামায আদায় করবে নাকি পৃথক পড়বে? হুর বলল, এক সাথেই

পড়ব। সুতরাং উভয় বাহিনী একত্রে ইমাম হুসাইনের পেছনে নামায আদায় করল। নামায শেষে ইমাম হুসাইন রাযি. হুরের সেনাবাহিনীকে লক্ষ্য করে বললেন: লোক সকল আমি তোমাদের আমন্ত্রণের পরিপ্রেক্ষিতেই এসেছি। তোমরা চিঠি লিখেছ, দূত পাঠিয়েছ যে, আপনি এখানে আগমন করে আমাদের নেতৃত্ব গ্রহণ করুন। তোমরা যদি এখনো তোমাদের কথার উপর অটল থাকার ওয়াদা কর তাহলে আমি তোমাদের শহরে যাব আর যদি আমার আগমন তোমাদের অপছন্দনীয় হয় তাহলে নিজ দেশে ফিরে যাব।

হুর বলল, আপনি চিঠি আর দূত পাঠানোর কথা কি বলছেন? আমরা তো এ সম্বন্ধে কিছুই জানিনা। এবার ইমাম হুসাইন রাযি. দুটি ঝোলা থেকে চিঠির স্তূপ বের করে কুফাবাসীদের সামনে রাখলেন। হুর বলল, যাই হোক আমরা এসব চিঠি লিখি নাই। আমাদেরকে তো আপনাকে গ্রেফতার করে ইবনে যিয়াদের সামনে হাজির করার নির্দেশ দেয়া হয়েছে।

ইমাম হুসাইন রাযি. বললেন এটা তো অসম্ভব। অতঃপর তিনি সাথিদেরকে নিজ নিজ এলাকায় ফিরে যাওয়ার আদেশ দিলেন।

হুর বাধা দিয়ে বলল আমি আপনাকে ফিরে যেতে দেবনা। তবে আপনার সাথে লড়াইও করব না। সবচেয়ে ভাল হয় আপনি যদি ইরাক আর হেজাযের মধ্যবর্তী কোন রাস্তা অবলম্বন করেন। আমি ইবনে যিয়াদকে লিখে পাঠাচ্ছি আপনিও ইয়াযীদকে লিখুন। হতে পারে এমন কোন সুরত পয়দা হয়ে যাবে যাতে আমাকে আপনার মোকাবিলার দাঁড়াতে না হয়।

ইমাম হুসাইন রাযি. এই প্রস্তাব কবুল করলেন এবং উত্তর দিকে নিনওয়ার পথ ধরলেন হুরও পিছন থেকে তাকে অনুসরণ করতে লাগল।

আযিবুল মিহজানাতে পৌঁছে সেখানে তুরমাহ বিন আদীর সাথে তার সাক্ষাৎ হল। তুরমাহ বলল কুফায় আপনার বিরুদ্ধে লড়াইয়ের জোর প্রস্তুতি চলছে। এত বড় বাহিনী আমি কখনও ময়দানে জমা হতে দেখিনি। আমার পরামর্শ হল আপনি বনু ত্বাই গোত্রের প্রসিদ্ধ পাহাড় 'আজা'য় চলে যান। সেখানে গাসসানি আর হিময়ার গোত্রের শাসকরাও কখনো সুবিধা করতে পারেনি। আপনি যদি সেখানে তাশরীফ নিয়ে যান তাহলে বনু ত্বাই গোত্রের ২০ হাজার যুবকের দায়িত্ব আমি গ্রহণ করব। যাদের তরবারী আপনার সাহায্যার্থে কোষমুক্ত হবে।

কিন্তু হযরত হুসাইন রাযি. শুকরিয়ার সাথে তার প্রস্তাব ফিরিয়ে দিলেন এবং বললেন হুরের সাথে আমার যে চুক্তি হয়েছে আমি তা ভঙ্গ করব না। নিনওয়া পৌছার পর হুর ইবনে যিয়াদের পত্র পেল যাতে লেখা ছিল হুসাইন রাযি. এবং তার সাথিদেরকে এক্ষুনি বাধা দাও এবং তাদেরকে এমন জায়গায় নামতে বাধ্য কর যেখানে কোন আড়াল নেই পানিও নেই। হুর ইমাম হুসাইনকে এই চিঠি দেখাল। তিনি বললেন

আরো কিছুদূর যেতে দাও। তারপরে আমরা নেমে পড়ব। হুর রাজি হয়ে গেল। যখন তিনি কারবালা ময়দানে পৌঁছলেন তখন হুর রাস্তা বন্ধ করে দাঁড়িয়ে গেল এবং বলল এবার আর সামনে অগ্রসর হতে দেবনা। এখানেই নেমে পড়ুন । দরিয়ারে ফুরাতও এখান থেকে নিকটে। ইমাম হুসাইন এবং তার সাথিগণ ৬১ হিজরীর ২রা মুহররম কারবালা ময়দানে অবতরণ করলেন। (আল কামেল ৩/৪০৭-১১)

ইমাম হুসাইন রাযি. এর কারবালায় অবস্থান: কারবালায় অবতরণের পরের দিন উমর ইবনে সাআদ ইবনে অক্কাস চার হাজার সৈন্য নিয়ে সেখানে উপস্থিত হল। উমর ইবনে সাআদ কে ইবনে যিয়াদ রাই এবং সীমান্ত শহর দাইলামের শাসক নিযুক্ত করেছিল। সে স্বীয় এলাকার যাওয়ার প্রস্তুতি নিচ্ছিল এমন সময় ইমাম হুসাইনের রাযি. যাত্রার সংবাদ আসে তাই ইবনে যিয়াদ তাকে ইমাম হুসাইনকে প্রতিহত করার নির্দেশ দেয় কিন্তু উমর ইবনে সাআদ অপারগতা প্রকাশ করে। ইবনে যিয়াদ বলল এই দায়িত্ব পালন করতে যদি দ্বিধাদ্বন্দ্ব থাকে তাহলে রাই আর দাইলামের কর্তৃত্বও তুমি পাবে না। উমর ইবনে সাআদ শাসন ক্ষমতার লোভে এই আদেশ পালন করতে রাজি হয়ে গেল। কিন্তু সে ইমাম হুসাইনের রাযি. সাথে লড়াই করতে চাচ্ছিল না। তাই শেষ সময় পর্যন্ত মিটমাটের চেষ্টা চালিয়ে যেতে লাগল।

উমর ইবনে সাআদ ইমাম হুসাইনের রাযি. নিকট দূত পাঠিয়ে জানতে চাইল, আপনি কি উদ্দেশ্য নিয়ে এসেছেন? ইমাম হুসাইন রাযি. বললেন, ১৮ হাজার কুফাবাসীরা আমাকে চিঠি লিখেছিল যে, আমাদের কোন ইমাম নেই। আপনি তাশরীফ নিয়ে আসুন আমরা আপনার হাতে বাই'আত করব। আমি তাদের চিঠির উপর ভরসা করে বেরিয়ে পড়েছি। পরে কুফাবাসী আমার হাতে বাই'আত করেও তা ভঙ্গ করেছে এবং আমার সাথে বিশ্বাস ঘাতকতা করেছে। আমি এটা অবগত হয়ে দেশে ফিরে যেতে চাইলাম কিন্তু হুর ইবনে ইয়াযীদ আমাকে ফিরে যাওয়ার অনুমতি দিলনা। এখন তুমি আমার নিকটাত্মীয়। আমাকে ছেড়ে দাও, আমি মদীনা চলে যাব।

উমর এই জওয়াব শুনে বলল, আলহামদুলিল্লাহ। আল্লাহর শপথ আমি নিজেও চাই যে হুসাইনের রক্তে আমার হাত যেন রঞ্জিত না হয়। অতঃপর সে ইবনে যিয়াদকে ইমাম হুসাইনের উদ্দেশ্য সম্পর্কে অবহিত করল। ইবনে যিয়াদ উত্তরে লিখল হুসাইনের নিকট থেকে ইয়াযীদের বাই'আত গ্রহণ কর। এর পরে আমরা অন্য বিষয় নিয়ে চিন্তা করব। যদি বাইআতে রাজি না হয় তাহলে তার পানি বন্ধ করে দাও।

পানি বন্ধ করে দেয়া হল: ইমাম হুসাইন কোন অবস্থায় ইয়াযীদের হাতে বাই'আত করতে সম্মত হলেন না। সুতরাং মুহাররমের ৭ তারিখে উমর ইবনে সাআদ ইমাম হুসাইন এবং তার সাথিদের পানি বন্ধ করে দিল। এবং ফুরাতের তীরে ৫০০ সৈন্য মোতায়েন করল। ইমাম হুসাইন রাযি. স্বীয় বাহাদুর ভাই আব্বাস ইবনে আলীকে পানি আনতে বললেন। তিনি ত্রিশ জন অশ্বারোহী আর বিশটি মশক নিয়ে পানি আনতে গেলেন। এবং জোর করে পানি নিয়ে এলেন। (আল কামেল ৩/৪১২)

মহিমান্বিত শাহাদতের হৃদয় বিদারক ঘটনা: উমর ইবনে সাআদ ইমাম হুসাইনের সাথে লড়াই করতে চাচ্ছিলনা। তার আন্তরিক ইচ্ছা ছিল যেন সন্ধির কোন সুরত পয়দা হয়ে যায় আর তার তরবারী নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এর বংশের লোকদের রক্তে রঞ্জিত না হয়। তাই সে যুদ্ধের ব্যাপারে গড়িমসি করতে লাগল এবং ইমাম হুসাইনের সাথে বার বার সাক্ষাৎ করতে লাগল। এক রাতে হযরত হুসাইন রাযি. এবং উমর ইবনে সাআদ উভয় বাহিনীর মাঝামাঝি স্থানে একত্রিত হলেন এবং গভীর রাত পর্যন্ত আলোচনা করতে লাগলেন। ইমাম হুসাইন রাযি. উমর ইবনে সাআদকে বললেন আমরা উভয়ে আমাদের বাহিনীকে এখানে রেখে সরাসরি ইয়াযীদের নিকট যেয়ে মুখোমুখি আলোচনা করি। উমর ইবনে সাআদ বলল তাহলে ইবনে যিয়াদ আমার ঘর বিরান করে ফেলবে। ইমাম হুসাইন বললেন তাহলে আমাকে আমার দেশে ফিরে যেতে দাও। অথবা অন্য কোন জায়গায় চলে যাওয়ার অনুমতি দাও পরে অবস্থা যা হওয়ার হবে। কিন্তু ইবনে সাআদ এই প্রস্তাব গ্রহণ করতেও অপারগতা প্রকাশ করল।

প্রিয় পাঠক বাস্তব কথা হচ্ছে উভয়ের আলোচনার ব্যাপারে যা কিছু বলা হল এসব অনুমান মাত্র। কেননা ইবনে সাআদ আর ইমাম হুসাইনের রাযি. মধ্যে যে আলোচনা হয়েছিল তা ছিল একান্তই গোপনীয় সেখানে তৃতীয় কোন ব্যক্তি উপস্থিত ছিল না।

তবুও প্রকৃত ব্যাপার হল ইবনে সাআদ এসব আলোচনার পরিপ্রেক্ষিতে সমস্যার সমাধানের জন্য তৃতীয় একটি পথ পেয়ে গেল এবং নিজস্ব মতামত সম্পর্কে ইবনে যিয়াদকে অবহিত করল। ইবনে যিয়াদ ইমাম হুসাইন রাযি. এবং ইবনে সাআদের আলোচনার রিপোর্ট নিয়মিত অবহিত হচ্ছিল তার আশংকা হল যে ইবনে সাআদ আবার ইমাম হুসাইনের সাথে মিলে না যায় আর এভাবে সব পরিকল্পনা ভণ্ডুল না হয়ে যায়। সুতরাং সে শিমার যিল জওশানের পরামর্শে ইবনে সাআদকে লিখল আমি তোমাকে এই জন্য পাঠাইনি যে তুমি হুসাইনের মোকাবিলা থেকে পিঠ বাঁচাতে থাকবে আর তাকে মিথ্যা আশ্বাস দিতে থাকবে বা যুদ্ধ প্রলম্বিত করতে থাকবে কিংবা তার ব্যাপারে কোন সুপারিশ নিয়ে আমার নিকট আসবে। হুসাইন যদি নিঃশর্ত আনুগত্য কবুল করে তাহলে তাকে আমার নিকট পাঠিয়ে দাও। আর যদি অস্বীকৃতি করে তাহলে যুদ্ধ করে তাকে কতল করে দাও। এই হুকুম পালনে তোমার যদি কোন দ্বিধাদ্বন্দ্ব থাকে তাহলে আমি শিমার যিল জওশানকে পাঠাচ্ছি। তুমি বাহিনী তাকে বুঝিয়ে দিয়ে নিজেকে অপসারিত মনে কর। ইবনে যিয়াদের এই ধমকির পরে ইবনে সাআদ মনে না চাওয়া সত্বেও উঠল আর তার সেনাবাহিনীতে যুদ্ধের প্রস্তুতি নেয়ার নির্দেশ দিল। এটি হল ৯ই মুহাররম সন্ধ্যা বেলার ঘটনা।

ইমাম হুসাইন রাযি. সংবাদ অবগত হয়ে এক রাতের অবকাশ চাইলেন। ইবনে সাআদ অবকাশ দিল। হযরত হুসাইন রাযি. এর এবার দৃঢ় বিশ্বাস হয়ে গিয়েছিল যে সত্য পথে এবার তাকে জীবন উৎসর্গ করতে হবে। শত্রুরা তার রক্তে পিপাসা নিবারণ

না করে শান্ত হবে না। তিনি সকল সাথীকে একত্রিত করে ইরশাদ করলেন: আমি আমার সাথিদের চাইতে বেশি অনুগত ও সৎচরিত্রবান অন্য কাউকে দেখি নাই। এবং স্বীয় পরিবার বর্গের চাইতে বেশি নেক সালেহ আর আত্মীয়তার সম্পর্ক রক্ষাকারী অন্য কাউকে পাইনি। আল্লাহ তা'আলা আপনাদের সকলকে উত্তম বিনিময় দান করুন। আগামী কাল আমার আর দুশমনদের আখেরী ফয়সালার দিন। তারা শুধু আমাকেই চায়। তাই আমি তোমাদের সকলকে সন্তুষ্ট চিত্তে ফিরে যাওয়ার অনুমতি দিচ্ছি। আমার সাথিরা আমার পরিবারের সদস্যদেরকে নিয়ে রাতের অন্ধকারেই যেন চলে যায়। এবং নিজ নিজ শহরে পৌঁছে উত্তম যুগের অপেক্ষা করতে থাকে।

কিন্তু তার অনুগত আর জীবন উৎসর্গকারী সাথিরা একবাক্যে বলে উঠল, আপনার পরে আমরাই বা জীবিত থেকে কি করব। আল্লাহ তা'আলা আমাদেরকে যেন সেদিনের জন্য বাকি না রাখেন।

এই উত্তর শুনে ইমাম হুসাইন রাযি. চুপ হয়ে গেলেন অতঃপর দীর্ঘক্ষণ পর্যন্ত যুদ্ধের কলাকৌশল সম্পর্কে আলোচনা করতে লাগলেন এবং আহলে বাইতের সদস্যদেরকে ওসীয়ত করতে লাগলেন।

তাঁর ভগ্নি যয়নব বিনতে আলী খুব অস্থিরতা প্রকাশ করতে লাগলে তিনি বললেন, আরে বোন! সবর কর। দেখ, আসমান-যমীনের সকল অধিবাসীই ধ্বংসশীল শুধুমাত্র আল্লাহ তায়ালার সত্তাই চিরস্থায়ী। আমাদের এবং প্রতিটি মুসলমানের রাসূলে আকরাম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এর আদর্শের অনুসরণ করা উচিৎ। হে বোন, তোমাকে আল্লাহর কসম দিয়ে বলছি সত্য পথে অবিচল থেকে আমি যদি সফলকাম হতে পারি তাহলে তুমি আমার শোকে জামা ছিঁড়ে চেহারা খামচে হা হুতাশ করে মাতম করনা। (ইবনে আসীর-৪-২৪)

এসব ব্যবস্থা থেকে ফারেগ হয়ে তিনি সিজদায় মাথা লুটিয়ে দিলেন এবং রাতভর দূ'আ মুনাজাতের মধ্যে কাটিয়ে দিলেন। তার সাথিরাও সারারাত নামায, ইস্তিগফার আর কাকুতি-মিনতির মধ্যে কাটিয়ে দিল। (আল কামেল ৩/৪১৭)

শাহাদাতের সকালঃ পরিশেষে আশুরা দিবসের সকালের উন্মেষ ঘটল। সূর্য রক্ত অশ্রু ছড়াতে ছড়াতে উদিত হল। হযরত হুসাইন রাযি. ফজরের নামায শেষে জীবন উৎসর্গকারী ৭২ জন সাথি নিয়ে রণাঙ্গনে এলেন। ডান দিকে যুবায়ের ইবনে কীন, বাম দিকে হাবীব ইবনে মুজাহেরকে নিযুক্ত করলেন।

আব্বাস ইবনে আলীর হাতে পতাকা তুলে দিয়ে ইমাম হুসাইন রাযি. স্বয়ং ঘোড়ার পিঠে আরোহণ করলেন এবং কুরআন শরীফ আনিয়া সামনে রাখলেন অতঃপর হাত তলে দূ'আ করলেন।

তিনি যদিও খুব ভালভাবে জানতেন যে, তার কোন চেষ্টা বাহ্যিকভাবে সফলকাম হবে না তবুও দলীলের পূর্ণতার জন্য কুফাবাসীদেরকে সম্বোধন করে নিম্নোক্ত ভাষণ প্রদান

করলেন, যাতে করে কুফাবাসী আল্লাহর দরবারে কোন ওজর পেশ করতে না পারে। “হে লোক সকল! একটু থাম। আমার কথা শ্রবণ কর। যেন আমি আমার দায়িত্ব পূর্ণ করতে পারি। তোমরা যদি আমার কথা শ্রবণ কর আর আমার সাথে ন্যায় বিচার কর তাহলে তোমাদের চেয়ে সৌভাগ্যশালী আর কেউ নেই। পক্ষান্তরে তোমরা যদি এর জন্য প্রস্তুত না থাক তাহলে সেটা তোমাদের ইচ্ছা, ঘটনার সব দিক তোমাদের নিকট স্পষ্ট হয়ে যাবে। আর তোমরা যা ইচ্ছা করার অধিকার রাখবে। আমার সাথে কোন কিছু করতে বাদ রাখবে না, আমার সাহায্যকারী আমার আল্লাহ।

হযরত হুসাইন রাযি. এতটুকু বলতে না বলতেই মহিলাদের তাঁবু থেকে কান্নার রোল ভেসে এলো। তিনি বললেন, আব্দুল্লাহ ইবনে আব্বাস ঠিকই বলেছিল। মহিলাদেরকে সাথে না আনাই ভাল ছিল। অতঃপর তিনি আব্বাস ইবনে আলীকে মহিলাদেরকে চুপ করানোর জন্য পাঠালেন। তারা নিশ্চুপ হয়ে গেল তিনি আবার বক্তৃতায় ফিরে এলেন, হে লোকেরা! একটু চিন্তা করে দেখ আমি কে? তারপরে ভেবে দেখ তোমাদের জন্য আমাকে হত্যা করা এবং আমাকে লাঞ্ছিত করা জায়েয আছে কি? আমি কি তোমাদের নবীর দৌহিত্র নই? আমি কি তার চাচাত ভাই আলীর পুত্র নই? সায়্যিদুশ শুহাদা হযরত হামযা রাযি. কি আমার পিতার চাচা ছিলেন না? শহীদ জা’ফর তাইয়ার কি আমার চাচা ছিলেন না? আমাদের দুই ভাই সম্পর্কে তোমরা কি রাসূলে আকরাম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এর প্রসিদ্ধ হাদীস শোননি “হে হাসান, হুসাইন! তোমরা জান্নাতের সরদার আর আহলে সুন্নাতের চোখের শীতলতা।” আমার কথা যদি বিশ্বাস না হয়, অথচ আমি জীবনে কখনো মিথ্যা বলি নাই, তাহলে রাসূলে আকরাম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এর অনেক সাহাবী রাযি. এখনো জীবিত আছেন, তাদের জিজ্ঞাস করে দেখ। এতদসত্বেও কি তোমরা আমার রক্তপাত থেকে বিরত হবে না? নবীর এই হাদীসের ব্যাপারে কি তোমাদের কোন সন্দেহ আছে? অথবা এই ব্যাপারে কি কোন সন্দেহ আছে যে, আমি ফাতেমা যাহরার ছেলে হুসাইন? এতে যদি সন্দিহান হও তাহলে আমি আল্লাহর নামে শপথ করে বলতে পারি যে, তোমরা পূর্ব-পশ্চিমে আমি ব্যতীত আর কাউকে নবী-দৌহিত্র রূপে আর ফাতেমার আদরের দুলাল হিসাবে পাবে না। তোমরা আমাকে কেন হত্যা করতে চাও? আমি তোমাদের কাউকে হত্যা করেছি? তোমাদের কারো ধনসম্পদ ডাকাতি করেছি? তোমাদের কাউকে আহত করেছি?

অতঃপর তিনি কুফায় কয়েকজন নেতার নাম ধরে ডাকলেন এবং বললেন, তোমরা কি পত্র প্রেরণ করে আমাকে আমন্ত্রণ জানাওনি?

তারা বলল- না, আমরা আপনাকে আমন্ত্রণ জানাইনি। হযরত হুসাইন বললেন, তোমরা অবশ্যই আমন্ত্রণ জানিয়েছ। তবে এখন আমার আগমন যদি পছন্দ না হয় তাহলে আমাকে নিজের আশ্রয়ের জায়গায় যেতে দাও।

এক ব্যক্তি বলল, আপনি আমার চাচাত ভাই ইবনে যিয়াদের সিদ্ধান্ত কেন মেনে নিচ্ছেন না? এটাই তো আপনার জন্য ভাল।

হযরত হুসাইন রাযি. বললেন, আল্লাহর শপথ! আমি ছোট লোকদের মত আমার হাত দুশমনের হাতে দিতে পারি না। গোলামের মত তাদের দাসত্ব মেনে নিতে পারি না। আমি সকল অহংকারী থেকে যাদের কিয়ামতের উপর বিশ্বাস নাই- আল্লাহ তা'আলার আশ্রয় কামনা করছি। (আল কামেল ৩/৪১৮-১০)

ইমাম হুসাইনের রাযি. পদতলে হুর ইবনে ইয়াযীদঃ ইমাম হুসাইনের রাযি. এই ভাষন কুফাবাসীর উপর কোন প্রভাব ফেলতে পারল না। তবে হুর ইবনে ইয়াযীদ তামীমী ধীরে ধীরে ঘোড়া নিয়ে অগ্রসর হলেন এবং কাছাকাছি পৌঁছে ঘোড়াকে জোড়ে এক গোড়ালী মেরে আহলে বাইতের বাহিনীতে যোগ দিলেন। তিনি ইমাম হুসাইনকে রাযি. বললেন, হে রাসূলের বংশধর! আমিই ঐ নরাধম যে সর্বপ্রথম আপনাকে বাধা দিয়েছি। কিন্তু আমি জানতাম না যে, আমার সম্প্রদায় বদবখতীর চরম সীমায় পৌঁছে যাবে এবং যুদ্ধ ছাড়া আর কোন যুক্তি সংগত পন্থা অবলম্বন করবে না। এখন আমি আপনার পদতলে হাজির। শরীরে যতক্ষণ প্রাণ থাকবে আপনার সাহচর্য্যের হক আদায় করব। আল্লাহর ওয়াস্তে বলুন, আমার এই ভূমিকা কি পিছনের গোনাহ মাফের জন্য যথেষ্ট হবে?

হযরত হুসাইন রাযি. খুশি হয়ে বললেন অবশ্যই হে হুর। দুনিয়াতেও তুমি হুর (স্বাধীন) আখেরাতেও ইনশাআল্লাহ দোযখের আযাব থেকে মুক্তি পাবে। হুর এবার স্বীয় কওমকে সম্বোধন করে বললেন: হে লোক সকল ইমাম হুসাইনের রাযি. প্রস্তাবিত দফা সমূহের মধ্যে যে কোন একটি দফা নাও এবং তার বিরুদ্ধে তরবারী ধারণের অভিশাপ থেকে বেঁচে যাও।

উমর ইবনে সাআদ বলল, আমি তো সমঝোতাই পছন্দ করি কিন্তু এটি তো আমার আয়ত্বের বাইরে চলে গেছে। অতঃপর কুফাবাসীদের পক্ষ থেকে একটি তীর নিক্ষিপ্ত হল এবং যুদ্ধ শুরু হয়ে গেল। (আল কামেল ৩/৪২১)

হযরত হুসাইনের রাযি. শাহাদাত:

প্রথমে হাতাহাতি লড়াই শুরু হল। উভয় পক্ষ থেকে এক জন করে ময়দানে আসত আর প্রতিপক্ষের সাথে লড়াই করত। কিন্তু এভাবে কুফাবাসীদের প্রচুর ক্ষতি হল। আব্দুল্লাহ ইবনে উমায়ের কালবী, বারীর ইবনে হাসীর, হুর ইবনে ইয়াযীদ এবং নাফে ইবনে হেলাল নিজেদের প্রতিপক্ষকে কচু কাটা করতে লাগল। এই দৃশ্য দেখে শত্রুবাহিনী থেকে উমর ইবনে হাজ্জাজ চিৎকার করে বলল, হে বাহাদুরবৃন্দ তোমরা কি জান কাদের সাথে লড়াই করছ? এরা তো তারা যারা স্বীয় প্রাণ হাতে নিয়ে বের হয়েছে। তাদের সাথে মল্লযুদ্ধ মোটেই সমীচীন নয় সম্মিলিতভাবে আক্রমণ কর। এরা

কজনই বা সংখ্যায়? খোদার কসম তোমরা এদের উপর পাথর নিক্ষেপ করলেও এদের কেউ বাঁচবে না।

এবার ব্যাপকভাবে লড়াই শুরু হল। স্বল্প সংখ্যক আহলে বাইতের জীবন উৎসর্গকারীরা অগণিত কুফাবাসীদের যম হিসাবে আবির্ভূত হল। হুসাইনী বাহিনীর বীরেরা যেদিকে ফিরত শত্রুবাহিনীর ব্যূহ ছিন্ন ভিন্ন করে ফেলত। কিন্তু যুদ্ধ ছিল অসম (একদিকে অগণিত সেনা। অপরদিকে মাত্র ৭২ জন)। দুপুর হতে হতে হযরত হুসাইন রাযি. এর সকল সাথি এক একে শহীদ হয়ে গেলেন।

এবার রয়ে গেলেন আহলে বাইতের যুবকবৃন্দ। আকবার ইবনে হুসাইন, আব্দুল্লাহ ইবনে আকীল, মুহাম্মদ ইবনে আকীল, কাসেম ইবনে হুসাইন ইবনে আলী, আবু বকর ইবনে হুসাইন ইবনে আলী প্রমূখগন স্বীয় স্বীয় তরবারীর ঝলক দেখাতে দেখাতে জান্নাতী যুবকদের সরদারের জন্য জান কুরবান করে দিলেন। পরিশেষে হযরত ইমাম হুসাইন রাযি. এর সাথে তার চার ভাই আব্বাস, আব্দুল্লাহ, জাফর এবং উসমান ছাড়া আর কেউ অবশিষ্ট রইল না। যতক্ষণ পর্যন্ত বুকে দম থাকল তারা প্রতিটি আঘাত বুক পেতে গ্রহণ করতে লাগলেন। অবশেষে এক এক করে তারাও জান্নাতের পথে পাড়ি জমালেন । ইমাম হুসাইন রাযি. এখন নিঃসঙ্গ একা। আঘাতে আঘাতে জর্জরিত। পিপাসায় কাতর। কিন্তু তার বীরত্ব উৎসাহ আর উদ্দীপনায় কোন ভাটা পড়ল না। যেদিকেই তার তরবারী উঠত শত্রুর অগণিত লাশ মাটিতে লুটিয়ে পড়ত। অবশেষে ক্লান্ত শ্রান্ত হয়ে মাটিতে বসে পড়লেন। দীর্ঘক্ষণ পর্যন্ত এভাবে নিশ্চুপ বসে থাকলেন কিন্তু দুশমন তার উপর হামলা করতে সাহস পেল না। তার রক্তে নিজের ভাগ্যকে কলঙ্কিত করা থেকে সকলে বাঁচতে চাচ্ছিল। পরিশেষে শিমার চিৎকার করে বলল এখন কিসের অপেক্ষা? তাকে হত্যা করছ না কেন?

হযরত হুসাইন রাযি. তৃষ্ণার্ত ওষ্ঠে কেবল মাত্র পানির পাত্র লাগিয়ে ছিলেন এমন সময় হুসাইন ইবনে তামীম নিশানা করে একটি তীর নিক্ষেপ করল যা তার কণ্ঠনালীতে এসে বিদ্ধ হল। তিনি টলতে টলতে ফুরাতের দিকে চললেন কিন্তু শত্রুবাহিনী চারিদিক থেকে ঝাঁপিয়ে পড়ল। অরা বিন শুরাইক তামিমী তার উপর তরবারীর আঘাত করল সিনান ইবনে আনাস নাখঈ বর্শার আঘাতে তাকে যমিনে শায়িত করে ফেলল এবং তরবারী দিয়ে মস্তক মুবারক দ্বিখণ্ডিত করে দিল। (ইন্না-- ---রাজেউন) (আখবারুত তিওয়াল ২৫৫, আল কামেল ৩/৪৩০)

তার পবিত্র শরীরে বর্শার ৩৩টি আঘাত আর তরবারীর ৩৩টি আঘাত ছিল। এছাড়া অগণিত তীরের আঘাত তো ছিলই। (আল কামেল ৩/৪৩২)

তার শাহাদাতের পরে পাপিষ্ঠরা আহলে বাইতের মহিলাদের তাঁবুর দিকে ধাবিত হল। মাল-সামানা যা কিছু ছিল সব লুট পাট করে নিলো। এমন কি মহিলাদের গায়ের চাদর পর্যন্ত খুলে নিলো। তার দুই পুত্র যাইনুল আবেদীন এবং আলী আসগর

অসুস্থতার কারণে তাবুতে শায়িত ছিল। শিমার তাদেরকেও শহীদ করতে চাইল, কিন্তু উমর ইবনে সাআদ বলল, মহিলাদের তাবুতে প্রবেশ করনা। আর বাচ্চাদের গায়ে হাত উঠিওনা।

মহিমান্বিত শাহাদাতের এই মর্মান্তিক হৃদয়স্পর্শি ঘটনা ৬১ হিজরী সনের ১০ ই মুহাররম রোজ শুক্রবার সংঘটিত হল। পরের দিন গাযেরিয়ার অধিবাসীরা জানাযার নামায আদায় করে শহীদদেরকে কারবালার ময়দানেই দাফন করল। হযরত হুসাইন রাযি. সহ অন্যান্য শহীদদের মাথা যেহেতু দুশমনরা কেটে নিয়ে গিয়েছিল তাই মাথা বিহীন শরীর দাফন করা হল। আল্লাহ তা'আলা তাদের সকলের উপর রহম করুন এবং তাদের সকলকে জান্নাতুল ফিরদাউস নসীব করেন।

হযরত ইবনে আব্বাসের রাযি. স্বপ্নঃ

এ ঘটনা প্রসঙ্গে হযরত আব্দুল্লাহ ইবনে আব্বাস বলেন- আমি এক রাতে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম কে স্বপ্নে দেখতে পাই । ঠিক দ্বিপ্রহরের সময়। অত্যাধিক চিন্তান্বিত ও বিষণ্ণ মনে হল তাঁকে। কাদাযুক্ত অবস্থায় উদ্ভ্রান্তের ন্যায় ছুটে আসছেন। তাঁর হাতে রক্তে পরিপূর্ণ একটি বোতল দেখা যাচ্ছিল। ইবনে আব্বাস বলেন- আমি রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম কে প্রশ্ন করলাম হে আল্লাহর রাসূল এই সময়ে এই করুণ অবস্থায় আপনি কোথা থেকে আসছেন? উত্তরে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বললেন হে ইবনে আব্বাস। আমি কি করে মদীনায় শুয়ে থাকতে পারি? আজ আমার কলিজার টুকরা হুসাইনকে কারবালার ময়দানে যালিম ইয়াযীদ বাহিনী টুকরো টুকরো করে ঘোড়র পায়ের নীচে মাটির সাথে মিশিয়ে দিয়েছে। আমি আমার কলিজার টুকরার শাহাদাতের মর্মান্তিক ও করুণ দৃশ্য দর্শনের জন্য সেখানে গিয়েছিলাম।

ইবনে আব্বাস বলেন, আমি পুনরায় প্রশ্ন করলাম-হে আল্লাহ'র রাসূল। সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম আপনার হাতে কি?

তিনি বললেন- ইহা একটি বোতল! কারবালার ময়দান থেকে কিছু রক্ত জমিয়ে এ বোতলে করে নিয়ে এসেছি। কিয়ামতের ময়দানে এ রক্ত পেশ করে আমি এ ঘটনার সাথে জড়িত ব্যক্তিদের বিরুদ্ধে আল্লাহ'র দরবারে ফরিয়াদ জানাব।

এ স্বপ্ন দেখার পর হযরত ইবনে আব্বাস রাযি. সকলকে হযরত হুসাইনের রাযি. শাহাদাতের কথা জানিয়ে দিয়েছিলেন। এর কিছু দিন পর বাস্তবেই হযরত হুসাইনের রাযি. শাহাদাতের সংবাদ মদীনায় পৌঁছল। পরে হিসাব করে দেখা গেল তিনি যেদিন স্বপ্নে দেখেছিলেন ঠিক সে দিনই হযরত হুসাইন রাযি. শাহাদাত বরণ করেছিলেন। (শহীদে কারবালা (উর্দূ) পৃঃ ৯৭, আল-কামেল, লি-ইবনে-আছীর ৩য় খণ্ড)

আহলে বাইতের কাফেলা সিরিয়ায়:

এই হৃদয় বিদারক ঘটনার পর আহলে বাইতের সদস্যদেরকে কুফায় ইবনে যিয়াদের নিকট পাঠানো হল। আর শহীদদের মাথা তার দরবারে পেশ করা হল। ইবনে যিয়াদ হযরত হুসাইনের রাযি. দাঁত মুবারক একটি লাঠি দ্বারা খোঁচা দিল। সেখানে উপস্থিত ছিলেন রাসূলে আকরাম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এর সাহাবী হযরত যায়েদ ইবনে আকরাম রাযি.।

তিনি এই বেআদবী সহ্য করতে পারলেন না। বললেন: আল্লাহর শপথ! আমি নিজের চোখে রাসূলে আকরাম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম কে এই ঠোটে চুম্বন করতে দেখেছি। এর সাথে বেআদবী কর না। একথা বলে তিনি ক্রন্দন করতে লাগলেন। ইবনে যিয়াদ বলল, বৃদ্ধ হওয়ার কারণে তোমার বোধশক্তি যদি লোপ না পেত তাহলে আমি তোমার গর্দান উড়িয়ে দিতাম। হযরত যায়েদ বদ দুআ করতে করতে মজলিস থেকে চলে গেলেন।

ইবনে যিয়াদ আহলে বাইতের এই কাফেলা এবং শহীদের মাথা শিমারের তত্বাবধানে দামেশকে ইয়াযীদের নিকট পাঠিয়ে দিল।

ইয়াযীদের দরবারে যখন হযরত হুসাইন রাযি. এর মাথা মুবারক রাখা হল আর পুরস্কারের লোভে শিমার নিজের এবং সাথিদের বীরত্বের কথা উচ্চকণ্ঠে বলতে লাগল তখন ইয়াযীদ অশ্রুভরা কণ্ঠে বলল: আফসোস তোমাদের উপর। তোমার যদি হুসাইনকে হত্যা না করতে তাহলে আমি তোমাদের প্রতি অধিক খুশি হতাম। আল্লাহর লানত হোক ইবনে মারজানার (ইবনে যিয়াদের) উপর। তার স্থলে যদি আমি হতাম তাহলে আল্লাহর কসম আমি হুসাইনকে মাফ করে দিতাম। আল্লাহ তুমি তাদের উপর রহমত নাযিল কর।

ইয়াযীদের স্ত্রী হিন্দ বিনতে আব্দুল্লাহ বিন আমের মুখে চাদর পেঁচিয়ে দরবারে এসে বলল আমীরুল মুমিনীন। এটি কি রাসূলের কলিজার টুকরা হুসাইন ইবনে ফাতেমার মাথা।

ইয়াযীদ জবাব দিল, হ্যাঁ। এটা হুসাইন রাসূল দৌহিত্রের মাথা। তুমি এর জন্য মাতম কর। আল্লাহ ইবনে যিয়াদকে ধ্বংস করুন। সে তাকে হত্যা করার ব্যাপারে তাড়াহুড়া করে ফেলেছে। তবে ইয়াযীদ তাকে শাস্তি দিল না বা কুফার শাসন ক্ষমতা থেকে বরখাস্ত করল না এটা তার চরম অযোগ্যতা প্রমাণ করে।

অতঃপর ইয়াযীদ দরবারী লোকদেরকে সম্বোধন করে বলল, তোমরা কি জান, এই ঘটনা কেন ঘটল? হুসাইন রাযি. বলেছিল আমার পিতা হযরত আলী রাযি. ইয়াযীদের পিতার চেয়ে উত্তম। আমার মাতা সায়্যিদা ফাতেমা যাহরা রাযি. ইয়াযীদের মাতার চেয়ে উত্তম। আমার নানা রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ইয়াযীদের নানার চেয়ে উত্তম। আর আমি নিজেও তার চেয়ে উত্তম, তাই খেলাফতের হক ও আমারই বেশি।

পিতার ব্যাপারে কথা হল আমার পিতা আর তার পিতা আল্লাহর সামনে নিজেদের মুআমালা পেশ করেছিলেন দুনিয়া স্বাক্ষী যে আল্লাহতালা আমার পিতার পক্ষে ফয়সালা করেছেন। উল্লেখ্য ইয়াযীদের এ বক্তব্য ভুল ছিল কারণ রাজত্ব পাওয়া আর উত্তম হওয়া কখনো এক জিনিষ নয়। তবে তার মা রাসূল তনয়া ফাতেমা রাযি. আমার মার চেয়ে উত্তম আর তার নানা রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম আমার নানার চেয়ে উত্তম। যে ব্যক্তি আল্লাহও কিয়ামতের দিবসের উপর বিশ্বাস রাখে সে কখনো কোন ব্যক্তিকে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এর সমকক্ষ বলতে পারে না। তবে হুসাইন বিষয়টি উপলব্ধি করতে পারেন নি এবং কুরআনের এই আয়াতের প্রতি দৃষ্টি নিবন্ধ হয়নি যেখানে আল্লাহ তা'আলা ইরশাদ করছেন, বলুন হে আল্লাহ তুমিই সারা জগতের বাদশাহ, যাকে ইচ্ছা তুমি বাদশাহী দান কর আর যার থেকে ইচ্ছা ছিনিয়ে নাও। (আল কামেল ৩/৪৩৮)

আল্লাহই ভাল জানেন ইয়াযীদের এসব কথা তার অন্তরের প্রতিধ্বনি ছিল নাকি শুধু মাত্র চাপাবাজি ছিল। আর তার এই অশ্রু দুঃখ ভারাক্রান্ত হৃদয়ের অশ্রু ছিল নাকি রাজনৈতিক কুটচাল ছিল। কেননা ইতিহাসে এ ধরনের অশ্রুর দৃষ্টান্ত অনেক দেখতে পাওয়া যায়। ইউসুফ আ. এর ভায়েরাও তাকে কুপে নিক্ষেপ করে ক্রন্দনরত অবস্থায় ঘরে ফিরে এসে পিতা হযরত ইয়াকুব আ. নিকট অনেক দুঃখ প্রকাশ করেছিল। পরবর্তী ঘটনাসমূহ প্রমাণ করে এ সবই তার রাজনৈতিক চাল ছিল। অন্তরের প্রতিধ্বনি ছিল না। বস্তুত ইয়াযীদ শাসন ক্ষমতা লাভ করার পরে অনেক গুলি মারাত্মক ধরনের অপরাধে লিপ্ত হয়েছিল ইসলাম ইতিহাসে যার দীর্ঘ তালিকা রয়েছে। যেহেতু নিছক দোষচর্চা আমাদের উদ্দেশ্য নয় তাই তার দুষ্কর্মের ফিরিস্তি পেশ করা থেকে আমরা বিরত থাকলাম। ঘটনা বুঝানোর স্বার্থে দু একটি বিষয় বলতে বাধ্য হচ্ছি। তাঁর অন্যায়ের মধ্যে ইমাম হুসাইনের নিরাপত্তার ব্যবস্থা না করাও একটি মারাত্মক অপরাধ, তেমনিভাবে ইবনে হুসাইনের নিরাপত্তার ব্যবস্থা না করাও একটি মারাত্মক অপরাধ তেমনিভাবে ইবনে যিয়াদকে শাস্তির সম্মুখীন না করাও তার পদস্খলন। আর প্রকৃত কথা হল ইবনে যিয়াদ যা করেছিল তারই নির্দেশে বা ইশারায় করেছিল। ইয়াযীদের দুষ্কর্মের সামান্য আলোচনা শুনুন।

নিঃসন্দেহে ইয়াযীদ মুসলিম ইবনে উকবাকে তিন দিন পর্যন্ত মদীনাতে হত্যা যজ্ঞ চালানোর নির্দেশ দিয়ে সাংঘাতিক রকমের ভুল করেছিল। এই (অন্যায় মূলক) ভ্রান্তি তো ছিলই এর সাথে সাহাবায়ে কিরামের বিরাট একটি অংশ এবং তাদের সন্তানদের হত্যা করার অপরাধও যোগ হয়েছিল এর সাথে। পূর্বেই আলোচিত হয়েছে যে, উবায়দুল্লাহ ইবনে যিয়াদের মাধ্যমে সে হযরত হোসাইন রাযি. কে হত্যা করিয়েছিল। তা ছাড়া সেই তিন দিনে মদীনায় সে এমন সীমাহীন অরাজকতা সৃষ্টি করেছিল যার যথার্থ বর্ণনা ও বিবরণ তুলে ধরা আদৌ সম্ভব নয়। একমাত্র আল্লাহই তা ভাল জানেন। মুসলিম ইবনে উকবাকে মদীনায় প্রেরণের পেছনে ইয়াযীদের উদ্দেশ্যে ছিল ক্ষমতা সংহতকরণ ও তার স্থায়িত্ব নিশ্চিত করা। যাতে কোন প্রতিপক্ষের অস্তিত্ব

অবশিষ্ট না থাকে। কিন্তু এজন্য আল্লাহ তাকে শাস্তি দিলেন এবং তার অভিপ্রায় ব্যর্থ করে দিলেন। তাকে তিনি এমনভাবে পাকড়াও করলেন যে ভাবে ক্ষমতাদর্পীদের পাকড়াও করে থাকেন এবং তাকে মৃত্যু মুখে পতিত করলেন। আর অত্যাচারী জনপদের ব্যাপারে তোমার প্রতিপালকের পাকড়াও এমন কঠিনই হয়ে থাকে। তার ধরা বড়ই কঠিন, মর্মন্তুদ। (আল-বিদায়া)

আহলে বাইতের সদস্য বর্গের স্বদেশ প্রত্যাবর্তনঃ

ইয়াযীদ আহলে বাইতের মহিলাদেরকে নিজ অন্দর মহলে থাকতে দিল। উভয় বংশের মধ্যে যেহেতু আত্মীয়তার সম্পর্ক ছিল তাই ইয়াযীদ বংশীয় সমস্ত মহিলাগণ তাদের নিকট এসে সমবেদনা জ্ঞাপন করতে লাগল এবং তাদের দুঃখে শরীক হতে লাগল। ইয়াযীদ উভয় বেলা আহারের সময় ইমাম যাইনুল আবেদীন আলী ইবনে হুসাইনকে শাহী দস্তর খানায় নিজের সাথে বসাত। কয়েকদিন যত্নখাতিরের সাথে মেহমানদারী করানোর পরে ইয়াযীদ আহলে বাইতের কাফেলাকে কিছু মাল সামান দিয়ে একজন বিশ্বস্ত সৎচরিত্র ব্যক্তির তত্বাবধানে মদীনা মুনাওয়ারায় পাঠিয়ে দিল। বিদায়ের প্রাক্কালে ইয়াযীদ যাইনুল আবেদীন আলী ইবনে হুসাইনকে বলল আল্লাহ তা'আলার যা ফয়সালা ছিল তাই হয়েছে এবং এটা আমার মর্জির খেলাফ হয়েছে যদি অভিশপ্ত ইবনে যিয়াদের স্থলে আমি হতাম তাহলে কখনই এই পরিস্থিতির উদ্ভব হত না। ইমাম হুসাইন রাযি. আমার সামনে যে প্রস্তাব দিত আমি তাই কবুল করে নিতাম এবং তার প্রাণ এভাবে সংহার হতে দিতাম না। বৎস তোমার কোন কিছুর প্রয়োজন হলে আমাকে লিখে জানাবে। (ইবনে আসীর ৪-৩৬)

হযরত হুসাইন রাযি. এর কন্যা হযরত সাকীনা এই আলোচনায় বড়ই প্রভাবিত হয়েছিলেন তাই তিনি বলতেন খোদাদ্রোহীদের মধ্যে আমি ইয়াযীদ ইবনে মুআবিয়ার চাইতে উত্তম কাউকে দেখিনি। ইয়াযীদের এ সব কথার বাস্তবতা সম্পর্কে ইতিপূর্বে আলোচনা করা হয়েছে যে এ সবই তার মুখের কথা।

ইমাম হুসাইন রাযি. এর শাহাদাতে জড়িতদের পরিণাম

ফোরাতে পানি পান করতে গিয়ে তীরের আঘাতে ক্ষত-বিক্ষত হযরত হুসাইন রাযি. আল্লাহ'র দরবারে এই বলে মুনাজাত করেছিলেন হে প্রতিপালক তোমার রাসূলের আদরের দৌহিত্রের সাথে আজ যারা এই অমানবিক আচরণ করেছে তাদের বিরুদ্ধে আমি শুধু তোমার দরবারেই নালিশ পেশ করছি। এদের একজন একজন করে তুমি ধ্বংস করে দিও। কাউকে তুমি রেহাই দিও না।

মাযলুমের আহাজারি কবুল হতে বিলম্ব হয় না। তদুপরী রাসূলের দৌহিত্রের পবিত্র কণ্ঠ দিয়ে যে দুআ বেরিয়েছে তা কবুল না হওয়ার প্রশ্নই উঠতে পারে না। ফলশ্রুতিতে দেখা গেছে দুনিয়ার বুকেই তারা ভোগ করেছে কঠিন শাস্তি। আখিরাতের নির্ধারিত শাস্তির পূর্বেই তাদের মুখোমুখি হতে হয়েছে ভীষণ কষ্টদায়ক আযাবের। এই পৈশাচিক হত্যাকাণ্ডে জড়িত কেউ রেহাই পায়নি। কাউকে হত্যা করা হয়েছে বড়

নির্মমভাবে। কারো চেহারা হয়ে গেছে বিশ্রী কালো। লালবর্ণের জায়গা দখল করেছে কদার্যতা। কেউ বা আগুনে পুড়ে তীলে তীলে জ্বলে মরেছে। আবার পানির তৃষ্ণায় ছটফট কতে করতে কারো প্রাণ পাখি উড়াল দিয়েছে। কারো আবার দৃষ্টি শক্তি ছিনিয়ে নেয়া হয়েছে। বেঁচে থেকেও দুনিয়ার সৌন্দর্য অবলোকন তাদের ভাগ্যে জুটেনি। মানবতের জীবন যাপনে বাধ্য হয়েছে সকলেই।

মোটকথা হযরত হুসাইন রাযি. এর হত্যাকাণ্ডে জড়িত একজন সদস্যও এই দুনিয়াতেই আল্লাহর কঠিন পাকড়াও থেকে নিস্তার পায়নি। এ ঘটনার পর ইয়াযীদ একদিনের জন্যও শান্তিতে তার রাজকার্য পরিচালনা করতে পারেনি। ইসলামী রাষ্ট্রের সর্বত্র শহীদদের খুনের প্রতিশোধের আগুন দাউ দাউ করে জ্বলে উঠল এবং বিদ্রোহের পর বিদ্রোহ আরম্ভ হল। হযরত হুসাইন রাযি. এর শাহাদাতের পর এ কঠিন বিদ্রোহের ভিতর সে মাত্র দুই বৎসর আট মাস মতান্তরে তিন বৎসর আট মাস শাসনকার্য পরিচালনা করার সুযোগ পেয়েছিল এবং নিতান্তই লাঞ্ছিত অবস্থায় তাকে এই দিনগুলো অতিবাহিত করতে হয়েছিল। আর এই লাঞ্ছিত অবস্থাতেই আল্লাহ তা'আলা তাকে ধ্বংস করেছিলেন।

(১) ইমাম যুহরী (রহ) বলেন, যে সমস্ত লোক হযরত হুসাইন রাযি. হত্যায় অংশগ্রহণ করেছিল তাদের মধ্যে একজনও এমন ছিল না যে দুনিয়াতে তার শাস্তি না হয়েছে। কাউকে হত্যা করা হয় আবার কারো কারো চেহারা কুৎসিত হয়ে কালো হয়ে যায় অথবা কিছুদের মধ্যে তার রাজত্ব কেড়ে নেয়া হয়। আর এটা সুস্পষ্ট হয়ে যায় যে এগুলো তাদের কৃতকর্মের আসল শাস্তি নয় বরঞ্চ তার একটা নমুনা ছিল মাত্র। যা মানুষকে শিক্ষা গ্রহণের উদ্দেশ্যে দুনিয়াতেই দেখানো হয়েছিল।

(২) সাবেত ইবনে যাওযী রহ. বর্ণনা করেছেন যে একজন বৃদ্ধ লোক হযরত হুসাইন রাযি. এর হত্যায় অংশগ্রহণ করেছিল। সে হঠাৎ অন্ধ হয়ে যায় তখন লোকেরা কারণ জিজ্ঞেস করলে সে বলে যে আমি স্বপ্নে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম কে দেখলাম যে তিনি তাঁর জামার হাত গুটিয়ে আছেন। তার হাতে তলোয়ার রয়েছে এবং সামনে রয়েছে চামড়ার সে বিছানা যার উপর রেখে কোন মানুষকে হত্যা করা হয়। তার উপর হুসাইনের রাযি. হত্যাকারীদের দশজনের লাশ জবেহ করা অবস্থায় পড়ে আছে। এরপর তিনি আমাকে ডাকলেন। এবং হুসাইনের রক্তে রঞ্জিত একটি লাঠি আমার চোখে লাগিয়ে দেন। সকালে যখন আমি ঘুম থেকে জেগে উঠি তখন আমি অন্ধ ছিলাম।

(৩) ইবনে জাওযী আরও বর্ণনা করেন যে, যে ব্যক্তি হযরত হুসাইন রাযি. এর মাথা মোবারক তাঁর ঘোড়ার গলায় লটকিয়েছিল পরে তাকে এ অবস্থায় দেখা গিয়েছিল যে তার চেহারা আলকাতরার মত বিবর্ণ হয়ে গেছে। তাই লোকেরা তাকে জিজ্ঞেস করে যে তুমি তো সমগ্র আরবের মধ্যে সর্বাপেক্ষা সুশ্রী ছিলে। এখন তোমার চেহারা এমন হল কেন? সে বলল যেদিন আমি ইমাম হুসাইন এর মস্তক ঘোড়ার গলায়

ঝুলিয়েছিলাম সে দিন থেকে যখনই আমি একটু ঘুমিয়ে পড়ি তখন দুইজন লোক এসে আমার বাহু ধরে জ্বলন্ত অগ্নিকুণ্ডতে নিয়ে যায় এবং তাতে আমাকে নিক্ষেপ করে যা আমাকে ঝলসে দেয়। এভাবে কিছুদিন চলার পর সে মৃত্যু বরণ করে।

(৪) ইবনে জাওযী রহ. আরও বর্ণনা করেন যে, তিনি এক ব্যক্তিকে নিমন্ত্রণ করেছিলেন। উপস্থিত মজলিসে কথা প্রসঙ্গে আলোচনা হয় যে হযরত হুসাইন রাযি. এর হত্যায় যারাই শরীক ছিল সবাইকে দুনিয়াতেই কঠিন শাস্তি ভোগ করতে হয়েছে। সে লোকটি বলল এটা সম্পূর্ণ ভুল কথা। আমি এ হত্যাকাণ্ডে শরীক ছিলাম অথচ আমার কিছুই হয়নি। সে ব্যক্তি মজলিস শেষে আগুনে পুড়ে যায় এবং পুড়ে ছাই হয়ে যায়। সুদ্দি রহ. বলেন যে আমি নিজেই প্রত্যুষে যখন তাকে দেখি তখন সে কয়লায় পরিণত হয়েছিল।

(৫) যে ব্যক্তি হযরত হুসাইন রাযি. কে তীর মেরেছিল এবং পানি পান করার সুযোগ দেয়নি আল্লাহ তালার তার উপর পিপাসার এমন শাস্তি প্রদান করেন যে কোনভাবেই তার পিপাসা দূর হচ্ছিল না। যত পানি সে পান করছিল না কেন তবুও পিপাসায় সে ছটফট করছিল। এভাবে চলতে থাকে এবং একসময় তার পেট ফেটে যায় এবং মৃত্যুবরণ করে।

হযরত হুসাইন রাযি. এর হত্যাকারীদের উপর এমনিতেই বিভিন্ন রকমের যমীনী ও আসমানী বালা-মুসিবতের এক সিলসিলা চলছিল। এছাড়াও শাহাদাতের ঘটনার মাত্র পাঁচ বছর পর হিজরী ৬৬ সালে মুখতার সাকাফী যখন হযরত হুসাইন রাযি. এর হত্যাকারীদের কিসাস গ্রহণের ইচ্ছা প্রকাশ করলেন তখন সর্বসাধারণ তাঁকে সমর্থন প্রদান করে এবং কিছুদিনের মধ্যেই তিনি বিপুল শক্তি অর্জন করে কুফা এবং ইরাকের উপর তার আধিপত্য বিস্তার করেন। দেশের ক্ষমতা লাভের পর তিনি সাধারণ ঘোষণা প্রদান করেন যে হযরত হুসাইন রাযি. এর হত্যাকারীদের ছাড়া বাকী সবাইকে নিরাপত্তার নিশ্চয়তা দেয়া হল। অন্যদিকে তিনি হুসাইন রাযি. এর হত্যাকারীদের খুঁজে বের করতে পূর্ণ শক্তি নিয়োগ করেন এবং এক একজনকে গ্রেফতার করে হত্যা করেন। একদিনেই ১৪৮ জনকে এ অপরাধে হত্যা করা হয়। অপর বিশেষ বিশেষ ব্যক্তিদের অনুসন্ধান ও গ্রেফতারের কাজ শুরু করা হয়।

আমর ইবনে হাজ্জাজ যুবাই-দী গরম ও পিপাসা নিয়েই পালিয়েছিল। পিপাসায় বেহুশ হয়ে পড়ে যায় এরপর তাকে যবেহ করে দেয়া হয়। সীমার সর্বাপেক্ষা বেশী কঠোর ছিল তাকে হত্যা করে কুকুরের সামনে নিক্ষেপ করা হয়।

আবদুল্লাহ ইবনে উসাইদ জোহানী, মালেক ইবনে বশির বদী এবং হামল ইবনে মালিককে অবরোধ করা হয়। তারা ক্ষমা প্রদর্শনের আবেদন করে উত্তরে মুখতার বলেন যালেমের দল তোমরা রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এর নাতীর প্রতি দয়া প্রদর্শন করনি তোমাদের প্রতি কিভাবে দয়া প্রদর্শন করা যেতে পারে?

এরপর সকলকেই হত্যা করা হয়। মালেক ইবনে বশীর হযরত হুসাইন রাযি. এর টুপি খুলে নিয়েছিল। তার উভয় হাত পা কেটে শরীর থেকে বিচ্ছিন্ন করে তাকে মুক্ত ময়দানে রেখে দেয়া হয়। সে ছটফট করতে করতে মৃত্যুবরণ করে।

উসমান ইবনে খালেদ এবং বশীর ইবনে সমীত, মুসলিম ইবনে আকীলের হত্যায় সহযোগিতা করেছিল তাই তাদেরকে হত্যা করে জ্বালিয়ে দেয়া হয়। আমর ইবনে সাদ নামক যে ব্যক্তিটি হযরত হুসাইন রাযি. এর মোকাবেলায় সৈন্যদের পরিচালনা করেছিল তাকে হত্যা করে তার মাথা মুখতারের সামনে উপস্থিত করা হয়। এদিকে মুখতার পূর্বেই তার ছেলে হাফসকে তার দরবারে বসিয়ে রেখেছিলেন। যখন আমর ইবনে সাদের মাথা দরবারে উপস্থিত করা হয় তখন মুখতার হাফসের উদ্দেশ্যে বলেন যে, তুমি কি জান যে এটা কার মাথা? সে বলল, হ্যাঁ জানি। সে বলল যে, এরপর আমারও আর বেঁচে থাকার কোন সাধ নেই। তখন তাকেও হত্যা করা হয়। এরপর মুখতার বলেন আমর ইবনে সাদকে তো হত্যা করা হল হুসাইন রাযি. এর বিনিময়ে। আর সত্যিকারভাবে বলতে গেলে এরপরও বরাবর হয়নি। যদি আমি কুরাইশদের তিন চতুর্থাংশকে শুধু হুসাইনের বিনিময়ে হত্যা করে দেই তবুও হযরত হুসাইনের একটি আঙ্গুলের বরাবর হতে পারে না। হাকিম ইবনে তোফায়েল নামক যে ব্যক্তিটি হুসাইন রাযি. কে তীর নিক্ষেপ করেছিল, তার শরীরকে তীরের আঘাতে চালুনি করে দেয়া হয় এবং এতেই সে শেষ হয়ে যায়।

যায়েদ ইবনে রেফাদ হুসাইনের ভাতিজা মুসলিম ইবনে আকীলের পুত্র আবদুল্লাহকে তীর নিক্ষেপ করেছিল তখন তিনি হাত দিয়ে কপাল আড়াল করেন। কিন্তু তীর কপালে বিদ্ধ হয় এবং হাতও কপালের সাথে বিধে যায়। এ ব্যক্তিটিকে বন্দী করে প্রথমে তার উপর তীর ও পাথর বর্ষণ করা হয় পরে জীবন্ত জ্বালিয়ে দেয়া হয়।

সিনান ইবনে আনাস নামক যে ব্যক্তি মাথা মোবারক ছিন্ন করতে অগ্রসর হয়েছিল সে নিজেই কুফা থেকে পালিয়ে যায় তাই তার ঘর ধুলিস্যাৎ করে দেয়া হয়।

অতঃপর আল্লাহ তা'আলার সেই অত্যাচারী ও সীমালংঘনকারী উবায়দুল্লাহ ইবনে যিয়াদকে বদলা দিলেন যে ছিষট্টি হিজরীর যিলহজ্জ মাসের আট তারিখ শনিবার দিন ইব্রাহীম ইবনে আশতারের হাতে তার হত্যাকাণ্ড সংঘটিত হয়। জাযর নামক স্থানে তার হত্যাকাণ্ডে সংঘটিত হয়। এখান থেকে ওয়াসিল নামক স্থানের দূরত্ব পাঁচ মাইল। (এর বিবরণ এই যে) মুখতার ইবনে আবু উবায়দা ইবনে যিয়াদের সহিত যুদ্ধ করার জন্য বাহিনী প্রেরণ করেন। ইবনে যিয়াদ নিহত হওয়ার পর তার মাথা এবং অন্যান্যদের মাথা মুখতারের নিকট নিয়ে আসা হয়। তখন একটি সাপের আবির্ভাব ঘটলো। এবং সেটা ঘুরতে আরম্ভ করলো। শেষ পর্যন্ত ইবনে মারজানা (ইবনে যিয়াদ) এর মুখে প্রবেশ করলো এবং তার নাসারন্ধ্র দিয়ে বের হলো। অতঃপর তা পুনরায় নাক দিয়ে প্রবেশ করলো এবং তার মুখ দিয়ে বের হয়ে এলো অতঃপর তা পুনরায় নাক দিয়ে প্রবেশ করলো এবং তার মুখ দিয়ে বের হয়ে এলো এবং এরূপ হতে থাকলো। অর্থাৎ

তা কেবল ইবনে যিয়াদের মাথায় প্রবেশ করতে থাকলো আর বের হতে লাগলো। অতঃপর মুখতার ইবনে যিয়াদের ও তার সঙ্গীদের মাথা মুহাম্মদ ইবনে হানাফিয়া মতান্তরে আবদুল্লাহ ইবনে যুবাইরের নিকট প্রেরণ করল । তারপরে এগুলো মক্কায় ঝুলিয়ে দেয়া হয়। ইবনে আশতারী ইবনে যিয়াদ ও অন্যান্যদের লাশগুলো জালিয়ে দেন। (আইনী)।

এই ঘটনাটি হাফিজ ইবনে কাছীরও তিরমিযীর বরাতে উল্লেখ করেছেন। তাতে ইবনে যিয়াদ ও তার সাথীদের মাথা মসজিদে রাখা বারবার সাপের আগমন ঘটা অদৃশ্য থেকে তা বেরিয়ে আসা দেখে লোকদের চিল্লায়ে উঠা সমস্ত মাথার মধ্যে শুধু ইবনে যিয়াদের নাকে মুখে তার বারবার প্রবেশ করা ও বেরিয়ে আসার কথা সবিস্তারে উল্লেখিত হয়েছে। ঘটনাটি আল-বিদায়া ওয়া আন-নিহায়া নামক গ্রন্থের অষ্টম খণ্ডের একশ একানব্বই পৃষ্ঠায় বিধৃত হয়েছে। আল্লামা তিরমিযী এটিকে সঠিক বলে অভিমত ব্যক্ত করেছেন। বস্তুতঃ এ ঘটনাটি কুপ খননকারীর কুপে পতিত হওয়ার একটি উজ্জ্বল দৃষ্টান্ত। অর্থাৎ সে তার লাঠি দ্বারা হযরত হুসাইন রাযি. এর সাথে বেআদবী করেছিল। আল্লাহ তা'আলা একটি ক্ষুদ্র প্রাণীর সাহায্যে তাকে লাঞ্ছিত করলেন। হাদীসের ভাষ্যমতে কবরে শাস্তি ভোগকারীদের উপরই এরূপ আযাব নিপতিত হয়ে থাকে। মানুষ কর্তৃক লাঞ্ছিত হওয়ার চেয়ে আল্লাহ কর্তৃক অপদস্থ হওয়া কত কঠিন। আল্লাহ আমাদের রক্ষা করুন।

মোটকথা হযরত হুসাইন রাযি. এর মাথা মুবারক একটি পাত্রে করে ইবনে যিয়াদের নিকট নিয়ে আসা উক্ত মাথা মুবারকের সহিত ইবনে যিয়াদের বেআদবী করা এবং এতদপ্রেক্ষিতে তার জঘন্য মানসিকতার পরিচয় দান সংক্রান্ত বিবরণ আল্লামা বুখারী, বাযযায, তাবারানী, ইবনে হাজার আসকালানী ও বদর উদ্দীন আইনীর মত বড় বড় মুহাদ্দিসগণ অত্যন্ত সুস্পষ্টভাবে তুলে ধরেছেন। তারা ঘটনাটি হযরত আনাস ইবনে মালিক ও যায়েদ ইবনে আরকাম রাযি. এর মত সম্মানিত সাহাবী রাযি. থেকে বর্ণনা করেছেন।

হযরত হুসাইন রাযি. এর হত্যাকারীদের এ দৃষ্টান্তমূলক পরিণতি জানার পর আপনা আপনিই কুরআনের এ আয়াতটি মনে পড়ে যায়ঃ

"আযাব এরূপই হয়ে থাকে। আর আখিরাতের আযাব এর চেয়েও অনেক ভয়ঙ্কর । হায় যদি তারা বুঝত।"

একটি গুরুত্বপূর্ণ প্রশ্ন ও তার উত্তরঃ

প্রশ্ন হতে পারে যেখানে স্বয়ং নবী দৌহিত্র জালিমের বিরুদ্ধে আওয়াজ তুললেন - সাহাবায়ে কিরামের বিরাট এক কাফেলা হায়াতে থাকা সত্ত্বেও কেন তাঁর সহযোগী হননি যার ফলে প্রায় নিঃসঙ্গ অবস্থায় ইমাম হুসাইন রাযি. কে সপরিবারে শাহাদাত বরণ করতে হল?

জবাবঃ ইমাম হুসাইন রাযি. ইয়াযীদের মোকাবেলায় কুফাবাসীর বাই'আত গ্রহণের ব্যাপারে দু'টি ইজতিহাদ করেছিলেন।

একঃ খিলাফত পরিচালনা ও নেতৃত্বদানের জন্য যেসব যোগ্যতা প্রয়োজন তাঁর মধ্যে তা যথেষ্ট পরিমাণে আছে।

দুইঃ রাষ্ট্র পরিচালনার জন্য যে পরিমাণ জনবল ও একনিষ্ঠ কর্মী দরকার তাও তাঁর ছিল। কেননা কুফা থেকে ইমাম হুসাইন রাযি. এর হাতে বাইয়াত গ্রহণ ও সর্বত সহযোগিতার ইচ্ছা ব্যক্ত করে লিখা প্রায় ১৮ হাজার চিঠি তার কাছে পৌঁছেছিল। বস্তুত এই চিঠিগুলোই তার ২য় ইজতিহাদ করার পক্ষে দলীল ছিল।

এর মধ্যে যারা প্রথম সারীর ছিলেন তো পূর্বেই দুনিয়া থেকে বিদায় নিয়েছিলেন আর কম বয়সি সাহাবা রাযি. যারা তখনও হায়াতে ছিলেন এবং ইমাম হুসাইন রাযি. এর আশে পাশে ছিলেন তাঁরা ইমাম হুসাইন রাযি. এর প্রথম ইজতিহাদের সঙ্গে সম্পূর্ণ একমত ছিলেন। কিন্তু দ্বিতীয় ইজতিহাদের ব্যাপারে তারা ইমামের সঙ্গে একমত হতে পারেন নি। তাদের ইজতিহাদ ছিল রাষ্ট্র পরিচালনা ও জিহাদের কমান্ডিং ইমাম হুসাইন রা. এর যোগ্যতা সন্দেহাতীত কিন্তু এই পরিস্থিতিতে উক্ত কাজ আঞ্জাম দেয়ার জন্য যে পর্যাপ্ত পরিমাণ জনবল ও জানবায কর্মী অপরিহার্য তা তাঁর নেই। কেননা কুফাবাসীর কথার উপর আস্থা রাখা যায় না।

সুতরাং এমতাবস্থায় তাঁকে সহযোগিতা করলে রক্তপাতই বাড়তে থাকবে কেবল বস্তুতঃ এই ২য় ইজতিহাদের মতানৈক্যই উপস্থিত সাহাবায়ে কিরামকে তার সঙ্গে শরীক হতে বিরত রেখেছিল এবং ইজতিহাদের এই পার্থক্যের কারণে তাদের ব্যাপারে ইমাম হুসাইন রাযি. এর কোন আক্ষেপ ছিল বলে ইতিহাসে পাওয়া যায় না।

উপসংহারঃ যাই হোক ইমাম হুসাইন রাযি. এর এই সময় এই মহৎ উদ্দেশ্য অর্থাৎ খেলাফতে রাশেদার পুনঃপ্রতিষ্ঠার জন্য উঠে দাঁড়ানো উম্মতের ফায়দার স্বপক্ষে ছিল। আর তিনি যদি খেলাফত প্রাপ্তির আশায় দাঁড়িয়ে থাকেন তাহলে তার এই আশা ও যথাযথ ছিল এবং বাস্তবেও তিনি সর্বাধিক যোগ্য ব্যক্তি ছিলেন।

এখন রয়ে গেল খেলাফত প্রতিষ্ঠার ব্যাপারে বাহ্যিক আসবাবপত্র আর বিশ্বস্ত ও পর্যাপ্ত সহকর্মীদের সাহায্য সহযোগিতার ব্যাপার। তো পরবর্তী ঘটনা সমূহ দ্বারা প্রমাণিত হয় যে হযরত হুসাইন রাযি. এর পরিকল্পনা বাস্তবমুখী হয় নাই। কারণ তিনি নিজের তৎপরতার কেন্দ্র হিসাবে ইরাককে বেছে নিতে চেয়েছিলেন এবং একথা বার বার পরীক্ষিত হয়ে যাওয়ার পরও যে ইরাকবাসীরা কাপুরুষ, লোভী আর বিশ্বাসযোগ্য নয় তাদের সাহায্য সহযোগিতার ভরসায় হেজায ছেড়ে বেরিয়ে পড়েছিলেন। ইসলামী ঐতিহাসিকদের ধারণা হযরত হুসাইন রাযি. যদি স্বীয় সহমর্মি আর বন্ধু বান্ধবদের পরামর্শ মেনে নিতেন এবং ইসলামের নাভিমূল অর্থাৎ মদীনাকে বা মক্কাকে তার তৎপরতার মারকায বানাতেন তাহলে পরিস্থিতি হয়ত অন্য রকম

দাঁড়াত। কিন্তু ঐতিহাসিক ইবনে আসীরের এই বর্ণনার উপর যখন দৃষ্টি পড়ে তখন কলম থমকে যায়। ঐতিহাসিকদের ধারণা ওলট পালট হয়ে যায়। হযরত হুসাইন রাযি. যখন স্বীয় বন্ধু বান্ধবদের পরামর্শ উপেক্ষা করে মক্কা থেকে কুফার উদ্দেশ্যে যাত্রা করলেন তখন তার চাচাত ভাই আব্দুল্লাহ ইবনে জাফর তাকে রাস্তায় ঘিরে ধরলেন এবং ফিরে আসার জন্য বার বার আবেদন জানালে হযরত ইমাম হুসাইন রাযি. তাকেও এড়িয়ে যেতে চাইলেন। কিন্তু তিনি যখন কোন ভাবেই মানতে রাজি হলেন না তখন হযরত হুসাইন রাযি. মনের আসল কথা প্রকাশ করে দিলেন। তিনি বললেন আমি স্বপ্নে নানাজী রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এর যিয়ারত লাভ করেছি তিনি আমাকে একটি কাজ করার নির্দেশ দিয়েছেন আমি সেটা অবশ্যই করব। তাই তার ফলাফল যাই হোক না কেন।

আব্দুল্লাহ ইবনে জাফর জিজ্ঞেস করলেন কি সেই কাজ?

হযরত হুসাইন রাযি. বললেন সে কথা আমি কাউকে বলি নাই আর বলবও না। যতক্ষণ না আমি স্বীয় প্রভুর সম্মুখে উপস্থিত হয়ে যাই। (আল বিদায়া ওয়ান নিহায়া- ৮/১৭৫)

ঘটনা যখন এই তখন খেলাফত প্রতিষ্ঠার জন্য বাহ্যিক আসবাবের কোন প্রশ্নই ওঠে না। আর এই বিতর্কে যাওয়ার অবকাশ থাকে না যে, স্বপ্ন শরই দলীল হতে পারে কিনা, কেননা এটাতো মুহাব্বত ও ভালবাসার জগত। এখানের নিয়ম কানুনই আলাদা। রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম কে যে স্বপ্নে দেখল সে রাসূর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম কেই দেখল এখানে ভুল হওয়ার কোন অবকাশ নেই। উম্মতের বৃহত্তর স্বার্থে এবং আল্লাহ ও তার রসূলের ইশারায় আল্লাহর সন্তুষ্টির লক্ষ্যে ত্যাগ ও তিতিক্ষার নজীর স্থাপনের জন্য যা প্রয়োজনীয় সেটাই বাস্তবায়িত হয়েছে সুতরাং ইমাম হুসাইন ঠিক করেছিলেন না ভুল করেছিলেন এ বহাস অনর্থক। তিনি অবশ্যই ঠিক করেছিলেন আর এটাই তার স্বপ্নের অর্থ ছিল। আল্লাহ যেন রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এর সুন্নাতের জন্য আমাদের জান মাল ইযযত আওলাদ সবকিছু উৎসর্গ করার তৌফীক দান করেন।

তবে ইমাম হুসাইন রাযি. এর এ ঘটনা দ্বারা অনেকে তাদের তথাকথিত জিহাদ বা সংগ্রাম এর পক্ষে প্রমাণ পেশ করতে চেষ্টা করে এবং মাঠে ময়দানে খুব জ্বালাময়ী বক্তব্য রেখে সকলকে ইমাম হুসাইন এর মত ইসলামী হুকুমত প্রতিষ্ঠার জিহাদে ঝাঁপিয়ে পড়তে আহ্বান জানায়। কিন্তু বাস্তবে ইমাম হুসাইন রাযি. এর ঘটনায় তাদের জিহাদের সবক মিলে না। কারণ ইমাম হুসাইন রাযি. জিহাদ করার জন্য কুফা রওয়ানা হন নাই আর গুটিকতক লোক নিয়ে এটা তার পরিকল্পনাও হতে পারে না। তিনি বাস্তবে কুফাবাসীদের আমন্ত্রণে তাদের বাই'আত গ্রহণ করে সেখানে খেলাফত প্রতিষ্ঠার জন্য রওনা হয়েছিলেন এবং বাস্তবেও তিনি এর যোগ্য ব্যক্তিত্ব ছিলেন। অপর দিকে ইয়াযীদ এর পক্ষে অনেকে বাই'আত গ্রহণ করলে সকলে তখন পর্যন্ত

বাই'আত গ্রহণ করেন নাই সুতরাং সহীহ খেলাফত প্রতিষ্ঠার জন্য সেটাই ছিল একটি উত্তম মুহূর্ত কিন্তু কুফাবাসীদের গাদ্দারীর কারণে ইমাম হুসাইনের রাযি. সে স্বপ্ন বাস্তবের মুখ দেখতে সক্ষম হয় নাই। ইসলামী সকল ইতিহাসে এ কথাই লিপিবদ্ধ আছে। তিনি ইয়াযীদের বিরুদ্ধে লড়াই এর জন্য মক্কা থেকে রওনা হয়েছিলেন এমন কথা কোন ইতিহাসে বর্ণিত হয় নাই এবং তা বাস্তবতারও খেলাফ। কারণ এ ধরনের কোন প্রস্তুতিও ইমাম হুসাইন রাযি. এর ছিল না। সুতরাং অবাস্তব ইতিহাস বর্ণনা করা থেকে সংশ্লিষ্ট সকলের বিরত থাকা কর্তব্য কারণ এর দ্বারা ইসলামের কোন কল্যাণ সাধিত হয় না।

এক্ষেত্রে অনেকে প্রশ্ন করে থাকেন যে, কুফাবাসী যদি গাদ্দারী না করত এবং ইমাম হুসাইন তাদের খলীফা হয়ে যেতেন সেক্ষেত্রে ইয়াযীদের কি করণীয় হতো? কারণ তিনি তো ইতিপূর্বেই আমীরুল মুমিনীন পদে অধিষ্ঠিত হয়ে আছেন। মুহাক্কিক উলামায়ে কিরাম এর বর্ণনা দ্বারা বুঝে আসে যে তার উচিত হত স্বেচ্ছায় এ দায়িত্ব থেকে পদত্যাগ করে আনুগত্যের লাগাম হযরত ইমাম হুসাইন এর হাতে সোপর্দ করে দেওয়া কারণ যদিও হযরত মুআবিয়া রাযি. বিশেষ কারণে এবং উম্মাতের ঐক্যের লক্ষ্যে ইয়াযীদের পক্ষে বাই'আত গ্রহণ করেছিলেন কিন্তু বাস্তবে ইয়াযীদ থেকে সকল বিচারে সকল দিক থেকে লাখো গুণে বেশী যোগ্য ছিলেন ইমাম হুসাইন রাযি. ইয়াযিদ এ দায়িত্ব পালন না করলে ইমাম হুসাইন তার বিরুদ্ধে সর্বাত্মক জিহাদ ঘোষণা করতেন।

কারবালার ইতিহাস বর্ণনাকারীদের আরো একটি বিষয় লক্ষ্য রাখা কর্তব্য তা হল আশুরার দিনের ফযীলত শুরু থেকেই বিদ্যমান ছিল। যে কারণে ঐদিন অনেক বড় বড় ঘটনাও সংগঠিত হয়েছে যেমনঃ হযরত আবু হুরাইরা রাযি. থেকে বর্ণিত এক হাদীসে এসেছে যে, একদা নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ইয়াহুদীদের কতিপয় এমন লোকের পাশ দিয়ে অতিক্রম করেন যারা আশুরার দিনে রোযা রেখেছিল। নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তাদেরকে জিজ্ঞেস করলেন এটা কিসের রোযা? উত্তরে তারা বলল এই দিনে আল্লাহ তা'আলা হযরত মুসা আ. ও বনী ইসরাঈলকে ডুবে যাওয়া থেকে উদ্ধার করেছিলেন। আর এই দিনেই হযরত নূহ আ. এর কিশতী জূদী পর্বতে স্থির হয়েছিল। ফলে এই দিনে হযরত নূহ আ. ও হযরত মুসা আ. কৃতজ্ঞতা স্বরূপ রোযা রেখেছিলেন। তাই আমরাও এই দিনে রোযা রাখি। তখন নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বললেন মুসা আ. আর অনুসরণের ব্যাপারে এবং এই দিনে রোযা রাখার ব্যাপারে আমি তোমাদের চেয়ে বেশী হক্বদার। অতঃপর তিনি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম আশুরার দিন রোযা রাখেন এবং সাহাবাদেরকেও রোযা রাখতে আদেশ করেন। (বুখারীঃ হা: নং (২০০৪) মুসলিম হা: নং (১১৩০), মুসনাদে আহমাদ ২-হাঃনং(৩৬০)

দীনে ইসলামে রমজান শরীফের রোজা ফরজ হওয়ার পূর্বে ঐ দিন রোযা রাখা ফরজ ছিল। পরবর্তীতে রমজান মাসের রোযা ফরজ হওয়ার পর উক্ত হুকুম রহিত হয়ে গেলেও আশুরার রোযার সুন্নাত ও মুস্তাহাব হওয়া বাকী রয়ে গেছে এমন কি উক্ত একটি রোযার কারণে নবী (আ.) পূর্ণ এক বছরের গুনাহ মাফ হওয়ার ঘোষণা করেছেন। সারকথা উক্ত দিনের ফযীলত পূর্বে হতেই বিদ্যমান ছিল এমন নয় যে ইমাম হুসাইন রাযি. এর শাহাদাতের কারণে ঐ দিনের মধ্যে ফযীলত এসেছে বরং ইমাম হুসাইন রাযি. এর শাহাদতকে আরো ফযীলতময় ও মহিমান্বিত করার জন্য তা আল্লাহ তা'আলা উক্ত দিনে সংঘটিত করেছেন সুতরাং কতিপয় বক্তাদের জন্য এ কথা বলা সহীহ নয় যে কারবালার ঘটনার কারণেই আশুরার মধ্যে ফযীলত এসেছে এবং আমাদেরকে রোযা রাখার হুকুম দেয়া হয়েছে।

চতুর্থ অধ্যায়

কুরআন-সুন্নাহর আলোকে সাহাবায়ে কিরামের মাকাম ও তাদের অধিকার

রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম দীর্ঘ তেইশ বছর মেহনত করে তেইশ বছরের ফসল হিসেবে যে জামা'আতকে তৈরী করেছিলেন সেই জামা'আতকে সাহাবায়ে কিরামের জামা'আত বলা হয়। উক্ত জামা'আতকে আল্লাহ রাব্বুল আলামীন সূরাহ ফাতিহার মধ্যে সীরাতে মুস্তাকীমের নমুনা হিসেবে পেশ করেছেন এবং বলেছেন, তোমরা যে সীরাতে মুস্তাকীমের ব্যাপারে আমার নিকট দরখাস্ত করছ এর অর্থ হল এই সকল লোকেরা যে পথে যে মতে চলেছে সেই মত এবং পথ আমার নিকট চাও। আল্লাহ রাব্বুল আলামীন সুরাহ ফাতিহার মধ্য এই কথা বলে যাদেরকে আমাদের সামনে সীরাতে মুস্তাকীমের নমুনা হিসেবে পেশ করেছেন তারাই হচ্ছেন রাসূলের সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তেইশ বছরের জিন্দেগীর মেহনতের ফসল। আল্লাহ তাদেরকে বিশ্ববাসীর জন্য নমুনা হিসেবে পেশও করলেন এবং উম্মতকে একথা বলেও দিলেন যে তাদের পথে চলার জন্য তাদের মত ও পথে কায়িম থাকার জন্য তোমরা আমার নিকট দুআ কর। আমি দু'আ কবুল করব।

إِيَّاكَ نَعْبُدُ وَإِيَّاكَ نَسْتَعِينُ ﴿٥﴾ اهْدِنَا الصِّرَاطَ الْمُسْتَقِيمَ ﴿٦﴾ صِرَاطَ الَّذِينَ أَنْعَمْتَ عَلَيْهِمْ غَيْرِ الْمَغْضُوبِ عَلَيْهِمْ وَلَا الضَّالِّينَ ﴿٧﴾ وَمَن يُطِعِ اللَّهَ وَالرَّسُولَ فَأُولَٰئِكَ مَعَ الَّذِينَ أَنْعَمَ اللَّهُ عَلَيْهِم مِّنَ النَّبِيِّينَ وَالصِّدِّيقِينَ وَالشُّهَدَاءِ وَالصَّالِحِينَ ۚ وَحَسُنَ أُولَٰئِكَ رَفِيقًا ﴿٦٩﴾

(সূরাহ ফাতিহা ৫-৭, সূরাহ নিসা-৬৯)

কুরআনে কারীমের ১ম পারার দুই জায়গায় আল্লাহ তা'আলা সাহাবায়ে কিরামকে ঈমানের কষ্টিপাথর হিসেবে পেশ করে ইরশাদ করেন তোমরা সাহাবায়ে কিরামের ঈমানের মত ঈমান আনয়ন কর। আমার নবী মেহনত করে তাঁদেরকে যে নমুনার উপর রেখে গিয়েছেন সেই নমুনাকে সামনে রাখ। তাহলেই তোমরা হেদায়েত পাবে।

وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ آمِنُوا كَمَا آمَنَ النَّاسُ قَالُوا أَنُؤْمِنُ كَمَا آمَنَ السُّفَهَاءُ ۗ أَلَا إِنَّهُمْ هُمُ السُّفَهَاءُ وَلَـٰكِن لَّا يَعْلَمُونَ ﴿١٣﴾ فَتَلَقَّىٰ آدَمُ مِن رَّبِّهِ كَلِمَاتٍ فَتَابَ عَلَيْهِ ۚ إِنَّهُ هُوَ التَّوَّابُ الرَّحِيمُ ﴿٣٧﴾(সূরাহ বাকারা ১৩ ও ৩৭)

আল্লাহ তা'আলা কুরআনে কারীমের ১১তম পারায় আরো ইরশাদ করেন, আমার হাবীব সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম যেই জামা'আতকে তৈরী করে রেখে গিয়েছেন তাদেরকে যারা অন্তঃকরণ থেকে (মুনাফেকীর সাথে নয়) অনুসরণ করবে ব্যস তারাই হিদায়াতের রাস্তা প্রাপ্ত হবে। তারাই কেবল হিদায়াত প্রাপ্ত হবে এবং তাদের উপর আল্লাহ তা'আলা রাজী হয়ে যাবেন। তারাও আল্লাহর উপর রাজী হয়ে যাবে এবং আল্লাহ তা'আলা তাদেরকে এমন জান্নাত ও বাগান দান করবেন যার তলদেশ দিয়ে বিভিন্ন প্রকারের নহর প্রবাহমান থাকবে। আর এই জান্নাত তাদেরকে স্থায়ীভাবে দিবেন। দিয়ে আর কোন দিন ফেরৎ নিবেন না। আল্লাহ তা'আলা এরপর ইরশাদ করেছেনঃ

وَالسَّابِقُونَ الْأَوَّلُونَ مِنَ الْمُهَاجِرِينَ وَالْأَنْصَارِ وَالَّذِينَ اتَّبَعُوهُم بِإِحْسَانٍ رَّضِيَ اللَّـهُ عَنْهُمْ وَرَضُوا عَنْهُ وَأَعَدَّ لَهُمْ جَنَّاتٍ تَجْرِي تَحْتَهَا الْأَنْهَارُ خَالِدِينَ فِيهَا أَبَدًا ۚ ذَٰلِكَ الْفَوْزُ الْعَظِيمُ ﴿١٠٠﴾

"যদি কামিয়াবী আর সফলতা বলতে কোন কিছুকে বুঝায় তাহলে সেটা এটাই। এর বাইরে আর কোন পথে কামিয়াবী নেই।" (সুরাহ তাওবা আয়াত-১০০)

রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এর তেইশ বছরের মেহনতের ফসল সাহাবায়ে কিরাম সম্পর্কে আল্লাহ তা'আলা এই সার্টিফিকেট দিচ্ছেন। শুধু তাই নয় আল্লাহর নবীও সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বিভিন্ন হাদীসে তাদের ব্যাপারে দিয়েছেন একই সার্টিফিকেট।

মুহাম্মদ বিন কা'ব কুরাযীকে রহ. কেউ জিজ্ঞাসা করল, সাহাবায়ে কিরামের ব্যাপারে আপনার মতামত কি? তিনি বললেন, যদিও তাদের দু-একজনের থেকে সামান্য ত্রুটি বিচ্যুতি প্রকাশ পেয়েছে তবুও তারা সকলেই জান্নাতী। ঐ ব্যক্তি জিজ্ঞাসা করল আপনি একথা কোথা হতে বললেন, অর্থাৎ তার দলীল কি? তিনি বললেন কুরআনের ঐ আয়াত যাতে আল্লাহ তা'আলা তাদের সকলের উপর সন্তুষ্টির ঘোষণা দিয়েছেন। তাফসীরে মাজহারীতে এই বক্তব্য তুলে ধরে কাজী সানাউল্লাহ পানিপথী রহ. বলেন আমার মতে সাহাবায়ে কিরামের সকলের জান্নাতী হওয়ার ব্যাপারে এর চেয়ে সুস্পষ্ট প্রমাণ হল এই আয়াত, যার মধ্যে রয়েছে- و كلا و عد ا الله ا لحسنى

অর্থঃ আল্লাহ তা'আলা সকল সাহাবীর রাযি. জান্নাতের ওয়াদা অঙ্গীকার করেছেন। (মাআরিফুল কুরআন মুফতী শফী রহ.)

এক হাদীসে ইরশাদ হচ্ছে বনী ইসরাইল বাহাত্তর ফিরকায় বিভক্ত হয়ে পড়েছিল অতি সত্ত্বর আমার উম্মত তিয়াত্তর ফিরকায় বিভক্ত হয়ে পড়বে। এর মধ্য থেকে বাহাত্তর ফিরকা জাহান্নমে যাবে আর শুধুমাত্র এক ফিরকা/দল যাবে জান্নাতে।

জিজ্ঞাসা কর হল ইয়া রাসূলুল্লাহ। এই জান্নাতী দল কোনটি তদুত্তরে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ইরশাদ করলেন, আমি ও আমার সাহাবায়ে কিরাম যে তরীকা, মত ও পথের উপর রয়েছি এই মত ও পথকে যারা গ্রহণ করবে কেবল তারাই হবে ঐ জান্নাতী দল। আর যারা এই পথ থেকে সরে যাবে তারাই হবে ঐ জাহান্নামী বাহাত্তর ফিরকাভূক্ত। উক্ত হাদীসে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম পরবর্তী উম্মতের জন্য হকের মাপকাঠি হিসেবে শুধু নিজেকেই পেশ করেননি। বরং তাঁর তেইশ বছরের মেহনতের ফসল সাহাবায়ে কিরাম রাযি. কেও পেশ করেছেন। তাদের সম্পর্কে আরো বলেছেন যে মুসলিম অবস্থায় আমি রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম কে দেখেছে তাকে দোযখের আগুন স্পর্শ করবেনা এবং ঈমানের হালাতে যে ব্যক্তি এমন কাউকে দেখবে যে আমাকে দেখেছে তাকেও দোযখের আগুন স্পর্শ করবে না।

প্রথমাংশে বলা হয়েছে সাহাবাদের রাযি. জামাআতের কথা আর দ্বিতীয়াংশে বলা হয়েছে তাবেয়ীদের কথা। সুবহানাল্লাহ। কত বড় মাকাম এবং ফযীলত সাহাবায়ে কিরামের যে তাদেরকে যারা ঈমানের অবস্থায় দেখবে তাদেরকেও জাহান্নম থেকে মুক্তি সনদ দেয়া হচ্ছে। এক মিনিটের জন্যও যে ব্যক্তি রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম কে ঈমানের হালাতে দেখেছে এবং ঈমান নিয়েই মৃত্যু বরণ করেছে তার নাম মুবারক সাহাবায়ে কিরামের লিষ্টে চলে গেছে। রাসূলের এই সামান্য সময়ের সুহবতের এত মূল্য যে কিতাবে এসেছে সামান্য সময়ের জন্যও যিনি রাসূলকে সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম দুনিয়াতে দেখেছেন এবং এই অবস্থায়ই ইন্তিকাল করেছেন তার আমল যদি এক পাল্লায় রাখা হয় আর সাহাবায়ে কিরামের পর তাবেঈদের যুগ থেকে এ পর্যন্ত যত ওলী-আল্লাহ, গাউস, কুতুব, আবদাল (যাদের মধ্যে রয়েছেন হযরত হাসান বসরী) রহ., চার মাজহাবের প্রসিদ্ধ চার ইমাম, অন্যান্য ইমামগণ, হাদীসগ্রন্থ সমূহের লেখকগণ, অন্যান্য সকল মুহাদ্দিসীন, সকল মুফাসসিরীন, বায়েযীদ বোস্তামী, আব্দুল কাদের জিলানী, খাজা মুঈনুদ্দীন চিশতী, মুজাদ্দিদে আলফে সানী ও অন্যান্য সকল আওলিয়ায়ে কিরাম) সহ এ পৃথিবীতে কিয়ামত পর্যন্ত যত মুসলমান এসেছেন এবং আসবেন সকল মুসলমানদের আমলকে যদি আরেক পাল্লায় রাখা হয় তাহলে রাসূলকে যিনি এক মিনিটের জন্যও দেখে ধন্য হয়েছেন সেই সাহাবীর রাযি. আমলের পাল্লা ভারী হয়ে যাবে। সুবহানাল্লাহ এজন্য নবী কারীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেন আমার সাহাবায়ে কিরামকে গালি দিও না। তাদের কোন সমালোচনা করো না। (বুখারী শরীফ হাদীস নং ৩৬৭৩ মুসলিম শরীফ ২৫৪০ তিরমিযী ২/২২৫)

এক হাদীসের শেষাংশে রয়েছে, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেন এবং আমার মৃত্যুর পর আমার সাহাবাগণ উম্মতের (ঈমান আমলের হেফাজত তথা ফেতনা থেকে রক্ষার জন্য) নিরাপত্তা বিধায়ক। অর্থাৎ তাদের সকলের অনুসরণই কেবল উম্মতের মুক্তির উপায়। (মুসলিম শরীফ, হাদীস নং ২৫৩১)

প্রায় এক লাখ ত্রিশ হাজার সাহাবী রাযি. ছিলেন। তাঁদের দু'চারজন থেকে কমবেশী ভুল হয়েছে আল্লাহর রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন যে, সাবধান এই যে দু'চারজন থেকে সামান্য ভুল ত্রুটি হয়েছে এ ব্যাপারে তোমাদের মুখ খোলার এবং তাদের কোন প্রকার সমালোচনা করার অধিকার মোটেও নেই। (বুখারী শরীফ, হাদীস নং-৩৬৭৩)

সমালোচনা করার প্রয়োজনও নেই। আপনার বাপের ভুল হয়, আপনার দাদা, নানা, মা জননী এবং অন্যান্য আপনজনের ভুল হয় তাহলে কি সেটা আমরা বাজার ঘাটে ঘোষণা করে বেড়াই? তা তো করি না। আম্বিয়া কিরাম মাসুম তথা নিষ্পাপ। কিন্তু সাহাবায়ে কিরামকে নিষ্পাপ বলা হয়নি। বরং মাগফূর বা ক্ষমাপ্রাপ্ত বলা হয়েছে। কিন্তু তাদের একেকজন আল্লাহর দীনের জন্য এত বড় কুরবানী পেশ করেছেন যা আমাদের পক্ষে সম্ভবই নয়। আমাদের তো এই অবস্থা যে ঘর বাড়ী সব ঠিক থাকবে দুনিয়াবী কাজ কাম সব ঠিক থাকবে। তারপরও যখন বলা হয় যে ভাই চলুন তিন দিনের জন্য বা এক চিল্লার জন্য আল্লাহর রাস্তায় বের হই। ইমানকে সহীহ করে আসি। তখন আমরা ক্যালকুলেটর নিয়ে বসি এবং অপ্রয়োজনীয় একশ রকম বাহানা খুঁজে বের করি এবং বলি আমার দ্বারা সম্ভব না। কারণ আমার বহু কাজ বহু ঝামেলা। ফলে তিনদিনের জন্য আল্লাহর রাস্তায় বের হওয়ারও তাওফীক হয় না আমাদের। অথচ সাহাবায়ে কিরামের অবস্থা কি ছিল? তাদের ঘর-বাড়ী, জমি-জায়গা, টাকা-পয়সা কিছুই ঠিক থাকেনি। সব কাফির বেঈমানদের দখলে চলে গেছে সেই মুহূর্তে আল্লাহ তা'আলার নির্দেশ এলো মদীনায় হিজরত কর। আগে পিছে কি হবে কোন কিছু না ভেবে কোন কিছুর পরওয়া না করে সবকিছু ছেড়ে তারা মদীনায় হিজরত করেছেন। আল্লাহর দীনের জন্য কি পরিমাণ ত্যাগ এবং কুরবানী তাদের ছিল। যে কারণে কুরআনের যেখানে আল্লাহ পাক তাদের কথা উল্লেখ করেছেন তাদেরকে বলেছেন ফুকারায়ে মুহাজিরীন। ফুকারা ফকীর এর বহুবচন। অর্থাৎ যাদের কিছুই নেই। হিজরত করার পর সব কাফিরদের দখলে চলে গেছে। দীনের তরে জান দেয়ার জন্য সদা সর্বদা পাগলপারা ছিলেন। জিহাদের ময়দানে অকাতরে জান বিলিয়ে দিয়েছেন। কোন পরওয়া করেননি।

পারব কি আমরা? আমরা তো একশবার চিন্তা করব যে, আমি জান দিয়ে দিলে আমার ছেলেটাকে কে দেখবে? কে দেখবে আমার ব্যবসা? আমাদের এই ক্যালকুলেশন করতে করতে দীনের জন্য জান দেয়া আর সম্ভবপর হবে না। হ্যাঁ, আল্লাহ তা'আলা যদি কাউকে তাওফীক দেন সেটা ভিন্ন কথা। কিন্তু তাঁরা? তাঁরা তো এই হিসাব কখনো সামনে আনেন নি। যখন তখন জান বিলিয়ে দিয়েছেন দীনের জন্য।

এই ভাবে দীনের জন্য তাদের কুরবানী ও ত্যাগ ছিল আজীব ধরনের। যা করে দেখানো কারো পক্ষে সম্ভব নয়। যার ফলে আল্লাহ রাব্বুল আলামীন তাদের জন্য অগ্রিম ক্ষমা ও তাদের প্রতি সন্তুষ্টির ঘোষণা দিয়ে দিয়েছেন।

বদরী সাহাবীদের রাযি. সম্পর্কে আল্লাহ তা'আলা ঘোষণা করেন যা মনে চায়, তাই কর। আমি তোমাদেরকে ক্ষমা করে দিয়েছি। (বুখারী শরীফ, হাদীস নং-৬৯৩৯, মুসলিম শরীফ হাদীস নং-২৪৯৪)

আমরা শুনলে তো লাফ দিয়ে পড়তাম। খুশিতে বাগ বাগ হয়ে যেতাম যে, আল্লাহর পক্ষ থেকে সব গুনাহের পার্মিশন পেয়ে গেলাম। কিন্তু এমন ছিলেন সেই সাহাবায়ে কিরামের জামা'আত? আল্লাহু আকবার! এই অগ্রিম ক্ষমার ঘোষণা শুনে তারা আরো জড়সড় হয়ে গেলেন। নাফরমানী তো দূরের কথা আল্লাহ ইবাদত বন্দেগীতে আরো বেশী নিমগ্ন হলেন। ভীত সন্ত্রস্ত হলেন যে, আল্লাহ তা'আলা আমাদের উপর যে আস্থা পেশ করলেন। আয় আল্লাহ! তা ধরে রাখার তাওফীক তুমি আমাদেরকে দাও। যেহেতু আল্লাহ তা'আলা তাদের জন্য অগ্রিম ক্ষমার ঘোষণা করেছেন তাই আল্লাহর রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম আমাদেরকে বলেছেন যে, মুখে তালা লাগাও। তোমার বাপের যখন তুমি সমালোচনা করনা অথচ তোমার বাপের চেয়ে কোটি কোটি গুন বেশী হক তাদের যাদের মাধ্যমে পেতে? সাহাবীদেরকে রাযি. বাদ দিয়ে রাসূলের কথাগুলো জানার বুঝার কোন সূরত নেই। কাজেই তোমার বাপের চেয়েও কোটি গুন বেশী ভক্তি শ্রদ্ধা যাদের জন্য হওয়া উচিত তাদর ব্যাপারে মুখে তারা লাগাও। তাদের শুধু যিকরে খাইর তথা ভাল গুন নিয়ে আলোচনা কর। (মুসনাদে আহমাদ ২০৬০)

তিনি আরো বলেছেন, যাদেরকে তোমরা আমার সাহাবীদের রাযি. সমালোচনা করতে দেখ তাদেরকে বলে দাও তোমাদের উপর আল্লাহর লানত/অভিশাপ বর্ষিত হোক (লা'নত মানে আল্লাহর রহমত থেকে দূরে হওয়া। আল্লাহর রহমতের মধ্যে যার কোন হিস্যা বা অংশ নেই তাকে বলা হয় তোমার উপর আল্লাহর লা'নত। সাংঘাতিক কথা।) (তিরমিযী শরীফ ২/২২৫)

এটাকেই আরো স্পষ্ট করে অন্য হাদীসে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন আমার সাহাবীদের রাযি. সমালোচনা করো না। তোমাদের একেকজন যদি উহুদ পাহাড় পরিমাণ স্বর্ণ আল্লাহর রাস্তায় দান কর তাহলে তা আমার সাহাবায়ে কিরামের মাত্র আধা সের গম দান করার সওয়াবের সমান হবে না। (বুখারী শরীফ হাদীস নং-৩৬৭৩, মুসিলম শরীফ হাদীস নং ২৫৪০, তিরমিযী শরীফ ২/২২৫)

কারণ, তাদের যে পরিমাণ ত্যাগ-কুরবানী এবং সীমাহীন ইখলাস তা আমাদের মধ্যে নেই। আর এটার কারণেই সওয়াব বেশি হয়ে যায়। মাল কার কত বেশি সেটা কিন্তু আল্লাহ দেখবেন না।

এক যুদ্ধে হযরত আবূ বকর সিদ্দীক রাযি. দিলেন অল্প মাল। কারণ, তার নিকট ঐ মাল ছাড়া আর কিছুই ছিল না। হযরত উমরে ফারুক রাযি. দিলেন অনেক বেশি, প্রায়

দু'চার উটের বোঝা। এবং মনে মনে খুব আনন্দিত যে, নেক কাজে প্রতিযোগিতায় কোনদিন তো আবূ বকরের সাথে পারিনি। আজকে আমি জিতে যাবো আর আবূ বকর আমার পিছনে পড়ে যাবেন অর্থাৎ তিনি আমার কাছে হেরে যাবেন। কিন্তু আল্লাহর রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম যখন জিজ্ঞাসা করলেন যে, আবূ বকর কি এনেছ? তিনি বললেন, ইয়া রাসূলাল্লাহ! ঘরে যা ছিল সব গাট্টি বেঁধে নিয়ে এসেছি। কিছুই রেখে আসিনি। প্রিয়নবী বললেন, বিবি-বাচ্চার জন্য কি রেখে এসেছ? তিনি বললেন, আল্লাহ ও আল্লাহর রাসূলকে রেখে এসেছি। ঘরে আর কোন সামান-পত্র নেই। হযরত উমর রাযি. কে জিজ্ঞাসা করলেন, উমর! তুমি কি এনেছ? তিনি বললেন, ইয়া রাসূলাল্লাহ! আল্লাহ আমাকে যত সম্পদ দিয়েছেন, তার অর্ধেক এনেছি। আর বাকী অর্ধেক রেখে এসেছি। হযরত উমর রাযি. বুঝতে পারলেন যে, তাঁর মাল বেশি হলেও তিনি তো এনেছেন অর্ধেক। পক্ষান্তরে হযরত আবূ বকর এনেছেন তো সবই, যদিও তা অল্প। আজকেও আমি তার কাছে হেরে গেলাম।

এই ঘটনা উল্লেখ করলাম একথা বুঝানোর জন্য যে, ইখলাস ও কুরবানী যার যত বেশি হবে, তার আমলের মূল্য আল্লাহর দরবারে তত বেশি হবে। পূর্বের ঐ হাদীসে একথাই বুঝানো হয়েছে যে, একজন সাহাবী দিলেন আধা সের গম আর আমি আপনি দিব উহুদ পাহাড় পরিমাণ স্বর্ণ, যদিও এটা হাসিল করা কক্ষনো সম্ভবপর নয়, কথার কথা বলা হয়েছে মাত্র। তাহলেও এই পরিমাণ স্বর্ণ দান করার সওয়াব তাঁদের আধা সের গম দান করার সওয়াবের পরিমাণও হবে না।

আরেক বর্ণনায় আল্লাহর রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেন, মুমিন যে হবে, সে আমার সাহাবায়ে কিরামকে মহব্বত করবে। এছাড়া দুনিয়ার কেউ মুমিন হতেই পারে না। আর আমার সাহাবায়ে কিরামের সমালোচনা যে করবে, সে হবে মুনাফিক। মুনাফিক ছাড়া আমার সাহাবায়ে কিরামের সমালোচনা কেউ করতেই পারে না। এরপর বলেন, আমার সাহাবায়ে কিরামকে যে মুহাব্বাত করবে আল্লাহ তা'আলা তাকে মুহাব্বাত করবেন। আর আমার সাহাবায়ে কিরামের যে ব্যক্তি সমালোচনা করবে তাদের প্রতি বিদ্বেষ ও দুশমনী রাখবে স্বীয় আল্লাহ রাব্বুল আলামীন তাদের প্রতি বিদ্বেষ ও দুশমনী রাখবেন। লক্ষ্য করুন কত বড় মাকাম তাঁদের । (বুখারী শরীফ হাদীস নং-৩৭৮৩, মুসলিম শরীফ হাদীস নং ১২৯, মুসনাদে আহমদ হাদীস নং-১৮৬০২)

আরেক হাদীসে ইরশাদ হচ্ছে, "তোমরা আমার সাহাবায়ে কিরামের ব্যাপারে আল্লাহকে ভয় কর, তোমার আল্লাহকে ভয় কর, আমার ইন্তিকালের পর আমার সাহাবীদেরকে রাযি. নিয়ে সমালোচনা করো না। তাদের সমালোচনা করার অধিকার তোমাদের নেই।" কারো সমালোচনা করতে গেলে শরীআতের মূলনীতি হচ্ছে সমালোচনাকারীকে যার সমালোচনা করা হচ্ছে তার চেয়ে বড় হতে হয় অথবা কমপক্ষে তার সমকক্ষ হতে হয়। আপনার বাপ যদি ভুল করে তাহলে আপনার চাচা বা দাদা সেটা ধরে দিবে। আপনি ছেলে হয়ে আপনার বাপের সমালোচনা করতে

পারেন না। হ্যাঁ, আপনি আপনার ছোট ভাইয়ের ভুল ধরতে পারেন। তাকে শাসন করতে বা রাগ করতে পারেন। আমরা কি সাহাবায়ে কিরামের সমকক্ষ না উপরে? কোনটাই না। তাহলে কোন সাহসে এই পচা গান্দা মুখে সাহাবাদের সমালোচনা করব? তাই যে তাদেরকে মহব্বত করে সে রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম কে মহব্বত করে। আর যে তাদের কারো সমালোচনা করে সেটা মূলত সে যে আমার প্রতি বিদ্বেষ রাখে সেটারই বহিঃপ্রকাশ। এটা উলামাদের কোন কথা বা ব্যাখ্যা নয়। রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এর নিজের মুখের কথা। রাসূলের প্রতি যে বিদ্বেষ আছে তার আলামত এটা যে সে রাসূলের ২৩ বছরের মেহনতের ফসল সাহাবাদের সমালোচনা করে। এরপর বলেছেন, শোন! যে আমার সাহাবীদের রাযি. সমালোচনা করে তাদের মনে দুঃখ দিবে সে স্বীয় আমি মুহাম্মাদুর রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম মনে দুঃখ দিল। আর যে আমার মনে দুঃখ দিল। সে শুধু আমাকে দুঃখ দিল না বরং সে আল্লাহ রাব্বুল আলামীনকে দুঃখ দিল। আর যে আল্লাহকে দুঃখ দিল আল্লাহ তাকে পাকড়াও করবেন এবং দোযখে নিক্ষেপ করবেন। (মুসনাদে আহমদ হাদীস নং২০৬০৩, তিরমিযী শরীফ ২/২২৫)

কি ভয়াবহ অবস্থা তাদের দু'চারজন দ্বারা ভুল সংঘটিত হয়েছে কিন্তু তাদের সমালোচনা করা নিষেধ। কেন তার কারণ হল তারা ছিলেন নেকীর সমুদ্র। আর সমুদ্র নাপাক হয় না।

তাদের সীমাহীন কুরবানীর কারণে আল্লাহ তাদেরকে এত বেশী নেকী দান করেছেন যে, সেই নেকীর সমুদ্রে তাদের থেকে প্রকাশ পাওয়া সামান্য ত্রুটি বিচ্যুতির অস্তিত্ব নষ্ট হয়ে গেছে।

তবে প্রশ্ন থেকে যায় যে, ভুলগুলো কেন হল? তার জবাবে উলামায়ে কিরাম লিখেছেন যে রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম শুধু থিউরিটিক্যাল (শুধু বিধানাবলী শুনিয়ে দেয়ার জন্য) তালীমের জন্য দুনিয়াতে আসেননি। বরং তার সাথে সাথে সেগুলোর উপর কিভাবে আমল করতে হবে তা প্রাকটিক্যাল/বাস্তবে দেখিয়ে দেয়ার জন্যও তাঁকে পাঠানো হয়েছে। এখন দু'চারজন সাহাবী রাযি. থেকে যদি ভুল-প্রকাশ না পায় তাহলে কোন ভুলের জন্য কিভাবে শাস্তি প্রয়োগ করতে হবে? এর নমুনা কোথায়? সুতরাং কেউ যদি ভুল না করে তাহলে তিনি এগুলোর প্রাকটিক্যাললী শাস্তির তালীম কিভাবে দিবেন? তার জীবদ্দশায় তো কোন তাবেঈ থাকবে না। তাঁর হায়াতে যারা থাকবেন তারা তো সাহাবীই রাযি. হবেন। সুতরাং কোন কিছু বাস্তবে দেখিয়ে দিতে হলে কোন না কোন সাহাবী রাযি. দ্বারাই দেখাতে হবে। কারণ আম্বিয়া কিরাম মাসুম বা নিষ্পাপ বিধায় এই প্রয়োজন তাদের দ্বারা মিটানো সম্ভবপর নয়। এমনিভাবে ভুল হয়ে গেলে একজন মুমিনের অবস্থা কিরূপ হওয়া উচিত? এরও একটা নমুনা দরকার। ওদিকে রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম মা'সুম। তিনি তো ভুল করতে পারেন না। সুতরাং এর একমাত্র পন্থা সাহাবীদের রাযি. মাধ্যমে তার নমুনা দেখিয়ে দেয়া।

লক্ষণীয় বিষয় হল, ভুল হওয়ার পর তাদের মানসিক অবস্থা কিরূপ হয়েছিল? একজন সাহাবীর (আল্লাহ তা'আলা তাকে মাফ করে দিয়েছেন) যিনা হয়ে গেছে। দুনিয়াতে যার কোন সাক্ষী নেই। কেউ জানেনা সেই ঘটনা। তিনি নিজে রাসূলের দরবারে এসে বলতে লাগলেন ইয়া রাসূলুল্লাহ আমাকে পাক পবিত্র করুন। আমাকে জাহান্নাম থেকে বাঁচান। আমার ভুল হয়ে গেছে। রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তাকে বললেন আরে তুমি মনে হয় চুমু দিয়েছ। এই বলে তার দিক থেকে চেহারা মুবারক ফিরিয়ে নিলেন। সেই সাহাবী রাযি. পুনরায় হুজুরের সম্মুখে এসে একই কথা বললেন, হুজুর আমাকে পাক পবিত্র করুন। এভাবে চার চার বার হুজুর যেদিকে চেহারা ঘুরিয়ে নিয়েছেন উনি সেদিকে যেয়ে একই কথা বলতে লাগলেন। (বুখারী শরীফ হাদীস নং-৬৮২৪) আর এক্ষেত্রে শরীআতের বিধান হল কেউ যদি যিনার অপরাধ চার বার স্বীকার করে অথবা চারজন পুরুষ সাক্ষী ঘটনা স্বচক্ষে দেখার সাক্ষ্য দেয় তাহলে শরীআত কর্তৃক নির্ধারিত শাস্তি অর্থাৎ যিনাকারী বিবাহিত হলে পাথর মেরে হত্যা আর তা না হলে একশত বেত্রাঘাত করার শাস্তি তার উপর প্রয়োগ করতে হবে।

চিন্তার বিষয় যেখানে দুনিয়ার কেউ তার সাক্ষী নেই, সেখানে তিনি এমন পেরেশান হলেন যেন পাগল হয়ে গেছেন। তার সব যেন হারাম হয়ে গেছে। খানা-পিনা, বিবি-বাচ্চা, ঘর-বাড়ী ইত্যাদির কোন কিছুতেই তার মজা নেই। শুধু একই চিন্তা আর একই কথা। হুজুর আমাকে পবিত্র করুন। আমি তো ধ্বংস হয়ে গিয়েছি। তো গুনাহ হয়ে গেলে মু'মিনের মানসিক অবস্থা কিরকম হওয়া উচিত? উম্মতের সামনে তার একটা নমুনা দরকার। আর এজন্য দু'চারজন সাহাবীর রাযি. ভুল প্রকাশ পাওয়া ছিল খুবই জরুরী যে, তাদেরকে দেখ, ভুল হওয়ার পর তাদের মানসিক অবস্থা কিরূপ হয়েছিল? তোমার তেমনটি হয়েছে কিনা, হলে তুমি পাক্কা মুমিন আর না হলে তুমি মুনাফিক মুমিন আল্লাহর নাফরমানীও করবে। আবার তা থেকে তাওবা করতে পারবে। এটা তো হতে পারে না। এরকম হলে সে তো মুনাফিক। সে মুসলমান হতে পারে না। যতক্ষণ সে তাওবা করে পাক সাফ না হবে ততক্ষণ সে পাগল থাকবে।

এক্ষেত্রেও সাহাবায়ে কিরাম সত্যের মাপকাঠি। শয়তানের চক্রান্তে পড়ে ভুল হয়ে গেলে কি করতে হবে? এই দু'চারজন সাহাবী রাযি. হচ্ছেন তার নমুনা। তাদের থেকে ভুল প্রকাশ পাওয়ার বহু হিকমত রয়েছে। আমি শুধু কয়েকটা উল্লেখ করলাম মাত্র। তাদের দ্বারা ভুল প্রকাশ পেয়েছে। কিন্তু আমাদের জন্য সেগুলোকে সমালোচনার দৃষ্টিতে দেখা বলা সবই হারাম ও নাজায়িয। এটা করলে আমাদের ঈমান থাকবে না। এ কারণেই ঈমানের কিতাবে লিখিত রয়েছে তাদেরকে (সাহাবায়ে কিরামকে) মুহাব্বাত করা হল দীন ঈমান ও ঈমানের পরিপূর্ণতা। আর তাদের প্রতি কোনরূপ বিদ্বেষ রাখা তাদের সমালোচনা করা তাদের দিকে বাঁকা দৃষ্টিতে দেখা কুফরী কাজ মুনাফেকী কাজ এবং শরীআতের সীমালঙ্ঘন ও তার বাইরে চলে যাওয়া। (মুসলিম শরীফ হাদীস নং-১২৮, আকীদাতুত্তাহাবী -১৩৯, রাসায়িলে ইবনে আবিদীন ১/৩৫৮)

তাদের সমালোচনা করা তো দূরের কথা হাক্কানী উলামায়ে কিরাম যারা নিঃস্বার্থভাবে দ্বীনে কাজ করে যাচ্ছেন। মানুষকে দোযখ থেকে বাঁচানোর এবং জান্নাতের মালিক বানানোর ফিকিরে সবসময়েই লেগে আছেন। রাসূলের মিশনকে বাস্তবায়ন করার কাজে নিজেদের জীবনকে উৎসর্গ করে দিয়েছেন। কোন ব্যবসা বাণিজ্য তাদের নেই, সারাটা দিন শুধু দীনের ফিকির। যেহেতু তাদের সমালোচনা মূলতঃ রাসূলের সমালোচনা। তাই তাদের সমালোচনা করার দ্বারাও ইমান চলে যায়। তার স্ত্রী তালাক হয়ে যাবে। আক্বীদার কিতাবে লিখিত আছে যে, কেউ যদি বলে, আলেম সমাজই খারাপ এরাই সব নষ্টের মূল, মোল্লাদের টুপির নীচে শুধু শয়তান থাকে, তাহলে তার ঈমান চলে যাবে। কারণ সে বাহ্যিকভাবে আলিম সমাজকে গালি দিয়েছে ঠিক কিন্তু আলিম সমাজ যেহেতু নবীর ওয়ারিশ তাই গালি সরাসরি গিয়ে পড়ে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এর উপর। (নাউযুবিল্লাহ)

ফলে তার মহা মূল্যবান ঈমান এক নিমিষেই সে নষ্ট করে ফেলে। হ্যাঁ যদি কোন আলেম এমন কোন দোষে দোষী হন যে দোষটি প্রমাণিত তাহলে এ কারণে কেউ তার উক্ত কাজের সমালোচনা করলে তার ইমান যাবে না। (ফাতাওয়া আলমগীরী ২/২৭০)

গত শতাব্দীর সবচেয়ে বড় আলেম (আল্লাহ যাকে অন্তর্দৃষ্টি দান করেছিলেন) মুফতী রশীদ আহমাদ সাহেব রহ. লিখেছেন আলিমের সমালোচনাকারীকে যখন কবরে কিবলামুখী করে রাখা হবে পরক্ষণেই তার চেহারা কিবলার দিক থেকে সরে গিয়ে পূর্বমূখী হয়ে যাবে। তিনি আরো বলেন, তোমাদের যদি কারো অন্তর্দৃষ্টি থাকে তাহলে তার কবর খুঁড়ে দেখে নাও। তিনি স্বীয় অন্তর্দৃষ্টি দ্বারা দেখেই একথা লিখেছেন। হক্কানী উলামায়ে কিরামের সমালোচনা করলে যদি ঈমান চলে যায় তাহলে সাহাবায়ে কিরামের সমালোচনা করলে ইমানের কি অবস্থা হবে?

আমি এ প্রসঙ্গ এজন্য টেনেছি যে, বর্তমানকালে ইসলাম নামধারী একটি গ্রুপ নির্দ্বিধায় সাহাবায়ে কিরামের সমালোচনা করে সমাজে তাদের বিরুদ্ধে বিদ্বেষ ছড়াচ্ছে। সাহাবায়ে কিরামের ব্যাপারে শিয়া'আদের (কাফেরদের) লিখিত মিথ্যা ইতিহাসকে আমদানি করে সাহাবায়ে কিরামের বিরুদ্ধে কুৎসা রুটিয়ে সমাজে তাদের ভাবমূর্তি ক্ষুণ্ণ করছে এবং সরলপ্রাণ মুসলমানদের মহা মূল্যবান সম্পদ ঈমান ধ্বংসের পাঁয়তারা চালাচ্ছে। এমনকি তারা নবী আলাইহিমুস সালামদেরকে পর্যন্ত তাদের সমালোচনার তলোয়ার থেকে রেহাই দেয়নি। তাদের বইতে আমি নিজে পড়েছি তাতে লেখা আছে যে, সত্য উদঘাটনের জন্য আল্লাহ তা'আলারও সমালোচনা করা যায়। (নাউযুবিল্লাহ)

তাদের এই পুস্তকে আরো লিখিত রয়েছে যে আল্লাহ তা'আলা প্রত্যেক নবীকে দিয়ে ৩/৪ টা করে গুনাহে কবীরা করিয়েছেন যাতে করে মানুষেরা তাদেরকে ফেরেশতা মনে না করে বসে। নাউযুবিল্লাহ!! সম্পূর্ণ মিথ্যা কথা। কত বড় খোঁড়া যুক্তি। নবী-

রাসূলগণকে মানুষ মনে করার জন্য কি এতটুকু যথেষ্ট নয় যে, তারা খাওয়া-দাওয়া, বাজার করা, পেশাব-পায়খানা ইত্যাদি মানবীয় কার্যাদিতে অভ্যস্ত ছিলেন। ধিক্ শত ধিক্ !! সেই সব "অল্প বিদ্যা ভয়ংকরী কথায় কথায় কত বড়" লোকদের। তারা আরো বলেছে যে, এই সমালোচনা না করলে নাকি ইসলাম কায়িম করা সম্ভবপর নয়। ইসলাম কায়িম করার নামে তারা নিজেরাও এসব বই পড়ছে অন্যদেরকেও পড়তে দিচ্ছে। কুরআনের তাফসীর করার নামে এসব বই পড়ছে অন্যদেরকেও পড়তে দিচ্ছে। এমনকি সাহাবায়ে কিরাম ও আম্বিয়া কিরামের সমালোচনা ভরপুর সেই সব বই পুস্তক আলিয়া মাদরাসার পাঠ্য তালিকার অন্তর্ভুক্ত করার জন্য ইতিমধ্যে সরকারের নিকট আপিলও করেছে। এবং বহু চেষ্টা তদবীর চালিয়ে যাচ্ছে। কাজেই এই গ্রুপ যখন আম্বিয়া কিরাম ও সাহাবায়ে কিরামের ঢালাও ভাবে সমালোচনা করে বেড়াচ্ছে এবং বলছে যে, এটা দীনের গুরুত্বপূর্ণ খেদমত। এই মুহূর্তে আপনি আমি যদি না জানি যে সাহাবায়ে কিরাম কি জিনিস? তাদের মাকাম কি? আমাদের উপর তাদের হক কি? তাহলে আমরাও তাদের ভ্রান্তির ধুম্রজালের শিকার হয়ে আমাদের দীন-ঈমানকে খুইয়ে বসব। বেঈমান হয়ে কবরে যেতে হবে। কবরে চেহারাকে কিবলার দিকে থেকে ফিরিয়ে পূর্বমুখী করে দেয়া হবে।

এই জন্য সব যমানায় তাদের হক/অধিকার সম্পর্কে জানা বিশেষ করে এই যমানায় অবগতি লাভ করা খুব জরুরী। কারণ এই যমানায় একটি গ্রুপ (দেশব্যাপী যাদের সংগঠন বিস্তৃত। সরকারী ভাবেও যারা মদদপুষ্ট) নিয়মিত মানুষের ঘরে ঘরে যেয়ে এসব বই পুস্তক বিলি করছে যে সব বই পুস্তকে সাহাবায়ে কিরামের সমালোচনা করা হয়েছে। হযরত উসমান গনী রাযি. হযরত মুআবিয়া রাযি. সহ আরো বহু সাহাবায়ে কিরামের সমালোচনায় সেসব বই ভরপুর। আমরা কি জানি এই গ্রুপের গোঁড়ায় কারা? নামধারী মুসলমানদের দ্বারা এগুলো কারা করাচ্ছে? এর পিছে রয়েছে ইহুদীদের চক্রান্ত। ইহুদী এবং শিআ (যারা মুসলমান হওয়ার দাবীদার) কর্তৃক লিখিত কল্পিত ইতিহাস থেকেই তারা একথাগুলো প্রচার করে। এই সাহাবীদের রাযি. সমালোচনার ভিত্তি হচ্ছে সেই মিথ্যা ইতিহাস। কোন সহীহ এবং নির্ভরযোগ্য ইতিহাস গ্রন্থে এগুলো নেই।

তারা (ইহুদী এবং শিআ) এই ইতিহাসগুলো প্রথমে আরবীতে লেখে। অতঃপর তা ইংরেজী ভাষায় ভাষান্তরিত হয়। অতঃপর সেগুলোকে ইংরেজী থেকে বাংলায় অনুবাদ করে তা আমাদের দেশে ইসলামিক স্টাডিজে পড়ানো হয়। ফলে আমাদের দেশে যারা ইসলামিক স্টাডিজ নিয়ে লেখাপড়া করে তারাও সাহাবী রাযি. বিদ্বেষী হয়ে যায়।

তাদের মুখে তখন শোভা পায়, হযরত উসমান গনী রাযি. স্বজনপ্রীতি করেছেন হযরত মুআবিয়া রাযি. রাজতন্ত্র কায়িম করে গেছেন। নাউযুবিল্লাহ। একদম ডাহা মিথ্যা কথা।

এই ইহুদীরাই সাহাবী বিদ্বেষী একটি দল খাঁড়া করেছে। যাদের বিরাট কাণ্ড রয়েছে। রয়েছে বহু ব্যাংক, হাসপাতাল। বহু পন্থায় তারা এই গলত আক্বীদা আর নিউ ইসলাম

জনসাধারণকে গিলানোর চেষ্টা করছে। এই মুহূর্তে আপনার কাছে যদি সহীহ ইলম না থাকে সাহাবাদের মর্যাদার জ্ঞান না থাকে রাসূলের হাদীস আপনার সম্মুখে না থাকে তাহলে যে কোন মুহূর্তে আপনি তাদের বিষ মিশ্রিত মিষ্টি কথার প্যাচে পড়ে পথভ্রষ্ট হয়ে যেতে পারেন। আপনার ঈমান নষ্ট হয়ে যেতে পারে। তাই সাহাবায়ে কিরাম সম্পর্কে কুরআন হাদীস কি বলে তাই দেখতে হবে। ইতিহাস কি বলছে শুধু তাই দেখলে চলবে না। কারণ ইসলামের ইতিহাস যারা লিখেছেন তারা হচ্ছে মানুষ। সেই মানুষ কিছু আছে মুসলমান কিছু শি'আ (কাফের) কিছু ইয়াহুদী কিছু ইউরোপিয়ান খৃষ্টান।

মুসলমানরাই তো মানুষের কাতারে পড়ে। আর অন্যান্য যারা আছে তারা আমাদের আদমশুমারীতে মানুষ হলেও আল্লাহ তা'আলার রেজিষ্টারে তাদেরকে মানুষও বলা হয়নি। বরং মানুষ থেকেও আরো কয়েক ডিগ্রী নিচে তাদেরকে রাখা হয়েছে। কুকুর ঘোড়া গুরু, ছাগল, বিড়াল ইত্যাদি সব জন্তুই তাদের মনীবকে চেনে এবং জানে। কুকুর তার দুনিয়াবী মনীবের জন্য সারারাত পাহারাদারী করে। আর মানুষ নামের যেই কলঙ্ক তার খালিক মালিককে চিনল না মুসলমান হল না, তারা এ কুকুর জানোয়ারের সমান হতে পারে না।

তাই আল্লাহ তা'আলা কুরআন শরীফের ৯ম পরায় সুরা আন আমের মধ্য এই ইয়াহুদী খৃষ্টান ও অন্যান্য কাফিরদেরকে জানোয়ারের কাতার থেকেও কয়েক ডিগ্রী নিচে নামিয়ে দিয়েছেন। (সূরা আনআম-১৭৯)

আল্লাহ যাদেরকে জানোয়ারের কাতারেও রাখলেন না, তাদেরকে আমরা খুব নামী দামী মনে করি। আর তাদের লিখিত মিথ্যা ইতিহাস গ্রন্থের রেফারেন্স দিয়ে আমাদের পণ্ডিতরা বলে যে অমুক ইয়াহুদী অমুক খৃষ্টান তার ইতিহাস গ্রন্থে এই লিখেছে। তো একদিকে জানোয়ারের চেয়েও নিকৃষ্ট আল্লাহ ও তার রাসূলের চির দুশমনেরা সাহাবায়ে কিরামের জীবনে কালিমা লেপন করে মিথ্যা বানোয়াট কথা দিয়ে লিখেছে এক ইতিহাস। অপরদিকে আল্লাহ ও তার রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম সাহাবায়ে কিরামের পবিত্রতা বর্ণনা করেছেন। তাদের প্রতি সন্তুষ্ট ও জান্নাতর অগ্রিম ভিসা তাদেরকে দিয়ে দিয়েছেন। তাহলে আমরা কোনটা গ্রহণ করব?

মুসলমান মাত্রই একথা বলতে বাধ্য যে, সে কুরআন হাদীসকেই গ্রহণ করবে। আমাদেরকে শরীআতের পক্ষ থেকে এটাই নির্দেশ দেয়া হয়েছে। সুতরাং কুরআনের সাথে সংঘর্ষপূর্ণ মানব রচিত ইতিহাসকে আমরা কোনক্রমেই গ্রহণ করতে পারি না। আজকে যারা সাহাবায়ে কিরামের দোষচর্চা করে নিজেদের ঈমানকে বরবাদ করছে, তারা নিজেরাও গোমরাহ হয়েছে অন্যদেরকেও গোমরা করার চেষ্টা করে যাচ্ছে তাদের এতটুকু ইলম নেই যে, মানব রচিত তাও আবার ইসলামের দুশমনের লিখিত ইতিহাস দিয়ে কুরআন সুন্নাহর মোকাবেলা করা যায় না। ইতিহাস ইতিহাসই। বাংলাদেশের ইতিহাস কয়েকজনে লিখেছে। কিন্তু যাচাই করলে দেখা যাবে যে

একজনের লেখার সঙ্গে আরেকজনের লেখার তেমন মিল নেই। অথচ এও সেদিনের তাজা ঘটনা। আর ঘটনা তো চৌদ্দ রকম ঘটেনি। ঘটনা তো একটাই। তাহলে এরকম ভিন্নতা ঘটল কিভাবে? এর দ্বারা বুঝা গেল যে, মানব রচিত ইতিহাসে বানোয়াট কথাবার্তা থাকেই। সুতরাং মানব রচিত ইতিহাস দিয়ে কুরআন হাদীসের মোকাবেলা করা সম্ভব নয়।

কুরআন হাদীস যখন সাহাবায়ে কিরামের সাফাই গাচ্ছে, তখন আমরা মিথ্যা ইতিহাস দিয়ে তাদের জীবন ইতিহাসকে কলঙ্কিত করতে পারি না। আমদের ঈমানের উপর আঘাত হানতে পারি না। আমরা যদি কুরআন হাদীস বাদ দিয়ে ইহুদী খৃষ্টানদের লেখা মিথ্যা ইতিহাসের উপর ভিত্তি করে সাহাবায়ে কিরামের সমালোচনা করি তাহলে আমাদের ঈমান কোথায় থাকবে? আল্লাহ যখন জিজ্ঞাসা করবেন যে, আমি সাহাবায়ে কিরামের ব্যাপারে অগ্রিম ক্ষমার ঘোষণা দিলাম। তাদের সমালোচনা করাকে হারাম করে দিলাম। সেখানে তুমি জীব জন্তুর চেয়ে নীচে যাদের স্থান সেই ইহুদী খৃষ্টানদের মিথ্যা ইতিহাস কেন বিশ্বাস করলে? তাদের ইতিহাস তোমার কাছে প্রাধান্য কেন পেল? আবার তুমি নিজেকে ঈমানদার দাবী করছ? কোথায় তোমার ঈমান? এইজন্য আমদেরকে খুব সতর্ক হতে হবে। কোথায় কাদের পিছনে দৌড়াচ্ছি আমরা।

আমাদের উপর সাহাবায়ে কিরামের হক ও অধিকার কি? তা আমাকে আপনাকে জানতে হবে। এবং তা পুঙ্খানুপুঙ্খ রূপে আদায় করতে হবে। তাদের হক আদায় করা ছাড়া একটা লোক ঈমানদার হয়ে যাবে। জাহান্নামে থেকে মুক্তি পেয়ে জান্নাত লাভ করবে? এর কোন অবকাশ নেই। আমাদের উপর সাহাবায়ে কিরামের মোট সাতটি হক রয়েছে।

(১) আমাদের উপর তাদের এক নম্বর হক হচ্ছে তাদের নাম শুনা মাত্রই পড়তে হবে "রাযিয়াল্লাহু আনহুম আজমাঈন"।

وَالسَّابِقُونَ الأَوَّلُونَ مِنَ الْمُهَاجِرِينَ وَالأَنصَارِ وَالَّذِينَ اتَّبَعُوهُم بِإِحْسَانٍ رَّضِيَ اللَّـهُ عَنْهُمْ وَرَضُوا عَنْهُ وَأَعَدَّ لَهُمْ جَنَّاتٍ تَجْرِي تَحْتَهَا الأَنْهَارُ خَالِدِينَ فِيهَا أَبَدًا ۚ ذَٰلِكَ الْفَوْزُ الْعَظِيمُ ﴿١٠٠﴾

অর্থঃ আল্লাহ তা'আলা তাদের সকলের উপর সন্তুষ্ট ও রাজী হয়ে গেছেন। অনেক লোকেরা শুধু সাহাবা আজমাঈন বলে থাকে। তাদের নামের শেষে রাযিয়াল্লাহু আনহুম এই দুআ পড়ে না। এটা পড়তে হবে। এটা পড়া আমাদের ঈমানী দায়িত্ব।(সুরাহ তাওবা আয়াত ১০০)

(২) তারা সকলে ন্যায় পরায়ণতা ও ইনসাফের উপর কায়িম ছিলেন এটা বিশ্বাস করতে হবে। বিশেষ করে নবী কারীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এর হাদীস বর্ণনা করার ক্ষেত্রে তারা একশ পার্সেন্ট সতর্কতা অবলম্বন করেছেন। সামান্য এদিক ওদিক না হয় সেদিকে সতর্ক সৃষ্টি রেখেছেন। রাসূলের নামে এক জাররা গলত কথাও তারা বরদাশত করেননি। (মুসলিম শরীফ ১/১০, হুকুকুল ইসলাম ৯, মেশকাত শরীফ পৃষ্ঠা ৩৬)

তারা রাসূলের কথাগুলো সারা দুনিয়ার পৌঁছানোর জন্য দেশ, খেশ, ঘর-বাড়ী, আল-আওলাদ ছেড়ে সফরে বের হয়েছেন। এটা মনে প্রাণে বিশ্বাস করতে হবে। আজকে মরক্কো, তিউনিসিয়া, সুদান, ইত্যাদি দূরবর্তী রাষ্ট্রসমূহে সাহাবায়ে কিরামের কবর পাওয়া যাচ্ছে। কেন? এর কারণ হল তাদেরকে রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম দায়িত্ব দিয়েছিলেন যে, তোমরা আমার কাছ থেকে যেই কথাগুলো শুনলে সেসব আমার কথাগুলো শুনেনি এমন লোকদের কাছে পৌঁছে দাও। আর পর্যায়ক্রমে তা আমাদের কাঁধে চলে এসেছে।

আমরা যাদেরকে হাদীস শুনাচ্ছি। তাদেরও দায়িত্ব হয়ে যাচ্ছে একথাগুলো অন্যদের কাছে পৌঁছানোর। এমনিভাবে পর্যায়ক্রমে চলতে থাকবে। এ দায়িত্ব শুধু আমাদের সাথে খাস নয়। আপনি চাকুরী নিয়ে বসে থাকবেন? আর হায়াত শেষে আজিমপুর গোরস্থানে চলে যাবেন এটা কাম্য নয়। বরং ব্যবসা আর চাকুরীর ফাঁকে ফাঁকে আপনাকে সামর্থ্য অনুযায়ী এই হাদীসগুলো, দীনের কথাগুলো যা আপনি শুনলেন আপনাকে সামর্থ্য অনুযায়ী এই হাদীসগুলো, দীনের কথাগুলো যা আপনি শুনলেন আপনাকে পৌছাতে হবে। এটা এই উম্মতের দায়িত্ব। সাহাবায়ে কিরাম রাযি. নবী পাকের সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম কথাগুলো উম্মতের নিকট পৌঁছিয়েছেন অত্যন্ত ন্যায়পরায়ণতা ও সত্যনিষ্ঠার সাথে। তাতে নিজেদের পক্ষ থেকে কোন কিছু বাড়াননি। আর তাদের ন্যায়পরায়ণতা রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম কর্তৃক একাধিক হাদীসে তাদেরকে উম্মতের সামনে সত্যের মাপকাঠি হিসাবে পেশ করার দ্বারা সুপ্রমানিত। (তিরমিযী শরীফ, ২/২২৫) সর্বযুগের হক্কানী উলামাদের ইজমাও একথার উপর যে, তারা সকলেই ন্যায়পরায়ণ ও সত্যের মাপকাঠি। (হাশিয়ায়ে আকীদাতুত্তাহাবী - ১৪৫, হাশিয়া শরহে আক্বায়িদ ১৪৯) তারা কোন মিথ্যা বলেননি। তারা যদি সত্যের মাপকাঠি না হতেন তবে আল্লাহ কক্ষনো সূরাহ ফাতিহার মধ্যে সীরাতে মুস্তাক্বীমের ব্যাখ্যায় তাদেরকে পেশ করতেন না।

শুধু সূরাহ ফাতিহা নয়। আরো বিভিন্ন আয়াতে (যেমনঃ

وَكَذَٰلِكَ جَعَلْنَاكُمْ أُمَّةً وَسَطًا لِّتَكُونُوا شُهَدَاءَ عَلَى النَّاسِ وَيَكُونَ الرَّسُولُ عَلَيْكُمْ شَهِيدًا ۗ وَمَا جَعَلْنَا الْقِبْلَةَ الَّتِي كُنتَ عَلَيْهَا إِلَّا لِنَعْلَمَ مَن يَتَّبِعُ الرَّسُولَ مِمَّن يَنقَلِبُ عَلَىٰ عَقِبَيْهِ ۚ وَإِن كَانَتْ لَكَبِيرَةً إِلَّا عَلَى الَّذِينَ هَدَى اللَّهُ ۗ وَمَا كَانَ اللَّهُ لِيُضِيعَ إِيمَانَكُمْ ۚ إِنَّ اللَّهَ بِالنَّاسِ لَرَءُوفٌ رَّحِيمٌ ﴿١٤٣﴾ সূরাহ বাকারার ১৪৩-

وَمَن يُشَاقِقِ الرَّسُولَ مِن بَعْدِ مَا تَبَيَّنَ لَهُ الْهُدَىٰ وَيَتَّبِعْ غَيْرَ سَبِيلِ الْمُؤْمِنِينَ نُوَلِّهِ مَا تَوَلَّىٰ وَنُصْلِهِ جَهَنَّمَ ۖ وَسَاءَتْ مَصِيرًا ﴿١١٥﴾ সূরাহ নিছা ১১৫-

كُنتُمْ خَيْرَ أُمَّةٍ أُخْرِجَتْ لِلنَّاسِ تَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَتَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنكَرِ وَتُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ ۗ وَلَوْ آمَنَ أَهْلُ الْكِتَابِ لَكَانَ خَيْرًا لَّهُم ۚ مِّنْهُمُ الْمُؤْمِنُونَ وَأَكْثَرُهُمُ الْفَاسِقُونَ ﴿١١٠﴾

সুরাহ আল-ইমরানের ১১০ নং আয়াতে)

কুরআনের বিভিন্ন জায়গায় আল্লাহ তা'আলা তাদেরকে সত্যের মাপকাঠি হিসেবে পেশ করেছেন। যেমন-২৬ পারার সূরাহ ফাতাহ এর মধ্যে আল্লাহ পাক তার রাসূলের সাথে সাহাবায়ে কিরামকেও পেশ করেছেন।

مُّحَمَّدٌ رَّسُولُ اللَّـهِ ۚ وَالَّذِينَ مَعَهُ أَشِدَّاءُ عَلَى الْكُفَّارِ رُحَمَاءُ بَيْنَهُمْ ۖ تَرَاهُمْ رُكَّعًا سُجَّدًا يَبْتَغُونَ فَضْلًا مِّنَ اللَّـهِ وَرِضْوَانًا ۖ سِيمَاهُمْ فِي وُجُوهِهِم مِّنْ أَثَرِ السُّجُودِ ۚ ذَٰلِكَ مَثَلُهُمْ فِي التَّوْرَاةِ ۚ وَمَثَلُهُمْ فِي الْإِنجِيلِ كَزَرْعٍ أَخْرَجَ شَطْأَهُ فَآزَرَهُ فَاسْتَغْلَظَ فَاسْتَوَىٰ عَلَىٰ سُوقِهِ يُعْجِبُ الزُّرَّاعَ لِيَغِيظَ بِهِمُ الْكُفَّارَ ۗ وَعَدَ اللَّـهُ الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ مِنْهُم مَّغْفِرَةً وَأَجْرًا عَظِيمًا ﴿٢٩﴾ (সুরাহ ফাতাহ, ২৯)

যদি তারা সত্যের মাপকাঠি না হতেন তাহলে রাসূলের সাথে সাহাবায়ে কিরামকেও কেন পেশ করা হল? আমি ইতিপূর্বে আরো বিভিন্ন আয়াত ও হাদীস পেশ করেছি যেখানে রাসূলের সাথে হকের/সত্যের মাপকাঠি হিসেবে আল্লাহ তা'আলা সাহাবায়ে কিরামকেও পেশ করেছেন। সুতরাং এ কথা দৃঢ়ভাবে বিশ্বাস করতে হবে যে, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম যেমন সত্যের মাপকাঠি, সমস্ত সাহাবায়ে কিরামও তেমন সত্যের মাপকাঠি।

(৩) তাদের সকলকে অত্যন্ত সম্মানের নজরে দেখতে হবে। সকল আম্বিয়া কিরামের আ. পরে তাঁরাই সবচেয়ে বেশী সম্মান পাওয়ার যোগ্য। অতএব আম্বিয়া কিরামের পরে সমস্ত মানবকুলের মধ্যে তাদেরকেই সবচেয়ে বেশী সম্মান করতে হবে। কেননা সমস্ত উম্মতের আমল যদি এক পাল্লায় রাখা হয় আর সাহাবায়ে কিরামের মধ্যে যিনি নবীজীকে এক মিনিটের জন্যও দেখেছেন। আর আমল যদি অপর পাল্লায় রাখা হয় তাহলে সেই সাহাবীর রাযি. পাল্লা ভারী হয়ে যাবে। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ইরশাদ করেছেন তোমরা আমার সাহাবীদের রাযি. সম্মান কর। (মুসান্নাফে আব্দুর রাজ্জাক, হাদীস নং-২০৭১০, ১১/৩৪১)

অপর এক হাদীসে নবীয়ে কারীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ইরশাদ করেন সর্বোত্তম মানুষ তারা যারা আমার যামানা পেয়েছে। আমার সাহাবী রাযি. হওয়ার সৌভাগ্য লাভ করেছে। এর পরে যারা সাহাবায়ে কিরামকে দেখেছে তারা। অর্থাৎ তাবেঈগণ হচ্ছেন দ্বিতীয় সারীতে। তারপরে যারা তাবেঈনদেরকে দেখেছেন তারা। (বুখারী শরীফ হাদীস নং-৬৪২৯, মুসলিম শরীফ হাদীস নং-২৫৩৩, হুকুকুল ইসলাম, ৯)

(৪) চতুর্থ দায়িত্ব হচ্ছে সাহাবায়ে কিরামকে মহব্বত করা। (বুখারী শরীফ হাদীস নং-৩৭৮৩, মুসলিম শরীফ হাদীস নং-১২২৯) পিতাকে মহব্বত করতে বলা হয়েছে যেহেতু তার মাধ্যমে আমার রূহানী অস্তিত্ব লাভ হয়েছে। তাহলে সাহাবায়ে কিরাম যাদের মাধ্যমে আমরা রূহানী অস্তিত্ব লাভ করেছি তাদেরকে কতটুকু মহব্বত করা দরকার।

সাহাবায়ে কিরাম যদি নবীজীর কথাগুলি সংরক্ষণ না করতেন আর জান-মালের কুরবানী করে পৃথিবীর আনাচে কানাচে উক্ত কথাগুলি ছড়িয়ে না দিতেন তাহলে আজ আমি আপনি মুসলমান হতে পারতাম না। হয় ইহুদী খৃষ্টান হতাম নয়ত হিন্দু হতাম। মোট কথা আজ আমরা যে আল্লাহর পরিচয় এবং ঈমানের মত মহা দৌলত লাভ করেছি তা এই সাহাবায়ে কিরামের কুরবানীর কারণেই হয়েছে। সুতরাং পিতার চেয়ে তাদেরকে বেশী সম্মান করতে হবে।

হাদীস শরীফে এসেছে, যে মুমিন হবে সে আমার সাহাবাদেরকে মহব্বত করবে। (বুখারী শরীফ হাদীস নং-৩৭৮৩) আর যে মুনাফিক হবে সে আমার সাহাবাদের প্রতি বিদ্বেষ রাখবে। আমরা সকলেই আমদের দিলের কাছে জিজ্ঞাসা করি যে সাহাবাদের বিরুদ্ধে আমাদের কোন অভিযোগ আছে কি না? তারপরে নিজেই ফায়সালা করি আমি মুমিন না মুনাফিক। যদি মুনাফিকী থাকে তাহলে তা দূর করতে হবে। যার দিলে সাহাবায়ে কিরামের মহব্বত থাকবে সে কখনো সাহাবাদের রাযি. সমালোচনা করবে না। রাসূলের মহব্বত যার অন্তরে আছে তার অন্তরে সাহাবাদের মহব্বত অবশ্যই থাকবে। সাহাবাদের সমালোচনা করব আবার রাসূল প্রেমিক হওয়ার দাবী করব এটা কখনো সম্ভব নয়। কেননা নবী কারীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ইরশাদ করছেন, তোমারা ততক্ষণ পর্যন্ত পরিপূর্ণ মুমিন হতে পারবে না যতক্ষণ না তোমার পিতা-মাতা, সন্তান-সন্ততি থেকে আমাকে অধিক মুহাব্বাত করবে। (বুখারী শরীফ হাদীস নং-১৫ মুসলিম শরীফ হাদীস নং-৭০) আর নবীজীর মহব্বতের দাবীদার হলে সাহাবাদেরকে অবশ্যই মহব্বত করতে হবে। এটি হল তাদের চার নম্বর হক।

(৫) পঞ্চম হক হচ্ছে তাদের অনুসরণ করতে হবে। কুরআনের বিভিন্ন আয়াত (যথা-

وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ آمِنُوا كَمَا آمَنَ النَّاسُ قَالُوا أَنُؤْمِنُ كَمَا آمَنَ السُّفَهَاءُ ۗ أَلَا إِنَّهُمْ هُمُ السُّفَهَاءُ وَلَـٰكِن لَّا يَعْلَمُونَ ﴿١٣﴾ فَتَلَقَّىٰ آدَمُ مِن رَّبِّهِ كَلِمَاتٍ فَتَابَ عَلَيْهِ ۚ إِنَّهُ هُوَ التَّوَّابُ الرَّحِيمُ ﴿٣٧﴾ (সুরাহ বাকারা, ৩৭ ও ১৩ নং আয়াত দ্রঃ)

এবং নবীজীর বিভিন্ন হাদীস দ্বারা একথা সুস্পষ্ট ভাবে বুঝে আসে যে, সাহাবায়ে কিরামের অনুসরণ-অনুকরণ জরুরী। আল্লাহ তা'আলা ইরশাদ করছেন আনসার ও মুহাজিরদেরকে যারা অনুসরণ করবে আল্লাহ তাদের উপর রাযি হয়ে যাবেন। (সূরাহ তাওবা ১০০)

وَالسَّابِقُونَ الْأَوَّلُونَ مِنَ الْمُهَاجِرِينَ وَالْأَنصَارِ وَالَّذِينَ اتَّبَعُوهُم بِإِحْسَانٍ رَّضِيَ اللَّـهُ عَنْهُمْ وَرَضُوا عَنْهُ وَأَعَدَّ لَهُمْ جَنَّاتٍ تَجْرِي تَحْتَهَا الْأَنْهَارُ خَالِدِينَ فِيهَا أَبَدًا ۚ ذَٰلِكَ الْفَوْزُ الْعَظِيمُ ﴿١٠٠﴾

এই আয়াতে স্পষ্টভাবে সাহাবীদের রাযি. অনুসরণ কথা বলা হয়েছে। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামও ইরশাদ করছেন, আমার সাহাবীদেরকে রাযি. অনুসরণ কর। তাদের মধ্যে যদি কোন বিষয়ে মত বিরোধ হয় এখতেলাফ হয় তবুও তাদের যে কোন দলের অনুসরণ করলে হেদায়েত পেয়ে যাবে। কেননা তাদের মধ্যে

যে মতভেদ হয়েছিল তা আমাদের মত গদি দখল করার জন্য নয়, পার্থিব কারণে নয়। যেমন নাকি জঙ্গে জামাল এবং সঙ্গে সিফফীনে হয়েছিল। উভয় দলেরই উদ্দেশ্য ছিল আল্লাহকে রাযি খুশি করা। (হুকুকুল ইসলাম-৯)

হযরত আলী রাযি. খলীফা হওয়ার পরে হযরত মুআবিয়া রাযি. তাকে বললেন, যারা হযরত উসমানকে শহীদ করেছে আপনি আগে তাদের নিকট থেকে কেসাস গ্রহণ করুন তাহলে আমি আমর লোকজন নিয়ে আপনার হাতে বাই'আত হব। আর হযরত আলী রাযি. বলছিলেন, আপনারা আগে আমার হাতকে মজবুত করুন তারপরে আমি হযরত উসমানের খুনের বদলা নেব। কেননা আমার গুরুত্বপূর্ণ পদে খারেজীরা রয়ে গেছে। তাদেরকে না হটিয়ে হযরত উসমানের বদলা নিতে গেলে তারা আমাকেই কতল করে ফেলবে। এই ছিল তাদের মতভেদের কারণ। অতঃপর অন্যান্য সাহাবায়ে কিরামের মধ্যস্ততায় এই বিষয়ের মীমাংসা হয়ে গেলেও সাবায়ী চক্রের ষড়যন্ত্রের কারণে তা নস্যাৎ হয়ে যায়। বুঝা গেল তাদের কারো সামনে দুনিয়া ছিল না। সুতরাং যে কোন দলকে ফলো করলে কামিয়াবী হাসিল হবে। বস্তুতঃ তাদের এই মতভেদ ছিল উম্মতের জন্য আল্লাহর রহমত স্বরূপ। যেমন নাকি চার ইমামের চার মাযহাবের বিষয়টি। কেউ বলছেন আস্তে আমীন বলতে হবে, আর কেউ বলছেন জোরে আমীন বলতে হবে। এখানে নিজের পক্ষ থেকে কিন্তু কেউ কিছু বলেন নি বরং প্রত্যেকের নিকট হাদীস আছে। যার নিকট যে হাদীস মজবুত মনে হয়েছে তিনি সেটাকে গ্রহণ করে সেই মত অবলম্বন করেছেন। এতে নবীজীর সমস্ত হাদীসের উপর আমল হয়ে যাচ্ছে। সমস্ত মুসলমানকে এই চার মাযহাবের কোন একটি মেনে চলতে হবে। মাযহাব চতুষ্টয়ের বাইরে চলার কোন অবকাশ নেই। এর উপরেই সকল উলামায়ে কিরামের ফাতওয়া।

যারা সিহাহ সিত্তার কিতাব যথা বুখারী, মুসলিম, আবু দাউদ প্রভৃতি কিতাব লিখে গেছেন তারাও কখনো একথা বলেননি যে, এই কিতাব বগলে রাখ আর পড়ে পড়ে আমল কর। এমনকি তারা নিজেরাও কিতাব মত না চলে চার ইমামের কোন একজনকে মান্য করেছেন।

সাহাবায়ে কিরামের ব্যাপারটাও ঠিক এরকম। আল্লাহ পাক জানতেন যে, নবীর মৃত্যুর পরে জঙ্গে জামাল হবে, জঙ্গে সিফফীন হবে, তারপরেও তাদেরকে অগ্রিম ক্ষমা করে দিয়েছেন। কেননা তিনি জানতেন যে তাদের এই লড়াই আমাকে রাযি-খুশি করার জন্যই হবে। পার্থিব কোন কারণে হবে না। সুতরাং তাদের সবকিছু মাফ। তাই তাদের অনুসরণ করা আমাদের জন্য জরুরী।

(৬) ছয় নম্বর দায়িত্ব হচ্ছে তাদের সমালোচনা না করা। সাহাবীদের রাযি. সমালোচনা করলে ঈমান থাকবে না। মুনাফিক হয়ে যেতে হবে। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ইরশাদ করেছেন তোমরা আমার সাহাবাদের সমালোচনা কর না। অন্য হাদীসে ইরশাদ হয়েছে আল্লাহকে ভয় কর, আল্লাহকে ভয় কর আমার মৃত্যুর

পর আমার সাহাবীদেরকে রাযি. গালি দিও না । তাদের সমালোচনা করো না। (বুখারী শরীফ হাদীস নং -৩৬৭৩, মুসলিম শরীফ হাদীস নং-২৫৪০)

আরেক হাদীসে বলা হয়েছে যখন তোমরা কাউকে দেখবে যে, সে আমার সাহাবীদের রাযি. সমালোচনা করছে তখন বলে দিও তোমার উপর আল্লাহর লা'নত হোক। অর্থাৎ আল্লাহর রহমতের মধ্যে তার কোন অংশ নেই। শুধু এই তিনটি হাদীসই নয় বরং আরো অসংখ্য হাদীস রয়েছে যেখানে কঠোর ভাবে নিষেধ করা হয়েছে সাহাবাদের সমালোচনা করার ব্যাপারে।

সাহাবায়ে কিরামের দ্বারা যদি কোন পদস্খলন ঘটে থাকে তাহলে তা প্রয়োজনের জন্যই হয়েছিল। তার মধ্যে আল্লাহ তা'আলার বিশেষ হিকমত ছিল। সুতরাং আপনার আমার কোন অধিকার নেই তাদের সেসব বিষয় নিয়ে সমালোচনা করার। মুখে তালা লাগিয়ে রাখতে হবে।

(৭) সপ্তম দায়িত্ব হল, যারা সাহাবাদেরকে মহব্বত করে তাদেরকে মহব্বত করা। আর সাহাবাদের প্রতি যারা বিদ্বেষ রাখে তাদের সাথে বিদ্বেষ পোষণ করা। এখানে তৃতীয় কোন পথ নেই। তৃতীয় পথ অবলম্বন করলে মুনাফিক হিসাবে গণ্য হতে হবে। নিরপেক্ষ থাকার কোন অবকাশ এখানে নেই। হয় আপনাকে আল্লাহ ও আল্লাহর রাসূলে পক্ষ নিতে হবে, যারা সাহাবাদের মহব্বত করে তাদেরকে মহব্বত করতে হবে আর যারা তাদের প্রতি বিদ্বেষ রাখে তাদের সাথে আপনাকে বিদ্বেষ রাখতে হবে। নিরপেক্ষ থাকা চলবে না। ইসলামে নিরপেক্ষতা নেই। যে কোন এক পক্ষ অবলম্বন করতে হবে। হাদীসে ইরশাদ হয়েছে, আল্লাহকে রাযি করার জন্য সাহাবাদেরকে ভালবাসা এবং যারা সাহাবাদের সমালোচনা করে তাদের সাথে বিদ্বেষ রাখা ঈমানের অঙ্গ।

সাহাবায়ে কিরামের এই সাতটি হক আমাদেরকে মুখস্থ রাখতে হবে এবং সেই অনুযায়ী আমল করতে হবে। আল্লাহ পাক আমাদেরকে তাওফীক দান করুন। আমীন।

সাহাবায়ে কিরাম রাযি. সম্পর্কে আহলুস সুন্নাহ ওয়াল জামা'আতের আক্বীদা

(ক) ইসলামী আক্বীদার প্রসিদ্ধ গ্রন্থ আল্-মুসামারায় স্পষ্ট ভাষায় উল্লেখ আছেঃ "কুরআন-হাদীস এবং নবীজীর খাঁটি সুন্নাতের উপর প্রতিষ্ঠিত ও খাঁটি মুসলিম সমাজভূক্ত সকলের তথা ইসলামের তেহাত্তর ফেরকার একমাত্র নাজাত প্রাপ্ত দল আহলুস সন্নাহ ওয়াল জামাআতের সর্ব সম্মত মতবাদ ও আক্বীদা সাহাবায়ে কিরাম রাযি. সম্পর্কে কুরআন ও হাদীসের আলোকে এই যে সমস্ত সাহাবী রাযি. গণকে দোষমুক্ত গণ্য করা ওয়াজিব-ফরজ তুল্য। তাদের প্রত্যেককে ভাল ও খাঁটি বলে বিশ্বাস করতে হবে। তাঁদের কাউকে দোষী মনে করা থেকে বিরত থাকতে হবে এবং তাদের শুধু গুণ চর্চা করতে হবে।

(খ) শরহে আক্বীদাতুত তাহাবিয়া তে পূর্বাপর ইমামগণের সর্বসম্মত আক্বীদা বর্ণনা করা হয়েছে এরূপে, "আমাদের কর্তব্য এই যে, আমরা সাহাবায়ে কিরামের রাযি. মধ্য হতে কারো গুন চর্চা ব্যতীত তাঁদের সম্পর্কে কোন বিরূপ বাক্য উচ্চারণ করব না। সাহাবী রাযি. গণের প্রতি শ্রদ্ধা ভালবাসা রাখাই ধর্ম, ঈমান ও আল্লাহ প্রেমের পরিচয় এবং তাদের প্রতি বিদ্বেষ পোষণ করা কুফরী, মুনাফেকী ও সীমা লঙ্ঘনের অন্তর্ভুক্ত। (পৃষ্ঠা নং-১৪৫)

(গ) ইমাম আবু হানীফা রহ. স্বীয় প্রসিদ্ধ শরহে ফিকহে আকবার গ্রন্থে দ্ব্যর্থহীন ভাবে ঘোষণা করেছেন আমাদের নৈতিক দায়িত্ব এই যে, আমরা রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এর সকল সাহাবীর রাযি. শুধু গুণ চর্চাই করব। কোন সাহাবীর রাযি. দোষ চর্চা করার অধিকার আমাদের নেই।

(ঘ) ইমাম আবু জুর'আ রহ. বলেন- "যখন তুমি কোন ব্যক্তিকে সাহাবায়ে কিরামের রাযি. বিরূপ সমালোচনা করতে দেখবে তখন নিশ্চয়ই মনে করবে যে, সে যিন্দিক (তার ঈমান নেই), কারণ রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম সত্য কুরআন সত্য এবং তিনি যা কিছু নিয়ে এসেছেন তাও সত্য। আর এসমস্ত আমাদের নিকট যথাযথভাবে সাহাবীগণই রাযি. পৌছিয়ে দিয়েছেন। তাদেরই সাক্ষ্য দ্বারা আমরা এসব সত্য বলে জানতে পেরেছি।

যারা সাহাবীগণের রাযি. দোষ চর্চা করবে, বস্তুত তারা তো কুরআন হাদীসের সাক্ষীগণকে বাতিল বলে ঘায়েল করার মাধ্যমে কুরআন ও সুন্নাহকেই বাতিল ঘোষণা করা এবং তাদের উপর গোমরাহ ও যিন্দিক হওয়ার হুকুম প্রয়োগ করা অধিক সমীচীন। (দুররাতুল মুযী'আ)

(ঙ) তাফসীর ইবনে কাসীরে আছে "ধ্বংস ঐ ব্যক্তির জন্য, যে সাহাবায়ে কিরামের সাথে দুশমনী রাখে অথবা তাদেরকে বা তাদের মধ্যে হতে কাউকে কটাক্ষ করে গালি দেয়। এ লোকগুলোর কুরআনে কারীমের উপর ঈমান কিভাবে থাকতে পারে? কারণ তারা এমন সব ব্যক্তিত্ব সম্পন্ন লোকদের সমালোচনা করছে বা দোষ চর্চা করছে যাদের উপর আল্লাহ তা'আলার সন্তুষ্টি ও রাজী হওয়ার ঘোষণা কুরআনে উচ্চারিত হয়েছে।

(চ) আবুল হাসান মাইমুনী রহ. বলেন, আমি ইমাম আহমদ রহ. কে বলতে শুনেছি যে মানুষের কি হল তারা হযরত মুআবিয়ার রাযি. সমালোচনা করে? আল্লাহর নিকট আমরা এর থেকে পানাহ চাই। তারপরে আমাকে বললেন- হে আবুল হাসান যখন তুমি কাউকে দেখবে যে সে সাহাবায়ে কিরামের রাযি. সমালোচনায় লিপ্ত তখন তার ঈমান ও ইসলামকে সন্দেহযুক্ত মনে করবে। অর্থাৎ মনে করবে যে, সাহাবীগণের রাযি. দোষচর্চার কারণে তার ঈমান ও ইসলাম বরবাদ হয়ে যাওয়ার পর্যায়ে রয়েছে। (ছারিমুল মাসলুল)

আহলুস সুন্নাত ওয়াল জামাআতের পূর্বসূরি মাশায়িখগন সাহাবীগণের রাযি. ব্যাপারে এ নীতি ও আক্বীদা তাঁদের অন্ধ ওকালতীর বশবর্তী হয়ে গ্রহণ করেননি। বরং তাঁদের সামনে তো মহানবীর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম সেই সাবধান বাণী ছিল যার অর্থ নিম্নরূপঃ

সাবধান! আমার সাহাবীগণের রাযি. ব্যাপারে আল্লাহকে ভয় কর, সাবধান! আমার সাহাবীগণের রাযি. ব্যাপারে আল্লাহকে ভয় কর। খবরদার খবরদার!! আমার পরে আমার সাহাবীগণকে রাযি. তোমরা সমালোচনার পাত্রে পরিণত করো না। অধিকন্তু যে কেউ আমার সাবাহীগণকে ভালবাসবে, বস্তুতঃ সে ভালবাসা আমার প্রতি তাঁদের ভালবাসার কারণেই হবে। আর যে কেউ তাঁদের প্রতি খারাপ ধারণা পোষণ করবে, বস্তুতঃ সেই খারাপ ধারণা আমার প্রতি খারাপ ধারণা পোষণ করার কারণেই হবে। আর যে কেউ তাদেরকে আঘাত দিবে সেই আঘাত আমাকেই দেয়া হবে। আর যে আমাকে আঘাত দেয় সে যেন আল্লাহকে আঘাত দিল। আর যে আল্লাহকে আঘাত দিবে, অনতিবিলম্বেই আল্লাহ তাকে পাকড়াও করবেন। (মুসনাদে আহমদ হাদীস নং-২০৬০৩, তিরমিযী -২/২২৫)

এরূপ আরো অনেক স্পষ্ট হাদীস বিদ্যমান রয়েছে যেগুলোর আলোকে একমাত্র হক ও নাজাত প্রাপ্ত আহলুস সুন্নাহ ওয়াল জামাআতের আক্বীদা হচ্ছে সাহাবায়ে কিরাম রাযি. গণের কোনরূপ সমালোচনা করা বা তাদের মধ্য হতে কারো প্রতি ঐতিহাসিক বর্ণনার উপর ভিত্তি করে সামান্যতম বিরূপ ধারণা পোষণ করা সম্পূর্ণরূপে নিষিদ্ধ। কারণ তাদের সমালোচনা ও দোষ চর্চার উর্ধ্বে হওয়া কুরআন ও হাদীস দ্বারা অকাট্যভাবে প্রমাণিত। নিছক ইতিহাসের উপর ভিত্তি করে তাদের বিরুদ্ধাচরণ করা নেহায়েত বোকামী। এ জন্য যে, ইসলামের নামে বহু ইতিহাস ইয়াহুদী, নাসারা ও শিয়ারা লিখেছে এবং তা প্রসিদ্ধি লাভ করেছে, তাই সে সব মিথ্যা ও গর্হিত ইতিহাসের উপর বিশ্বাস স্থাপন করাই জায়িয নয়। তার ভিত্তিতে সাহাবীগণের রাযি. মর্যাদাহানি করা তো আরো জঘন্য।

আহলুস সুন্নাহ ওয়াল জামাআতের আক্বীদা এও যে, সাহাবায়ে কিরাম রাযি. নবীগণের ন্যায় মাসুম ও নিষ্পাপ নন বটে তবে মানবীয় দুর্বলতার কারণে তাদের দ্বারা কোন সময়ে কোন ভুল ত্রুটি হয়ে থাকলেও তাঁদের মহান ত্যাগের কারণে সেগুলো আল্লাহ তা'আলা মাফ করে দিয়েছেন। কুরআন শরীফের অসংখ্য আয়াতে স্বয়ং আল্লাহ তা'আলা সকল সাহাবীগণের রাযি. প্রতি সাধারণ ক্ষমা ও সন্তুষ্টি ঘোষণা করেছেন। তাদের কারো দ্বারা দু একটি ভুল হয়ে থাকলেও সামগ্রিকভাবে তারা নিঃসন্দেহে সত্যের মাপকাঠি। কারণ সত্যের মাপকাঠির অর্থ হল দীনের ব্যাপারে তারা যা বলেছেন বা করেছেন তা সবই গ্রহণযোগ্য এবং উম্মতের জন্য দৃষ্টান্ত ও আদর্শ।

কুরআন হাদীসের দৃষ্টিতে তাদের কারো কোন কাজ উম্মতের নজরে ভুল প্রমাণিত হলে শুধু কাজটি উম্মতের জন্য গ্রহণযোগ্য হবে না বটে, তবে সে কাজের কারণে তাদের সমালোচনা কখনও উম্মতের জন্য বৈধ হবে না। সুতরাং কোন সাহাবীর রাযি. অন্যায়ের বিরূপ মন্তব্য, সমালোচনা বা দোষচর্চার অধিকার আমাদের নেই। এমনিতে তো কোন সাধারণ মুসলমানও যদি জঘন্যতম কোন পাপ কাজ করে খাঁটি ভাবে তওবা করে তবে এরপর তাকে তিরষ্কার করা ও তার সমালোচনা করা হাদীসে নিষিদ্ধ রয়েছে। সেখানে স্বয়ং আল্লাহ তা'আলা কর্তৃক ক্ষমা ঘোষণার পর কোন সাহাবীর রাযি. কোন গুনাহের কাজের সত্য সমালোচনা করাও বৈধ নয়। আর সাবায়ী, খারেজী, শিয়া ও রাফিজীদের মিথ্যা অপবাদ সম্বলিত ইতিহাসের উপর ভিত্তি করে যদি কোন সাহাবীর রাযি. মিথ্যা সমালোচনা করা হয় তাহলে তা যে কত বড় জঘন্য পাপাচার ও ঈমান হননকারী কাজ হবে তার আর বলার অপেক্ষা রাখে না।

বস্তুতঃ মুসলমানদের পরম শত্রুএবং তাদের ক্ষতি সাধনের চেষ্টায় লিপ্ত আব্দুল্লাহ বিন সাবা কর্তৃক সৃষ্ট খারেজী, শিয়া ও রাফিজী দল মুসলমানদের মাঝে কেলেঙ্কারি সৃষ্টি করে পার্থিব ক্ষতি সাধনের পর সাহাবীগণের রাযি. দোষ চর্চার দ্বার উন্মুক্ত করে মুসলমানদের দীন, ঈমান ও ইসলামের ক্ষতি সাধানের জন্য অধিক তৎপরতা অবলম্বন করেছে। তারা পুণ্যাত্মা সাহাবী রাযি. গণের নামে অসংখ্য মিথ্যা অপবাদ গড়েছে।

ঐ সকল অপবাদের প্রভাবে যারা সাহাবীগণের রাযি. প্রতি বৈরী ভাবাপন্ন হয় তারা বস্তুতঃ মুনাফিক আব্দুল্লাহ বিন সাবা ও তার খারিজী দলের সঠিক ইতিহাস সম্বন্ধে জ্ঞাত নয়। তারা শুধু ঐ মুনাফিক দলের অপপ্রচার ও বিকৃত মিথ্যা ইতিহাসগুলোই শুনতে পেয়েছে। সত্য ও সঠিক ইতিহাস উদ্ধার পূর্বক ঐ মিথ্যা ইতিহাস খণ্ডন করতে পারে সে পরিমাণ পর্যাপ্ত লেখাপড়া ও গবেষণার পুঁজি তাদের নেই। বরঞ্চ তাদের অনেকেরই এরূপ গবেষণা করার মত আদৌ কোন যোগ্যতা ও ক্ষমতা নেই । কিন্তু সেই অযোগ্যতা ও অদক্ষতা সত্ত্বেও তারা এ ব্যাপারে অনধিকার চর্চা করে বড় অপরাধী গণ্য হয়েছে। তাই সেই ক্ষমতার কারণে তাদেরকে মোটেই ক্ষমা-যোগ্য গণ্য করা হবে না।

ঈমানের দাবী ও তাগিদ এটাই ছিল যে আসমাউর রিজাল ব্যতীত অন্যান্য সকল ইতিহাস, যা শুধু বর্ণনার সমাহার, যে বর্ণনার উপর নির্ভরশীল কোন সাক্ষ্য প্রমাণ নেই সেই ইতিহাস দ্বারা সাহাবীগণের রাযি. ন্যায় পবিত্রাত্মা মনীষীগণের প্রতি দোষারোপ করার প্রশ্নও উঠে না। যেহেতু একদিকে স্বীয় আল্লাহ পাক সাহাবীগণকে রাযি. সাধারণ ক্ষমা প্রদর্শন করে তাদের প্রতি রেজামন্দীর ঘোষণা দিয়েছেন। পাশাপাশি হযরত রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ও সাহাবীগণের রাযি. প্রতি দোষারোপ করা হতে বারণ করে দিয়েছেন । এতদ্বভিন্ন সাহাবীগণ রাযি. রাসূলের

সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম পরশ দৃষ্টিতে গড়া ছিলেন। এই সত্য ও বাস্তবতার মর্যাদা ইতিহাস অপেক্ষা বহু ঊর্ধ্বে।

ইতিহাস সত্য ও মিথ্যায় মিশ্রিত থাকে। ইতিহাস আমার গ্রহণ করি না এমন নয়, কিন্তু যে ইতিহাস সাহাবীদের রাযি. মত স্পর্শকাতর ব্যক্তিগণের সঙ্গে জড়িত সেই ইতিহাসের আলোচনা করতে গিয়ে ইতিহাসের ময়দানে সুগভীর ঘোষণা ও সবিশেষ দূরদর্শিতা আবশ্যক। সেই সৌভাগ্য যার হবে তিনি অবশ্যই নবীজীর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম প্রতিটি সাহাবীর রাযি. নৈতিক চরিত্রকে পাক-পবিত্রই দেখতে পাবেন।

পক্ষান্তরে সেই সৌভাগ্য হতে বঞ্চিত লোকদের দীন ঈমানের জন্য রক্ষা কবচ ব্যবস্থা এই যে, সাহাবীগণের রাযি. মর্যাদা সম্পর্কে পবিত্র কুরআনে যে বর্ণনা রয়েছে, তার পরিপন্থী কোন ইতিহাস বা দুর্বল সনদের হাদীস আকারের কোন কথাও গ্রহণ না করা। বিশেষতঃ যখন মুসলমানদের চরম শত্রু আব্দুল্লাহ বিন সাবা ও তার মুনাফিক গোষ্ঠী মুসলমানদের ঈমান ও ঐক্যের মধ্যে ক্ষতি সাধনের উদ্দেশ্যে সাহাবীগণের রাযি. ইতিহাস বিকৃত করেছে মিথ্যা, অপবাদ ও জাল অপপ্রচারকে ইতিহাস ও হাদীসের রূপ দান করেছে, সেক্ষেত্রে তো এ ব্যাপারে আরো সচেতনতা অবলম্বনই অপরিহার্য হয়ে পড়ে।

উল্লেখিত আক্বীদার আলোকে মুসলমান কোন ব্যক্তি মহানবীর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম কোন একজন সাহাবীকে রাযি. দোষারোপ করে বা তার সমালোচনা করে কোন বাক্য উচ্চারণ করলে বা লিখলে অথবা কোন সাহাবীর রাযি. ব্যাপারে মনে বিরূপ ভাব পোষণ করলে সে উম্মাতে মুহাম্মাদিয়ার ৭৩ ফিরকার মধ্যে একমাত্র হক ও নাজাতপ্রাপ্ত দল আহলুস সুন্নাহ ওয়াল জামাআতের অন্তর্ভুক্ত থাকতে পারবে না। বরং আহলুস সুন্নাহ ওয়াল জামা'আত হতে বহির্ভুক্ত হয়ে অবশিষ্ট ৭২ দলের এমন কোনটির মধ্যে গণ্য হবে যাদের কোন কোনটি চির জাহান্নামী আর কোন কোনটি দীর্ঘ কালের জন্য জাহান্নামী। এরূপ কোন ব্যক্তির সাথে মুসলমান পুরুষ ও মহিলার বিবাহ দুরস্ত নয় এবং এরূপ ব্যক্তির ইমামতিতে মুসলমানদের নামাযও শুদ্ধ হবে না। এটাই শরী'আতের চূড়ান্ত সিদ্ধান্ত।

এ ব্যাপারে আহলুস সুন্নাহ ওয়াল জামাআতের অন্তর্ভুক্ত চার মাযহাবের ইমামগণের মধ্যে অন্যতম ইমাম শাফিয়ী রহ. স্বীয় সংকলিত হাদীস গ্রন্থে বিস্তারিত সনদসহ মহানবীর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম অত্যন্ত সুস্পষ্ট ও দ্ব্যর্থহীন হাদীস উল্লেখ করেছেন। যার হুবহু শাব্দিক অর্থ নিম্নরূপঃ রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেন-

"আল্লাহ তা'আলা আমাকে নবীগণের মাঝে সর্বশ্রেষ্ঠ রূপে মনোনীত করেছেন। আমার সাহাবীগণকেও রাযি. নবীগণের পর সমগ্র মানব জাতির মধ্যে শ্রেষ্ঠরূপে মনোনীত

করেছেন। এবং তাদেরকে আমার এত ঘনিষ্ঠ বানিয়েছেন যে, আমার শ্বশুর জামাতা সব তাঁদের মধ্য হতেই বানিয়েছেন। আর তাঁদেরকে দীন প্রতিষ্ঠায় আমার সাহায্যকারী বানিয়েছেন। হে আমার ভবিষ্যৎ উম্মত সকল! তোমরা সতর্ক থেকো। আমার মৃত্যু পরবর্তী যুগে এমন এক শ্রেণীর লোকের আবির্ভাব ঘটবে যারা আমার সাহাবীগণের রাযি. প্রতি সম্মান হানিকর যথা বলবে। সাবধান! সাবধান! এ শ্রেণীর লোকদের মেয়ে তোমরা বিবাহ করবে না। এবং তাদের নিকট তোমাদের মেয়েদের বিবাহ দিবে না। এরূপ লোকদের জন্য তোমরা দুআও করবে না। নিশ্চিতরূপে জেনে রেখো এই শ্রেণীর লোকদের উপর আল্লাহ্‌র অভিসম্পাত বর্ষিত হতে থাকে।

এযাবৎ যারা না জেনে হযরত উসমান রাযি. বা হযরত মুআবিয়া রাযি. বা অন্য কোন সাহাবী রাযি. সম্পর্কে বিরূপভাবে পোষণ করার জঘন্য গুনাহে লিপ্ত ছিল তাদের অবিলম্বে তাওবা করা উচিত। যদি তারা কোন লোক সমাজে বা কোন ইতিহাসের ভিত্তিতে বা নিজ থেকে প্রত্যক্ষ বা পরোক্ষভাবে পত্র পুস্তকে কোন সাহাবী রাযি. সম্পর্কে কোনরূপ সমালোচনা বা দোষ চর্চা করে থাকে তবে তাদের তাওবা পরিপূর্ণ হওয়ার জন্য সেই লোক সমাজ এবং সেই সকল পত্র পুস্তকের মধ্যে ব্যাপকভাবে উক্ত বিষয় প্রত্যাহার পূর্বক বিবৃতি প্রদান ও এতদসম্পর্কিত সহীহ আক্বীদার ঘোষণা করা জরুরী। তারা যদি তাওবা করে সরল পথে ফিরে আসে তাহলে তো ভাল কথা। অন্যথায় তাদের থেকে সব রকমের সম্পর্ক ছিন্ন করা ও তাদেরকে সামাজিকভাবে বয়কট করা সকল মুসলমানের উপর ওয়াজিব।

দীনের জন্য সাহাবায়ে কিরামের রাযি. আত্মবিসর্জন

ঐ সকল মহামনীষীগণকে সাহাবা বলা হয় যারা ঈমানের সাথে এক মুহূর্তের জন্য হলেও হুজুর পাক সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এর দীদার লাভ করেছেন এবং হুজুর পাক সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এর সাহচর্যের সৌভাগ্য অর্জন করেছেন। আর ঈমানের উপরেই মৃত্যুবরণ করেছেন। (বুখারী শরীফ ১-৫১৫/ লুমআত)

সাহাবায়ে কিরামের জামা'আত মহামানবের এমন একটি জামা'আত-যাঁদের গঠনকারী মু'আল্লিম (শিক্ষক) ছিলেন স্বীয় রাসূলে পাক সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম, তাঁদের তা'লীম ও তরবিয়্যতের নেগরানী সরাসরি ওহীয়ে ইলাহীর মাধ্যমে আল্লাহ রাব্বুল আলামীন সম্পন্ন করেছেন।

তাদের শিক্ষাজীবন মেয়াদ ছিল দীর্ঘ ২৩ বৎসর । স্বীয় মহান রাব্বুল আলামীন তাঁদের পরীক্ষক এবং পূর্ণ কামিয়াবীর সনদ দাতা ছিলেন। আল্লাহ পাক তাঁদের সকলের উপরই রাজী হওয়ার সু-সংবাদ দিয়েছেন এবং কিয়ামত পর্যন্ত আগত উম্মতের দীন ও দুনিয়ার কামিয়াবী হাসিলের জন্য তাঁদেরকে নমুনা ও সত্যের মাপকাঠি হওয়ার ঘোষণা করেছেন। সাথে সাথে তাঁদের প্রতি মুহাব্বাত ভক্তি শ্রদ্ধা ও প্রশংসাকে ঈমানের অংশ হিসেবে ঘোষণা করেছেন। তাদের প্রতি যে কোন ধরণের বিরূপ ধারণা

সমালোচনা বা তাঁদের মর্যাদার পরিপন্থী যে কোন আলোচনাকে ঈমান বিধ্বংসী ও রাসূলের সাথে দুশমনীর সমতুল্য ঘোষণা করেছেন। (ইবনে মাজাহ)

উম্মতে মুহাম্মাদীর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম সর্বশ্রেষ্ঠ ব্যক্তিত্ব হযরত আবু বকর সিদ্দীক রাযি. যখন বাইতুল্লাহ শরীফে প্রকাশ্যে দীনের দাওয়াত পেশ করলেন তখন কাফিররা চতুর্দিক থেকে হযরত আবু বকর রাযি. এবং অন্যান্য মুসলমানগণের উপর আক্রমণ শুরু করল। হযরত আবু বকর রাযি.কে তারা বেদম মারধর করল। তাঁকে পদদলিত করল। কাফির উতবা বিন রবী'আ তাঁকে স্বীয় জুতা দ্বারা মারতে ও পেটাতে লাগল। জুতার আঘাতে তাঁর চেহারায় যখম হয়ে গেল। সে হযরত আবু বকরের পেটের উপর দাঁড়িয়ে লাফালাফি করতে লাগল। তিনি এত বেশি পরিমাণ যখম হলেন যে, তাঁর নাক ও চেহারা মুবারক চেনাই যাচ্ছিল না। তখন তাঁর অবস্থা এমন শোচনীয় হয়ে পড়েছিল যে, তার বংশধরগণ আশংকা করেছিল যে, আবু বকর রাযি. যদি মরে যান উতবা বিন রবীআকে আমরা হত্যা করে ফেলব। (হায়াতুস সাহাবা ১-২১৫)

হযরত আবু বকর রাযি. এর ন্যায় অন্যান্য বহু সংখ্যক সাহাবা এই দীনী দাওয়াতের জন্য মার খেয়েছেন। সীমাহীন কষ্ট বরদাশত করেছেন। যখম হয়েছেন। ক্ষুধা ও পিপাসার কষ্ট সহ্য করেছেন। নানাবিধ তাকলীফ বরণ করেছেন। এমনকি অনেককে এই পথে শাহাদাতও বরণ করতে হয়েছে। (বুখারী ২-৫৮৫)

এমনিভাবে বিখ্যাত সাহাবী হযরত বিলাল হাবশী রাযি. ইসলাম গ্রহণ করার অপরাধে কঠিন হতে কঠিনতম নির্যাতন আর নিপীড়নের শিকার হয়েছেন। তিনি চরম মুসলিম বিদ্বেষী উমাইয়া বিন খলফের ক্রীতদাস ছিলেন। এ অবস্থায় সেই পাষাণ হৃদয় উমাইয়া তাঁকে বলত হয়ত তুমি এভাবে ছটফট করে মৃত্যু বরণ কর না হয় বাঁচার আশায় ইসলাম ত্যাগ কর। এই মর্মান্তিক অবস্থায়ও তিনি মুখে উচ্চারণ করেছেন 'আহাদ' 'আহাদ' অর্থাৎ একমাত্র আল্লাহই আমার মা'বুদ। আমার জীবন-মরণ তাঁরই জন্য। আরবের মরুভূমিতে গ্রীষ্মের দুপুরে উত্তপ্ত বালুকারাশির উপর তাঁকে চিৎ করে শুইয়ে তাঁর বুকের উপর প্রচণ্ড পাথর চাপিয়ে দেয়া হত, যাতে তিনি নড়াচড়া না করতে পারেন। রাত্রি বেলা লোহার শিকলে হযরত বিলাল রাযি.কে আবদ্ধ করে পিটানো হত এবং পরের দিন ঐ ক্ষত-বিক্ষত শরীরকে মরুভূমির উত্তপ্ত বালুর উপরে রেখে এমনভাবে নির্যাতন করা হতো, যেন তিনি সেই অবস্থায় ইসলাম ছেড়ে দেন, অথবা মারা যান। পালাক্রমে তাঁকে একাধিক শক্তিশালী কাফির পেটাতে থাকত। একবার উমাইয়া আবার আবু জেহেল এরপর অন্যরা। এমনিভাবে তাঁকে শাস্তি দিত। কিন্তু এরপরও তাঁর মুখে আল্লাহর নাম জারী থাকত। মক্কার দুষ্ট ছেলেদের হাতে তাঁকে সোপর্দ করা হত। মক্কার অলিতে গলিতে তাঁকে টানা হেঁচড়া করে সারা শরীর যখম করা হত। কিন্তু কোন বাধাই তাকে আল্লাহর দীন থেকে বিরত রাখতে পারেনি।

এমনিভাবে ইসলামের জন্য বিশ্বে যারা অকথ্য নির্যাতন বরণের নজীর রেখেছেন, হযরত খাব্বাবও রাযি. ছিলেন তাঁদের একজন। ইসলামের প্রাথমিক পর্যায়ে পাঁচ ছয়

জন সাহাবীর রাযি. পরই তিনি ইসলাম গ্রহণ করেন। তাই তাঁকে দীর্ঘদিন নির্যাতন ভোগ করতে হয়েছে। অধিকাংশ সময় তাঁকে মরুভূমির উত্তপ্ত বালুকার উপর চিৎ করে শুইয়ে রাখা হত। তাছাড়া লোহা পুড়িয়ে তাঁর শরীরে দাগ দেয়া হত। যদ্দরুন পিঠ ও কোমরের গোশত পর্যন্ত গলে গলে খসে পড়ত।

হযরত উমর রাযি.-এর খিলাফতকালে তিনি একবার খাব্বাব রাযি.-কে জিজ্ঞাসা করলেন ইসলামের খাতিরে আপনাকে কি কি নির্যাতন ভোগ করতে হয়েছে?

তিনি আরজ করলেন-খলীফাতুল মুসলিমীন! আপনি আমার কোমরটা দেখুন। হযরত উমর রাযি. তাঁর কোমর দেখেই চম্‌কে উঠে বললেন-এমন কোমর তো কোন সময় দেখিনি। তিনি বললেন-আগুনের জ্বলন্ত কয়লার উপর আমাকে রেখে টানা হেঁচড়া করা হত, ফলে আমার কোমরের গোশত গলে গলে আগুন নিভে যেত। এই ছিল সাহাবায়ে কিরাম রাযি.-এর কুরবানী ও ত্যাগ স্বীকারের বাস্তব চিত্র।

এ জাতীয় দুই একটা ঘটনা নয় হাজার হাজার ঘটনা ঘটেছে। তাঁদের কুরবানীর ফলে আজ আমরা দীন পেয়েছি।

হযরত আনাস বিন নজর রাযি. ইসলামের প্রথম যুদ্ধে অর্থাৎ বদরের যুদ্ধে শরীক হতে পারেননি। তিনি সর্বক্ষণ এই বলে অনুতাপ করতেন-আফসোস! আমি ইসলামের সর্বপ্রথম আজীমুশ্‌ শান জিহাদে শরীক হতে পারলাম না।

তাই তিনি প্রতিজ্ঞা করেছিলেন যে, আবার যদি কোন জিহাদের সুযোগ আসে, তাহলে প্রাণ ভরে জিহাদ করব এবং আল্লাহ রাব্বুল আলামীন দেখে নিবেন যে, ইসলামের জন্য আমি কেমন কুরবানী করি। (বুখারী)

হঠাৎ একদিন উহুদ যুদ্ধের দামামা বেজে উঠল। উহুদ যুদ্ধে প্রাথমিক পর্যায়ে মুসলমানদের জয় হওয়ার পরও একটি মাত্র ভুলের দরুন যখন পরাজয় 'আসন্ন ছিল, মুসলিম বাহিনী এদিক ওদিক ছুটাছুটি করতে লাগল। ইতিমধ্যে হযরত আনাস বিন নজর রাযি. হযরত সা'আদ ইবনে মা'আজ রাযি. কে সম্মুখ দিক হতে আসতে দেখে জিজ্ঞাসা করলেন-হে সা'আদ! তুমি কোথায় যাচ্ছ? তিনি বললেন, আল্লাহর কসম! উহুদ পাহাড়ের দিক হতে বেহেশতের খুশবু আসছে। এই বলে তিনি উন্মুক্ত তরবারী হাতে করে কাফিরদের ভীড়ের ভিতর ঢুকে পড়লেন এবং বীর-বিক্রমে জিহাদ করতে করতে শাহাদত বরণ করলেন। শাহাদাতের পর দেখা গেল-শত্রুর অস্ত্রাঘাতে তাঁর শরীর চালুনীর মত ক্ষত বিক্ষত হয়ে গেছে এবং আশিটিরও বেশি তরবারীর আঘাত তাঁর শরীরে বিদ্ধ হয়েছে। যদ্দরুন তাঁকে চেনা যাচ্ছিল না। তাঁর ভগ্নি অঙ্গুলীর কর দেখে তাঁকে চিনতে পেরেছিলেন। তাঁর শানে এই আয়াত নাযিল হয়েছে। "মুসলমানদের মধ্যে এমন পুরুষবর্গও রয়েছে, যাঁরা আল্লাহর সাথে কৃত অঙ্গীকার অক্ষরে অক্ষরে পূর্ণ করে গিয়েছে।"

মুতার যুদ্ধে রাসূলে পাক সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তিন সহস্র সৈন্যের একটি বাহিনী হযরত যায়েদ বিন হারিসার রাযি. নেতৃত্বে পাঠালেন । তিনি তাদেরকে যাত্রা কালে এই বলে ওসীয়ত করেন-যদি যায়েদ শহীদ হয়ে যায়, তাহলে জাফর বিন আবু তালিব সেনাপতি নিযুক্ত হবেন। তিনি যদি শহীদ হয়ে যান, তাহলে আব্দুল্লাহ বিন রাওয়াহা সেনাপতি নিযুক্ত হবেন। তিনিও যদি শাহাদাত বরণ করেন, তাহলে সকলে মিলে একজনকে সেনাপতি নিযুক্ত করে নিবেন। এই বলে সৈন্যবাহিনী মুতার উদ্দেশ্যে রওয়ানা করিয়ে দিলেন।

ওদিকে মুসলিম বাহিনীর অভিযানে কথা শুনে মুতার শাসনকর্তা দুই লক্ষাধিক সৈন্যের বিরাট সমাবেশ ঘটাল এবং যুদ্ধের জন্য তাদেরকে সুসজ্জিত করল।

কিছুদূর অগ্রসর হওয়ার পর মুসলিম বাহিনী তাদের এ অবস্থা জানতে পেরে একটু চিন্তিত হলেন এবং রাসূলে আকরাম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-কে এ ব্যাপারে অবহিত করতে চাইলেন।

মুসলিম বাহিনীর মনের এইভাব পরিলক্ষিত হলে আব্দুল্লাহ বিন রওয়াহা রাযি. সিংহের ন্যায় গর্জে উঠে উত্তেজনাপূর্ণ এক ভাষণ দিলেন। যার সারাংশ হল এই যে, তোমরা কিসের চিন্তায় ভীত হচ্ছ? আমরা তো একমাত্র শাহাদাতের উদ্দেশ্যে আল্লাহর রাস্তায় বের হয়েছি। আমরা বাহুবল এবং সংখ্যাধিক্যের উপর নির্ভর করে যুদ্ধ করি না। কাজেই সম্মুখপানে অগ্রসর হও। হয়ত জয়লাভ করে গাজী হবে, না হয় শাহাদাত বরণ করবে, এই দুই কামিয়াবীর একটা অনিবার্য। তাঁর এই অনলবর্শী বক্তৃতা শুনে মুসলিম বাহিনী বিপুল উৎসাহ আর উদ্দীপনার সাথে সামনে বাড়লেন। মুতায় পৌঁছার সাথে সাথে প্রচণ্ড যুদ্ধ শুরু হয়ে গেল। হযরত যায়েদ বিন হারিসা রাযি. ঝাণ্ডা হাতে রণক্ষেত্রে অবতীর্ণ হলেন। তুমুল যুদ্ধ শুরু হয়ে গেল।

কাফির সেনাপতির ভাই নিহত হল, সেনাপতি পলায়ন করে একটি দুর্গে আশ্রয় নিলো এবং কেন্দ্রের সাহায্য চেয়ে লোক পাঠাল। রোম সম্রাট আরো দুই লাখ সৈন্য পাঠাল। আবার ভীষণ যুদ্ধ আরম্ভ হল। যায়েদ বিন হারিসা রাযি. শাহাদাত বরণ করলেন। সাতে সাথেই জাফর বিন আবু তালিব রাযি. ঝাণ্ডা হাতে নিয়ে বীর বিক্রমে যুদ্ধ শুরু করে দিলেন।

কাফির বাহিনী তাঁর ডান হাত কেটে দিল। সাথে সাথে তিনি বাম হাতে ঝাণ্ডা তুলে নিলেন। এরপর শত্রুরা তাঁর বাম হাতেও আঘাত করে তা কেটে দিল, তখন তিনি ঝাণ্ডাখানা বাহু দ্বারা চেপে মুখে কামড়িয়ে ধরলেন। এমতাবস্থায় পশ্চাৎ দিক হতে শত্রুর আঘাতে তিনি দ্বিখণ্ডিত হয়ে মাটিতে লুটে পড়লেন । এ সময় হযরত আব্দুল্লাহ বিন রাওয়াহা রাযি. তিন দিনের উপবাস অবস্থায় সৈন্য দলের এক কোণে দাঁড়িয়ে একটি গোশতের টুকরো খাচ্ছিলেন। জাফর বিন আবু তালিবের শাহাদতের খবর শুনা মাত্র গোশতের টুকরা ফেলে দিয়ে নিজে ধিক্কার দিতে দিতে সৈন্যদলে ঢুকে পড়লেন

এবং তলোয়ার চালাতে চালাতে শহীদ হয়ে গেলেন। এর পর উপস্থিত লোকেরা হযরত খালিদ বিন ওয়ালীদ রাযি. কে সেনাপতি নিযুক্ত করল। তিনি যুদ্ধ চালিয়ে নিলেন এবং অবশেষে মুসলিম বাহিনী বিজয় লাভ করল। অনেকের নিকট এসব কুরবানী মামুলী মনে হয় এবং তারা মনে করে যে, আমরাও ঐ যামানায় থাকলে নবীর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম জন্য এবং দীনের জন্য সাহাবায়ে কিরামের মতই কুরবানী পেশ করতাম। তাদের এ ধারণা সম্পূর্ণ ভ্রান্ত।

হযরত মাওলানা শাব্বীর আহমদ উসমানী রহ. বুখারী শরীফের দরসে একটি ঘটনা বর্ণনা করতেনঃ পরবর্তী যুগের জনৈক ব্যক্তি সাহাবায়ে কিরামের অমূল্য কুরবানীকে সাধারণ চোখে দেখত এবং ভাবত-আমরা নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম)-কে জীবদ্দশায় পেলে এ রকমই কুরবানী পেশ করতাম। সেই ব্যক্তিরই ভাষ্য, এক রাত্রে আমি ঘুমিয়ে স্বপ্ন দেখছি যে, আমি একটি ঘোড়ার গাড়িতে চড়ে আছি। চালক ছাড়া আমরা মোট তিন জন ছিলাম, হুজুর পাক সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম, একজন সাহাবী রাযি. ও আমি। চলতে চলতে হঠাৎ ঘোড়া উদ্ধত হয়ে উঠল। ফলে গাড়ীর চালক নিয়ন্ত্রণ হারিয়ে ফেলল। 'আসন্ন বিপদ দেখে গাড়ী চালক চিৎকার করে বলতে লাগল, এখন গাড়ী থামানো ছাড়া উপায় নেই। কাজেই আপনাদের কেউ গাড়ীর চাকার নীচে পড়ে গাড়িটি থামিয়ে দিন। আমি মনে করলাম হুজুর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম কে বাঁচানোর জন্য আমারই চাকার নীচে পড়া দরকার। কিন্তু আমি যে চাকার নীচে পড়লে নির্ঘাত মারা যাবো, এই সব ভেবে ইতস্ততঃ করছিলাম। ইতিমধ্যে দেখি, সঙ্গী সেই সাহাবী রাযি. উক্ত কথা শোনার সাথে সাথেই হুজুর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম কে রক্ষার জন্য গাড়ীর চাকার পড়ে স্বীয় প্রাণ (বিসর্জন দিলেন। নিদ্রা ভাঙার পর সকালে একজন বিজ্ঞ আলিমের নিকট এ স্বপ্নের ঘটনা ব্যক্ত করলে তিনি বললেন-নিশ্চয় তোমার মনে সাহাবায়ে কিরামের কুরবানী সম্পর্কে কোনরূপ তাচ্ছিল্যভাব ছিল। আমি বললাম-হ্যাঁ। তিনি বললেন স্বপ্নে তোমাকে তারই বাস্তব প্রমাণ দেখানো হয়েছে যে, সাহাবায়ে কিরামের মত দুঃসাধ্য কুরবানী পেশ করার অভিব্যক্তি প্রকাশ করা বা সাহাবায়ে কিরামের কুরবানীকে কোনরূপ অবজ্ঞার দৃষ্টিতে দেখার অবকাশ নেই। আল্লাহপাক তাঁদেরকেই দীনের এ মহান খিদমতের জন্য বিশেষভাবে মঞ্জুর ও নির্বাচিত করেছিলেন, যা কেবল তাঁদের দ্বারাই সম্ভবপর হয়েছে। প্রসঙ্গতঃ উল্লেখ্য যে, সেই নুবওয়াতের যুগের কুরবানীর জন্য কেবল সাহাবায়ে কিরামই উপযুক্ত ছিলেন।

তবে সকল যুগে সাধারণ কুরবানী পেশ কারার ক্ষমতা আল্লাহপাক তখনকার যুগের ধার্মিকদেরকে দান করেন। তাই আমরা সাহাবায়ে কিরামের অতুলনীয় কুরবানীকে সামনে রেখে তাঁদের আদর্শ প্রেরণায় দৃঢ় ঈমানী বলে বলিয়ান হয়ে বর্তমানে বদদ্বীনীর সয়লাব থেকে দীন ও ঈমান হিফাজতের জন্য সাধ্যমত কুরবানী পেশ করতে পারি। আমাদের কুরবানীর ফলেই মহান আল্লাহর অশেষ রহমত আমাদের উপর অবতীর্ণ হবে।

সাহাবায়ে কিরামের মর্যাদা সম্পর্কে কুরআন ও হাদীসের বহু স্থানে উল্লেখ্য করা হয়েছে।

১. আল্লাহ্ তা'আলা মহাগ্রন্থ আল কুরআনের সূরাহ ফাতিহার ৬ষ্ঠ ও ৭ম আয়াতে বান্দাহকে দু'আ করার নির্দেশ দিয়েছেন,

اهْدِنَا الصِّرَاطَ الْمُسْتَقِيمَ ﴿٦﴾ صِرَاطَ الَّذِينَ أَنْعَمْتَ عَلَيْهِمْ غَيْرِ الْمَغْضُوبِ عَلَيْهِمْ وَلَا الضَّالِّينَ ﴿٧﴾

"হে আল্লাহ! আমাদের সীরাতে মুস্তাকীমের উপর কায়িম রাখ " অর্থাৎ সে সকল লোকদের পথে দৃঢ় রাখ, যাদের প্রতি তুমি অনুগ্রহ করেছ। তাদের পথ নয়, যাদের প্রতি তোমার গজব নাযিল হয়েছে এবং যারা পথভ্রষ্ট হয়েছে। অর্থাৎ যে সকল লোক তোমার অনুগ্রহ লাভ করেছে এবং নেয়ামত লাভ করেছে, তাদের পথে আমাদের দৃঢ় রাখ। অন্য একটি আয়াতে তাদের পরিচয় এভাবে পেশ করা হয়েছে, যাদের প্রতি আল্লাহ নেয়ামত দান করেছেন, তারা আম্বিয়া কিরাম, সিদ্দীকীন, শহীদগণ ও মুমিন-মুক্তাকীন।

উক্ত আয়াতের বর্ণনা অনুযায়ী সকল সাহাবা রাযি. অনুগ্রহপ্রাপ্তদের অন্তর্ভুক্ত এবং তাঁদের রাস্তায় (যা প্রকৃতপক্ষে নবীর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম রাস্তা) দৃঢ় রাখার জন্য আল্লাহর দরবারে দু'আ করার নির্দেশ দেয়া হয়েছে, সুতরাং তারা সকলেই মহাপূণ্যবান এবং সত্যের মাপকাঠি।

২. সাহাবায়ে কিরামের রাযি. মর্যাদা সূরাহ তওবার ১০০তম আয়াতে আল্লাহ তা'আলা ঘোষণা করেছেনঃ

وَالسَّابِقُونَ الْأَوَّلُونَ مِنَ الْمُهَاجِرِينَ وَالْأَنْصَارِ وَالَّذِينَ اتَّبَعُوهُمْ بِإِحْسَانٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمْ وَرَضُوا عَنْهُ وَأَعَدَّ لَهُمْ جَنَّاتٍ تَجْرِي تَحْتَهَا الْأَنْهَارُ خَالِدِينَ فِيهَا أَبَدًا ۚ ذَٰلِكَ الْفَوْزُ الْعَظِيمُ ﴿١٠٠﴾

"আর যারা সর্বপ্রথম হিজরতকারী ও আনসারদের মাঝে পুরাতন এবং যারা তাদের অনুসরণ করেছে, আল্লাহ সে সকল লোকদের প্রতি সন্তুষ্ট হয়েছেন এবং তারাও আল্লাহ তা'আলার প্রতি সন্তুষ্ট হয়েছে। আর আল্লাহ তা'আলা তাদের জন্য প্রস্তুত রেখেছেন কানন-কুঞ্জ, যার তলদেশ দিয়ে প্রবাহিত হবে প্রস্রবণসমূহ। যেখানে তারা থাকবে চিরকাল-এটাই হল মহা কৃতকার্যতা। অর্থাৎ যারা কিবলা পরিবর্তন অথবা হুদাইবিয়ার সন্ধির পূর্বে ইসলাম কবুল করে সাহাবীর রাযি. মর্যাদা লাভ করেছেন এবং যারা হুদাইবিয়ার সন্ধির পর ইসলাম গ্রহণ করে পূর্ববর্তী সাহাবীদের রাযি. অনুসরণ করেছেন এবং সাহাবায়ে কিরামের রাযি. অন্তর্ভুক্ত হয়েছেন, তাঁদের প্রত্যেকের উপর আল্লাহ্ তা'আলা রাজি হয়ে তাঁদের জন্য জান্নাত প্রস্তুত করে রেখেছেন। সুতরাং প্রত্যেক সাহাবী রাযি. সমালোচনার উর্ধ্বে। আল্লাহ যাদেরকে জান্নাতী হওয়ার ঘোষণা করেছেন, কে তাদের সমালোচনার অধিকার রাখে?

৩. আল্লাহ তা'আলা অন্যত্র বলেন- "হে সাহাবীগণ রাযি.! আল্লাহ তোমাদের অন্তরে ঈমানের মহব্বত সৃষ্টি করেছেন এবং তা হৃদয়গ্রাহী করে দিয়েছেন। পক্ষান্তরে কুফর, পাপাচার ও নাফরমানীর প্রতি ঘৃণা সৃষ্টি করে দিয়েছেন। তারাই সৎপথ অবলম্বনকারী।" (সূরাহ আল-হুজরাত)

যাদের অন্তরে ঈমানের মহব্বত বদ্ধমূল করে দেয়া হয়েছে এবং অন্যায় ও গুনাহের প্রতি ঘৃণা সৃষ্টি করা হয়েছে, নিশ্চয় তারা সত্যের মাপকাঠি এবং সমালোচনার ঊর্ধ্বে।

৪. অন্য আয়াতে ইরশাদ হয়েছেঃ

وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ آمِنُوا كَمَا آمَنَ النَّاسُ قَالُوا أَنُؤْمِنُ كَمَا آمَنَ السُّفَهَاءُ ۗ أَلَا إِنَّهُمْ هُمُ السُّفَهَاءُ وَلَـٰكِن لَّا يَعْلَمُونَ ﴿١٣﴾

"হে দুনিয়াবাসী! সাহাবীগণ রাযি. যেভাবে ঈমান এনেছে, তোমরাও সেভাবে ঈমান আনয়ন কর" (সূরা আল-বাকরা-১৩)

৫. সাহাবায়ে কিরামের মর্যাদা সম্পর্কে আল্লাহ তা'আলা অন্যত্র বলেন- হে সাহাবীগণ রাযি.! "যদি দুনিয়ার মানুষ সেরূপ ঈমান আনে, যেরূপ তোমরা ঈমান এনেছ, তাহলে তারা হিদায়াত পাবে।" এই বাক্যেও সাহাবায়ে কিরাম রাযি. কে সত্যের মাপকাঠি করা হয়েছে। এবং তাদের ঈমানকে আদর্শ ঈমানের মাপকাঠি সাব্যস্ত করা হয়েছে। সুতরাং আল্লাহর দরবারে গ্রহণযোগ্য ও স্বীকৃত ঈমান হচ্ছে সেই ঈমান, যা সাহাবায়ে কিরাম রাযি.-এর ঈমানের মত হবে। আর যে ঈমান সাহাবীদের রাযি. ঈমানের সাথে সামঞ্জস্যপূর্ণ হবে না, তা আল্লাহর দরবারে কখনও কবুল হবে না।

১. রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) সাহাবায়ে কিরামের রাযি. মর্যাদা সম্পর্কে বহুবার ইরশাদ করেছেন, "তোমরা আমার সাহাবা সম্পর্কে গালমন্দ করো না। কেননা, যদি তোমাদের কেউ উহুদ পাহাড় সমান স্বর্ণ খরচ কর, তবুও আমাদের সাহাবীদের রাযি. এক সের পরিমাণ গম দান করার সমান মর্তবায় পৌঁছতে পারবে না" (বুখারী শরীফ-হাদীস নং-৩৬৭৩)

২. তিনি অন্যত্র ইরশাদ করেনঃ "সাহাবায়ে কিরাম রাযি. আমার উম্মতের জন্য আমানত বা হিফাজতকারী। অতএব, যখন আমার সাহাবায়ে কিরাম রাযি. দুনিয়া থেকে বিদায় নিবে, তখন আমার উম্মতের মধ্যে ঐ সমস্ত ফিৎনা-ফাসাদ প্রকাশ পাবে, যা আল্লাহ ও রাসূলের পক্ষ থেকে ভবিষ্যদ্বাণী করা হয়েছে।" (মুসলিম শরীফ) অর্থাৎ সাহাবীগণের রাযি. ইনতিকালের পরপরই মঙ্গল ও কল্যাণের বিলুপ্তি ঘটে ফিতনা-ফাসাদ ও বিদ'আতের আগমন ঘটবে।

৩. তেমনিভাবে ইরশাদ হয়েছে, "আমার সাহাবীদের রাযি. প্রতি সম্মান প্রদর্শন কর, কেননা-তারাই তোমাদের মধ্যে সর্বোত্তম।" (নাসায়ী)

৪. “আমার সকল সাহাবী রাযি. নক্ষত্র সাদৃশ্য। অতএব, তোমরা তাঁদের মধ্যে থেকে যাকেই অনুসরণ করবে, হিদায়াত প্রাপ্ত হবে।” (রাজীন)

৫. রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ইরশাদ করন- “যে মুসলমান আমার দর্শনলাভ করেছে, জাহান্নামের আগুন তাকে স্পর্শ করবে না”। (তিরমিযী)

৬. ইবনে মাসউদ রাযি. সাহাবায়ে কিরাম রাযি.-এর মর্যাদা সম্পর্কে বলেনঃ “এই উম্মতের মধ্যে তারাই পরিচ্ছন্ন হৃদয় ও অগাধ জ্ঞানের অধিকারী এবং বানোয়াটি (ছলনা) মুক্ত। আল্লাহ তা’আলা তাঁদেরকে নির্বাচিত করেছেন নবীর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম সাহচর্যের জন্য এবং তার দীন কায়িমের জন্য। সুতরাং তাঁরা যদি সত্যের মাপকাঠি না হন, তাহলে তারা কিভাবে দীন কায়িম করবে।

৭. হযরত উমর ইবনে আব্দুল আজিজ রহ. বলেনঃ মুহাম্মদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর কোন সাহাবীর রাযি. সমকক্ষ বিশ্বাস করি না। (রাওজাতুন নাদিয়া)

৮. হযরত শাইখ আব্দুল কাদির জিলানীর রহ. নিকট হযরত মুআবিয়ার রাযি. মর্যাদা সম্পর্কে জিজ্ঞাসা করা হলে তদুত্তরে তিনি বললেন, হুজুর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর সাথে মুআবিয়া রাযি. অশ্বে আরোহণ করে জিহাদে অংশগ্রহণ করার সময় পথের উড়ন্ত ধূলি-কণার যে অংশ উক্ত ঘোড়ার নাসিকায় প্রবেশ করেছে, সর্বশ্রেষ্ঠ তাবিয়ীর চেয়েও সেই ধূলিকণার মর্তবা অনেক বেশী।

সাহাবায়ে কিরামের রাযি. মর্যাদা সম্পর্কে কুরআন ও হাদীসের অসংখ্য স্থানে উল্লেখ থাকার পরও কিছু সংখ্যক ভ্রান্ত সম্প্রদায় ইয়াহুদী-নাসারাদের এবং শিয়াদের লেখা ইতিহাস পড়ে সাহাবীগণ রাযি. সম্পর্কে বিরূপ ধারণ পোষণ করে থাকে। এমন কি অনেক সমালোচনাও করে থাকে, যা জঘন্য অন্যায় এবং নিজের ঈমানকে আশঙ্কার মধ্যে ফেলার সমতুল্য। সাহাবীগণের রাযি. বিষয়টি কুরআন ও হাদীস দ্বারা প্রমাণিত এবং ঈমান-আক্বায়িদের অবিচ্ছেদ্য অংশ। শুধু ইতিহাসের উপর নির্ভর করে কুরআন-হাদীসের বিরুদ্ধে কথা বলার চেয়ে বোকামী আর কিছু হতে পারে না।

কুরআন হাদীসের আলোকে সাহাবায়ে কিরাম রাযি.-ই সত্যের মাপকাঠি

“সাহাবায়ে কিরাম রাযি. সত্যের মাপকাঠি” একথার উজ্জ্বল প্রমাণ কুরআন শরীফের প্রারম্ভিক সূরাহ ফাতিহা’ তেই বিদ্যমান রয়েছে। এ সূরায় আল্লাহ পাক আমাদের প্রথমতঃ সিরাতে মুস্তাকীম-এর উপর দৃঢ় থাকার দু’আ শিক্ষা দিয়েছেন। অতঃপর সিরাতে মুস্তাকীম-এর বাস্তব ব্যাখ্যা দিতে গিয়ে বলেছেনঃ

অর্থাৎ সিরাতে মুস্তাকীম ঐ সকল ব্যক্তিবর্গের পথ-যারা আল্লাহ তা’আলা কর্তৃক পুরস্কৃত হয়েছেন এবং যারা আল্লাহর বিরাগভাজন নন এবং পথভ্রষ্টও নন। তাহলে বুঝা গেল-আল্লাহ কর্তৃক পুরস্কৃত বান্দাগণের রাস্তাই হল সিরাতে মুস্তাকীম। আর অন্য আয়াতে আল্লাহপাক পুরস্কৃত বান্দাগণের পরিচিতি বর্ণনা করে ইরশাদ করেছেনঃ

وَمَن يُطِعِ اللّـــهَ وَالرَّسُولَ فَأُولَـــئِكَ مَعَ الَّذِينَ أَنْعَمَ اللّـــهُ عَلَيْهِم مِّنَ النَّبِيِّينَ وَالصِّدِّيقِينَ وَالشُّهَدَاءِ وَالصَّالِحِينَ ۚ وَحَسُنَ أُولَـــئِكَ رَفِيقًا ﴿٦٩﴾

অর্থঃ "যাদেরকে আল্লাহ পাক পুরস্কৃত করেছেন, তারা হলেন (চার শ্রেণীতে বিভক্ত) নবীগণ, সিদ্দীকগণ, শহীদগণ ও সালেহীন-নেককারগণ"। (সূরাহ নিসা- আয়াতঃ ৬৯)

এ আয়াতে নবী আ. ব্যতীত বাকী তিনটি বিশেষণ পূর্ণাঙ্গরূপে সাহাবীগণের রাযি. ক্ষেত্রে প্রযোজ্য হয়, একথা কেউ অস্বীকার করতে পারবে না।

অতএব, প্রমাণিত হল যে, পুরস্কৃত বান্দাগণের অন্তর্ভুক্ত হচ্ছেন-নবীগণ ও সাহাবায়ে কিরাম রাযি. আর তাদের প্রদর্শিত পথের নামই হচ্ছে-সিরাতে মুস্তাকীম।

সুতরাং উপরোক্ত আয়াতদ্বয় দ্বারা দিবালোকের ন্যায় স্পষ্ট হচ্ছে যে, সাহাবায়ে কিরাম রাযি. হক ও সত্যের উপর প্রতিষ্ঠিত এবং তাঁরা নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর তা'লীমের বাস্তব উদাহরণ। সুতরাং সাহাবায়ে কিরাম হচ্ছেন সত্যের মাপকাঠি তথা ঈমান ও আমলের মানদণ্ড। তাই যারা আম্বিয়া কিয়ামের প্রদর্শিত ও সাহাবায়ে কিরামের অনুসৃত উক্ত সীরাতের উপর অবিচল থাকবেন, তারাই সিরাতে মুস্তাকীম তথা সত্যের উপর প্রতিষ্ঠিত বলে বিবেচিত হবেন এবং একমাত্র তাদের ঈমানই হবে গ্রহণযোগ্য। আর যারা বিন্দুমাত্র-এর বিরোধিতা বা ব্যতিক্রম করবে, তারা হবে বাতিলপন্থী ও পথভ্রষ্ট। ইরশাদ হচ্ছে,

অর্থ-"কিছু লোক দাবী করে যে, আমরা আল্লাহর উপর এবং আখিরাতের উপর ঈমান এনেছি। কিন্তু আল্লাহ তা'আলা তাদের এ দাবী প্রত্যাখ্যান করে ঘোষণা করেন যে, তারা আসলে মুমিন নয়। কারণ, ঈমানের মানদণ্ড সাহাবীগণের রাযি. ঈমানের সাথে তাদের ঈমানের মিল নেই। সুতরাং তারা মিথ্যুক।"

অত্র আয়াত দ্বারা বুঝা যাচ্ছে যে, ঈমানের যথার্থতা যাচাই করার মাধ্যম হচ্ছে-সাহাবীগণের রাযি. ঈমান। এ পরীক্ষায় যা সঠিক বলে প্রমাণিত না হবে, তা আল্লাহ ও তার রাসূলের সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম নিকট ঈমান বলে স্বীকৃতি লাভ করতে পারবে না।

যদি কোন ব্যক্তি কুরআনের কোন বিষয়কে বা বর্ণনাকে বিপরীত পথে অবলম্বন করে বলে য, আমি তো এ আক্বীদায় বিশ্বাসী, তবে তা শরীআতে গ্রহণযোগ্য নয়। যেমন-আজকাল কাদিয়ানীরা বলে বেড়ায় যে, আমরা তো খতমে নবুওতে বিশ্বাসী।

অথচ এ বিশ্বাসে তারা রাসূলে আকরাম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর বর্ণনা ও সাহাবীগণের রাযি. ঈমানের সম্পূর্ণ বিপরীত পথ অবলম্বন করেছে। আর এ পর্দার অন্তরালে মির্জা গোলাম আহমদের নবুওয়াত প্রতিষ্ঠার পথ বের করেছে। তাই এদের সম্পর্কে কুরআনের বর্ণনার আলোকে সমগ্র দুনিয়ার উলামায়ে কিরামের সর্বসম্মত ফায়সালা এই যে, "তারা মুমিন নয়, কাফির"।

মোটকথা, যদি কোন ব্যক্তি সাহাবীগণের রাযি. ঈমানের পরিপন্থী কোন বিশ্বাসে নতুন কোন পথ ও মত তৈরি করে, সে মতের অনুসারী হয় এবং নিজকে মুমিন বলে দাবী করে, এমতাবস্থায় সে যদি মুসলমানদের নামায-রোযা ইত্যাদিতে শরীকও হয়, তথাপিও সে মুমিন সাব্যস্ত হবে না; যতক্ষণ পর্যন্ত কুরআনের প্রদর্শিত পথে সাহাবীগণের রাযি. ন্যায় ঈমান না আনবে।

কতিপয় ভ্রান্ত জামা'আত যেমন শিয়া, কাদিয়ানী, রেজভী, প্রভৃতি উল্লেখিত বর্ণনার ভিত্তিতে গোমরাহ ও ভ্রান্তপন্থী সাব্যস্ত হয়। এর মধ্যে কোন কোনটা সুস্পষ্ট কাফির পর্যায়ের, আর কোনটা বিদ'আতী পর্যায়ের। তাদের অনেক আক্বীদাই কুরআন-হাদীস বিরোধী। এখানে শুধু নমুনা স্বরূপ দু'একটি করে উল্লেখ করা হচ্ছে-যাতে এ রকম ফিৎনার যুগে সকলেই নিজের ঈমানকে হিফাজত করতে পারে। কারো বিরুদ্ধে বিষোদগার কখনই উদ্দেশ্যে নয় এবং আলিম হিসেবে স্বীয় দীনী যিম্মাদারী আদায় করাই উদ্দেশ্যে। যাতে করে হক প্রকাশ না করার দরুন হাশরের ময়দানে আল্লাহর দরবারে জবাবদিহীর সম্মুখীন হতে না হয়। উলামায়ে কিরাম যদি সহীহ আক্বীদা উম্মতের সামনে তুলে না ধরেন, তাহরে সমস্ত গোমরাহ লোকেরাই হাশরের ময়দানে উলামায়ে কিরামকে দায়ী করবে।

"নবুওয়াতী সিলসিলার পরিসমাপ্তি হুজুর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর দ্বারা হয়েছে" কাদিয়ানীরা এ আক্বীদা মানে না, অথচ কুরআনে কারীমের প্রায় শতাধিক আয়াত, দু'শরও বেশী সহীহ হাদীস, সাহাবায়ে কিরামের ইজমা ও পূর্ববর্তী সকল আসমানী কিতাবসমূহের বর্ণনার দ্বারা মুহাম্মদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর শেষ নবী হওয়া অকাট্যরূপে প্রমাণিত। যার অস্বীকার করা স্পষ্ট কুফর। অথচ মির্জা গোলাম আহমদ কাদিয়ানীর অনুসারীরা তা মানে না। সুতরাং মির্জা কাদিয়ানী এবং কাদিয়ানী সম্প্রদায় মুরতাদ, যিন্দিক ও মুল্‌হিদ।

শিয়া মাযহাবের মূল ভিত্তি আক্বীদায়ে ইমামত ও তাহরীফে কুরআনের উপর প্রতিষ্ঠিত'। তাদের ধারণা-তাদের স্থিরকৃত ইমাম (নেতা) নবীগণেরও শীর্ষ মর্যাদায় অধিষ্ঠিত। তারা বিশ্বাস করে যে, জীবনের সর্বস্তরে এ ইমামগণের আনুগত্য ফরজ। শর'য়ী বিধানকে তারাই কার্যকরী করেন। এমনকি তারা কুরআনে হাকীমের যে কোন বিধানকে প্রয়োজনে রহিত ও মওকুফ করারও অধিকার রাখেন। "আল হুকুমাতুল ইসলামিয়্যাহ" গ্রন্থে খোমেনী বলেন-"আমাদের ইমামগণের জন্য এমন বৈশিষ্ট্যময় মর্যাদার স্থান রয়েছে, যে স্থানে কোন নৈকট্য লাভকারী ফেরেশতা এবং কোন প্রেরিত নবী পর্যন্ত পৌঁছাতে পারে না"।

শিয়ারা তাহরীফে কুরআন-অর্থাৎ কুরআন বিকৃতির আক্বীদাও এরূপ পোষণ করে যে, বর্তমান কুরআন রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর উপর অবতীর্ণ কুরআন নয়। এটা হযরত উসমানের সাজানো কুরআন, এতে বহু সংযোজন ও বিয়োজনের ঘটনা ঘটেছে।

প্রকৃত কুরআনের মধ্যে সতের হাজার আয়াত আছে-যা তাদের ইমামের নিকট সংরক্ষিত আছে। এরূপ ভ্রান্ত আক্বীদার ভিত্তিতে নিত্য-নতুন আয়াতের জন্ম দিয়ে তারা কুরআন শরীফকে বিকৃত করেছে। এ সমস্ত বাতিল আক্বীদার কারণে "ইছনা আশারিয়া" শিয়া সম্প্রদায় সকল উলামায়ে কিরামের সর্বসম্মত সিদ্ধান্ত অনুযায়ী- "কাফির"।

বিদ'আতপন্থী রেজভীদের আক্বীদা হল-রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম গায়েব জানেন। তিনি সর্বত্র হাজির-নাজির। তিনি মহান আল্লাহর জাতগত বা অঙ্গ হয়ে তথা অদৃশ্যের দুনিয়াতে অবতরণ করেছেন। তাদের অনেকে আরেকটু বাড়িয়ে বলে-খোদা ও রাসূলের মধ্যে কোন পার্থক্য নেই। খোদাই রাসূলের রূপ ধরে দুনিয়ায় আগমন করেছেন, ইত্যাদি। (নাউযুবিল্লাহ)

এমনিভাবে বর্তমান সমাজে দীনের নামে যত ধরনের শিরক-বিদ'আত প্রচলিত আছে, তার অধিকাংশই এ গোমরাহ রেজভীদের আবিস্কৃত। এত শিরক-বিদ'আতে ডুবে থেকেও তারা নিজের নাম দেয় সুন্নী জামাত। আর যারা প্রকৃত সুন্নতের অনুসারী তাদের তারা ওহাবী বলে গালমন্দ করতে ত্রুটি করে না। এমনকি হকপন্থী অপরাপর সকল নেতারা কাফির পর্যন্ত বলে প্রচারণা চলায়। এ প্রেক্ষিতেই তারা বিশ্বখ্যাত এশিয়া মহাদেশের অন্যতম বিদ্যাপীঠ আল-জামিআতুল ইসলামিয়া দারুল উলুম দেওবন্দ মাদ্রাসা, দেওবন্দী সিলসিলাভূক্ত সকল মাদ্রাসা ও তাবলীগী জামা'আতের অনুসারী উলামা ও দীনদারগণকে ওহাবী-কাফির বলে অপপ্রচার চালায়। বস্তুতঃ গায়িবী জ্ঞানের অধিকারী একমাত্র আল্লাহ। তিনিই আলিমুল গায়িব। যদি রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম কে গায়িবের অধিকারী বলি, তবে আল্লাহ ও রাসূলের মধ্যে পার্থক্য থাকে কোথায়? তাতে রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম কে মহান আল্লাহর মর্যাদা দিয়ে শিরক করা হয়। এর বিশ্লেষণ এই যে, গায়িব জানার অর্থ হল- কেউ জানানো ব্যতীত নিজে নিজেই অদৃশ্য-অদৃষ্ট ও সমস্ত অগোচর বিষয় জানা। এ অর্থে নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম সহ নবী ওলীগণের মধ্যে কেউ গায়িব জানতেন না।

وَعِندَهُ مَفَاتِحُ الْغَيْبِ لاَ يَعْلَمُهَا إِلاَّ هُوَ ۚ وَيَعْلَمُ مَا فِي الْبَرِّ وَالْبَحْرِ ۚ وَمَا تَسْقُطُ مِن وَرَقَةٍ إِلاَّ يَعْلَمُهَا وَلاَ حَبَّةٍ فِي ظُلُمَاتِ الأَرْضِ وَلاَ رَطْبٍ وَلاَ يَابِسٍ إِلاَّ فِي كِتَابٍ مُّبِينٍ ﴿٥٩﴾

(সূরাহ আন'আম-৫৯)

কারণ-তাঁরা অদৃশ্যের সকল খবর জানতেন না। বরং তার সীমিত কিছু অংশ জানতেন। আর সেটাও আল্লাহর পক্ষ থেকে তাদেরকে জানানো হত। (সূরাহ জ্বিন-২৭)

আমাদের নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম আল্লাহ পাকের নির্দেশ মতে বলেছেন- "আমি যদি গায়িব জানতাম, তাহলে মঙ্গলের কাজ বেশী করে করতাম এবং কোন বিপদ আমাকে স্পর্শ করতে পারত না।" (সূরা আরাফ-১৮৮)

তাছাড়া নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম গায়িব জানলে, উহুদ যুদ্ধে ৭০ জন সাহাবীর শহীদ হওয়া এবং নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এর দন্ত মুবারক শহীদ হওয়া সহ সমস্ত শরীর রক্তাক্ত হওয়ার ঘটনাই ঘটত না। নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম অগোচরের সব জানলে হযরত আয়িশা সিদ্দীকার রাযি. উপর মুনাফিকরা যিনার তোহমত লাগালে, নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এর জন্য একমাস যাবত অস্থির থাকার কোন যুক্তিই থাকে না। সুতরাং নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম কে হাজির-নাজির মানার আক্বীদা সম্পূর্ণ মনগড়া ও শরীআত বিরোধী আক্বীদা। নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম কে কতটুকু মুহাব্বত ও ভক্তি করতে হবে, শরীআতে তার সীমা নির্ধারণ করে দেয়া হয়েছে। তার থেকে বেশী ভক্তি এবং তাকে খোদার আসনে বসানোর প্রবণতা বাড়াবাড়ি ছাড়া আর কিছুই নয়। এটা কখনও দ্বীন বা রাসূল প্রেম হতে পারে না। এ ধরনের লোকদের উদ্দেশ্যেই নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ইরশাদ করেন যে, “তোমরা আমার প্রশংসায় বাড়াবাড়ি ও অতিরঞ্জিত কিছু করো না। যেমন খ্রিষ্টানরা তাদের নবীকে খোদার পুত্র ঘোষণা করে তাকে খোদার আসনে বসিয়েছে।” (বুখারী ও মুসলিম)

আবুল আলা মওদুদী ও তার ভক্তদের আক্বীদা হল- “আম্বিয়ায়ে কিরাম মাসুম বা নিষ্পাপ নন। অনুরূপভাবে সাহাবায়ে কিরাম রাযি. সত্যের মাপকাঠি নন। সুতরাং তাদেরকে সমালোচনার ঊর্ধ্বে মনে করা যাবে না।” (তাফহীমাত, দস্তুরে জামাআতে ইসলামী)

এ উভয় আক্বীদা সাহাবীগণের রাযি. ঈমান-আক্বীদার পরিপন্থী। সাহাবা রাযি. গণের অনুসৃত হক আক্বীদা এতদসংক্রান্ত সকল কিতাবে উল্লেখ করা হয়েছে যে, আম্বিয়ায়ে কিরাম আ. মা‘সুম বা নিষ্পাপ। নতুবা তারা উম্মতের জন্য অনুসরণীয় আদর্শ হতে পারেন না। আর সাহাবীগণকে রাযি. সত্যের মাপকাঠি ও সমালোচনার ঊর্ধ্বে বিশ্বাস না করা হলে, দীনের বুনিয়াদই ধ্বংস হয়ে যায়। কারণ-নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম থেকে উম্মতের দীন পাওয়ার মাধ্যমই হচ্ছেন সাহাবীগণ রাযি. তাদের উপর যদি আস্থা না থাকে, তাহলে তারা সম্পূর্ণ দীনী নির্ভরযোগ্যতা হারিয়ে ফেলেন। কাজেই ইতিহাসের উপর ভিত্তি করে সরাসরি কুরআন ও হাদীসের (যা সাহাবীগণের রাযি. ফজীলত বর্ণনায় সমৃদ্ধ) বরখিলাফ কোন আক্বীদা পোষণ করা নিজের ঈমান ও আক্বীদাকে ধ্বংসের মুখে ঠেলে দেয়ার নামান্তর।

হাদীসের আলোকে বুঝা যায়-মুসলমানরা বিভিন্ন ফিরকায় বিভক্ত হয়ে পড়বে। তখন একটি মাত্র জামা’আত হকের উপর থাকবে। যারা নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ও সাহাবীগণের রাযি. তরীকাকে মজবুত করে ধরবে, তার থেকে বিন্দুমাত্র বিচ্যুত হবে না।

হাদীসঃ মহানবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ইরশাদ করেছেন- “বনী ইসরাঈল ৭২ দলে বিভক্ত হয়েছিল এবং আমার উম্মত ৭৩ দলে বিভক্ত হবে। তাদের সকলেই

হবে জাহান্নামী, কেবলমাত্র একটি দল ছাড়া"। প্রশ্ন করা হল, হে আল্লাহর রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম! সেই মুক্তিপ্রাপ্ত দল কোনটি? নবীজী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম উত্তর দিলেন- "আমি এবং আমার সাহাবায়ে কিরাম যে তরীকা ও আদর্শের উপর আছি, এর উপর যারা থাকবে, তারা হবে নাজাত প্রাপ্ত দল।" অন্য বর্ণনা মতে হুজুর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম উত্তর দিলেন- "নাজাত প্রাপ্ত দল হল, আহলে সুন্নত ওয়াল জামা'আত" পুনরায় প্রশ্ন করা হল, আহলে সুন্নত ওয়ালা জামা'আত কারা? নবীজী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম উত্তরে বললেন, "আমার ও আমার সাহাবীগণের রাযি. তরীকা ও আদর্শ যারা মেনে চলবে।" [তিরমিযী, আবু দাউদ ও নাসায়ী শরীফ]

উক্ত হাদীসে 'মা আনা আলাইহি' "যারা আমার আদর্শের উপর থাকবে, তারাই নাজাত প্রাপ্ত বলাই যথেষ্ট ছিল। কিন্তু মহানবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম হয়ত আল্লাহর পক্ষ থেকে একথা জানতে পেরেছেন যে, আমার পরে এমন একদল 'আসবে, যারা আমার সাহাবীগণকে রাযি. আমার থেকে বিচ্ছিন্ন করার চেষ্টা করবে। তাদেরকে সত্যের মাপকাঠি, ন্যায়ের মানদণ্ড মানবে না। তাই স্পষ্ট ভাষায় এবং আমার সাহাবীগণের রাযি. আদর্শের উপর যারা থাকবে" বলে সাহাবায়ে কিরামকে সত্যের মাপকাঠি স্বরূপ নির্ধারিত করে বাতিল পন্থীদের বিভ্রান্তিকর পথ রুদ্ধ করে দিয়েছেন। সুতরাং হাদীস দ্বারা জানা গেল যে, সাহাবীগণ রাযি. সত্যের মাপকাঠি।

মহানবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ইরশাদ করেছেন, আখিরী যামানায় বহু ধোঁকাবাজ ও মিথ্যাবাদীদের আবির্ভাব হবে। তারা তোমাদের নিকট এমন নতুন নতুন কথা দিয়ে আসবে-যা তোমরা কোন দিন শুননি, আর তোমাদের বাপ-দাদাও শুনেনি। খবরদার! এদের থেকে দূরে সরে থাকবে। এরাও যেন তোমাদের থেকে দূরে থাকে। এরা তোমাদের যেন বিভ্রান্ত করার সুযোগ না পায়।" (মুসলিম শরীফ)

এই হাদীস দ্বারা স্পষ্ট বুঝা যায়, কিয়ামত যত নিকটবর্তী হবে, ফিতনা-ফাসাদ তত প্রকট হবে। দীনের নামে মানুষদেরকে শিরক-বিদ'আত শিক্ষা দেয়া হবে। সেই যুগ সম্পর্কে হাদীসে বর্ণিত হয়েছে যে, সেই যুগে ঈমান রক্ষা করে দীনের উপর চলা এত কঠিন হবে, যেমন হাতে জ্বলন্ত আগুনের টুকরো রাখা কঠিন হয়।

এমন কি অন্য কোন হাদীসে বর্ণিত হয়েছে-বদদীনের সয়লাব এমনভাবে প্রবাহিত হবে যে, এক ব্যক্তি সকালে মুমিন থাকবে, কিন্তু বিকালে কাফিরে পরিণত হবে। আর কেউ বিকালে মুমিন থাকবে, কিন্তু সকালে কাফিরে পরিণত হবে।

সেই যুগ সম্পর্কে অন্য রিওয়ায়েতে বর্ণিত হয়েছে, সাপের নাম শুনলে যেমন মানুষ চতুর্দিক থেকে লাঠিসোটা নিয়ে সাপকে খতম করার জন্য ছুটে আসে, ইসলাম ও মুসলমানদের ধ্বংসের জন্য তেমনিভাবে সমস্ত বাতিল এক জোট হয়ে প্রচেষ্টা চালাবে। তখন দীন-ঈমান মদীনার দিকে হিজরত করে চলে যাবে। বর্তমান বিশ্বের দিকে নজর করলে ইসলাম ও মুসলমানদের করুণ অবস্থা দিবালোকের ন্যায় স্পষ্ট

ধরা পড়ে। এ মুহূর্তে ৭২টি গোমরাহ ফিরকাহ থেকে নিজের দীন ও ঈমানকে হিফাজত করতে হলে, তার একমাত্র পথ-সাহাবীগণের রাযি. ঈমানকে সত্যের মাপকাঠি মেনে নিয়ে ঈমানের সাথে নিজের ঈমানকে মিলাতে থাকা। খোদা না করুন, যদি কোন বিষয়ে সামান্য অসঙ্গতি দেখা দেয়, তাহলে সাথে সাথে দুরস্ত করে নেযা। এই হচ্ছে সহীহ রাস্তা।

সাহাবায়ে কিরাম রাযি.-এর সমালোচনা ও দোষচর্চার শরয়ী বিধান

সাহাবায়ে কিরাম রাযি.-এর সমালোচনা ও তাঁদের দোষচর্চা মারাত্মক গুনাহের কাজ। এ কাজ করতে হুজুর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম কঠোরভাবে নিষেধ করেছেন। হাদিস শরীফে বর্ণিত হয়েছে, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ইরশাদ করেন-

"আমার সাহাবীগণের রাযি. ব্যাপারে তোমরা আল্লাহকে ভয় কর, আল্লাহকে ভয় কর। আমার পরে তোমরা তাঁদেরকে সমালোচনার পাত্রে পরিণত করো না। যে তাঁদেরকে ভালবাসবে, সে আমাকে ভালবাসার কারণেই তাঁদেরকে ভালবাসবে। আর যে তাদের প্রতি বিদ্বেষ পোষণ করবে, সে আমার প্রতি বিদ্বেষের কারণেই তাদের প্রতি বিদ্বেষ পোষণ করবে। যে তাদেরকে কষ্ট দিল, সে প্রকৃতপক্ষে আমাকেই কষ্ট দিল এবং আমাকে কষ্ট দেয়া স্বয়ং আল্লাহকে কষ্ট দেয়ার পর্যায়ে গণ্য হবে। আর যে আল্লাহকে কষ্ট দিবে, সে অতি শীঘ্রই আল্লাহর গজবে পতিত হবে। (তিরমিযী শরীফ-২/২২৫)

এ হাদীস দ্বারা বুঝা যায় যে, সাহাবীগণের প্রতি ভালবাসা কিংবা বিদ্বেষ আল্লাহ ও রাসূলের প্রতি ভালবাসা ও বিদ্বেষের নিদর্শন এবং সাহাবায়ে কিরামের সমালোচনা করে তাদের অন্তরে কষ্ট দেয়া আল্লাহ ও রাসূলকে কষ্ট দেয়ারই নামান্তর। আর যে আল্লাহ ও তদীয় রাসূলকে সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম কষ্ট দেয়, তার পরিণতি আল্লাহর ভাষায় (শুনুন)

إِنَّ الَّذِينَ يُؤْذُونَ اللَّـهَ وَرَسُولَهُ لَعَنَهُمُ اللَّـهُ فِي الدُّنْيَا وَالْآخِرَةِ وَأَعَدَّ لَهُمْ عَذَابًا مُّهِينًا ﴿٥٧﴾

"নিঃসন্দেহে যারা আল্লাহ ও রাসূলকে কষ্ট দিবে, আল্লাহ তাদের উপর দুনিয়াতে অভিশাপ বর্ষণ করবেন এবং তাদের জন্য (পরকালে) অপমানজনক শাস্তি তৈয়ার করে রেখেছেন। (সূরাহ আহ্যাব-৫৭)

২. অন্য এক হাদীসে মহানবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ইরশাদ করেছেন, "তোমরা যখন কাউকে সাহাবীগণের রাযি. সমালোচনা করতে দেখবে, তখন বলবেঃ তোমাদের মধ্যে অর্থাৎ (সাহাবা ও সমালোচনাকারীর মধ্যে) যে নিকৃষ্ট, তার উপর আল্লাহর লা'নত হোক।" (তিরমিযী শরীফ-২/২২৫)

এই হাদীস দ্বারা বুঝা যায়-সাহাবীগণের রাযি. দোষ চর্চাকারীর উপর আল্লাহর লা'নত বর্ষিত হতে থাকে। কারণ-উল্লেখিত দু'পক্ষের দোষ চর্চাকারীরাই যে নিকৃষ্ট, তা বলার অপেক্ষা রাখে না।

৩. অন্য এক হাদীসে ইরশাদ হয়েছেঃ মহানবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ইরশাদ করেছেন, "আমার সাহাবায়ে কিরামের প্রতি সম্মান প্রদর্শন কর। কেননা, তারা তোমাদের মধ্যে শ্রেষ্ঠ।"

৪. অপর এক হাদীসে ইরশাদ হয়েছেঃ রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেন, আমার সাহাবীগণের রাযি. সমালোচনা করো না। কারণ, তোমরা যদি উহুদ পাহাড় পরিমাণ স্বর্ণ আল্লাহর রাস্তায় খরচ কর, তবুও তাদের এক মুদ্দ (প্রায় ১৪ ছটাক) অথবা অর্ধ মুদ্দ পরিমাণ গম খরচ করার সমান সাওয়াবও হাসিল করতে পারবে না।" (মিরকাত ১১/২৭২)

ইমাম আবু যুর'আ রহ. বলেন- "যখন তুমি কোন ব্যক্তিকে সাহাবীর রাযি. বিরূপ সমালোচনা করতে দেখবে, তখন নিশ্চয়ই মনে করবে যে, সে যিন্দিক (তার ঈমান নেই)। কারণ-রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম সত্য, কুরআন সত্য এবং তিনি যা কিছু নিয়ে এসেছেন, তা সত্য। আর এ সমস্ত আমাদের নিকট যথাযথভাবে সাহাবীগণই রাযি. পৌঁছিয়ে দিয়েছেন। তাদেরই সাক্ষ্য দ্বারা আমরা এসব সত্য বলে জানতে পেরেছি। যারা সাহাবীগণের রাযি. দোষচর্চা করে, বস্তুতঃ তারা কুরআন-হাদীসের সাক্ষীদেরকে বাতিল-ঘায়েল করে দিয়ে তার মাধ্যমে কুরআন ও সুন্নাহকে বাতিল করে দিতে চায়। সুতরাং তাদেরকেই বাতিল ঘোষণা করা এবং তাদের উপর গোমরাহ ও যিন্দিক হওয়ার হুকুম প্রয়োগ করা অধিক সমীচীন" (দুররাতুল মুযী'আ)

তাফসীর ইবনে কাসীরে বর্ণিত আছেঃ "ধ্বংস ঐ ব্যক্তির জন্য, যে সাহাবায়ে কিরামের সাথে দুশমনী রাখে, অথবা তাদেরকে বা তাদের মধ্যে হতে কাউকে কটাক্ষ করে, গালি দেয়। এ লোকগুলোর কুরআনে কারীমের উপর ঈমান কিভাবে থাকতে পারে? কারণ, তারা এমন সব ব্যক্তিত্ব সম্পন্ন লোকদের সমালোচনা করছে বা দোষচর্চা করছে, যাদের উপর আল্লাহ তা'আলার সন্তুষ্টি ও রাজী হওয়ার ঘোষণা কুরআনে উচ্চারিত হয়েছে।"

কামাল ইবনে হুমাম রহ. বলেন- "আহলে সুন্নাত ওয়াল জামা'আতের মধ্যে একটি গুরুত্বপূর্ণ আক্বীদা এই যে, সকল সাহাবায়ে কিরামকে অবশ্যই নির্দোষ ও পবিত্র বিশ্বাস করতে হবে। তাঁদের সকলকেই ন্যায়পরায়ণ ও সত্যের মাপকাঠি জানতে হবে এবং তাদের সমালোচনা থেকে বিরত থাকতে হবে। আল্লাহ তা'আলা তাদেরকে যেভাবে প্রশংসা করেছেন ঐরূপ প্রশংসাই কেবল তাদের প্রাপ্য। (মুসায়ারাহ)।

হযরত আলীর রাযি. দলভুক্ত লোক হযরত আম্মার রাযি. হযরত মুআবিয়ার রাযি. লোকদের হাতে শহীদ হয়েছিলেন। অথচ তিনি জান্নাতের সুসংবাদ প্রাপ্ত হয়েছিলেন। তাহলে বুঝা গেল- হযরত আলীর রাযি. দলভুক্ত লোক হকের উপর ছিলেন। এমনিভাবে মুআবিয়ার রাযি. দলভুক্ত লোক হযরত ত্বালহা এবং হযরত যুবাইর রাযি. হযরত আলীর রাযি. লোকদের হাতে মৃত্যুবরণ করেছিলেন। অথচ তারাও শহীদ হিসাবে গণ্য এবং জান্নাতের সুসংবাদপ্রাপ্ত আশারায়ে মুবাশশারার মধ্যে শামিল ।

সুতরাং হযরত মুআবিয়ার রাযি. দলভুক্ত লোকও হকের উপর ছিলেন। নতুবা তার পক্ষে লড়াই করে কেউ শহীদ হতে পারতেন না।

আল্লামা ইবনে তাইমিয়া শরহে আক্বীদায়ে ওয়াসিতিয়্যা গ্রন্থে উল্লেখ করেন - আহলে সুন্নাত ওয়াল জামা'আত তথা হকপন্থী উম্মতগণ সাহাবায়ে কিরাম রাযি. এর হক প্রতিষ্ঠার লক্ষ্যে পারস্পরিক মতানৈক্য ও এর ভিত্তিতে ঘটে যাওয়া ঘটনাসমূহ সম্বন্ধে ধারণা প্রসূত কোনরূপ মন্তব্য করা হতে সদা বিরত থাকেন। আর সাহাবায়ে কিরাম রাযি. এর দোষচর্চায় রচিত যত ইতিহাসগ্রন্থ আছে এগুলোর কোন কোনটা মিথ্যা আর কোন কোনটা অতিরঞ্জন বৈ কিছু নয়। তবে আহলে সুন্নাত ওয়াল জামা'আত সাহাবায়ে কিরাম রাযি. কে আম্বিয়া কিরাম আ. এর ন্যায় সর্বপ্রকার ছগীরা ও কবীরা গুনাহ হতে মাসুম তথা পূত পবিত্র বলে আক্বীদা পোষণ করেন না। বরং মনে করেন যে, তাদের থেকেও গুনাহ প্রকাশ পেয়ে থাকতে পারে। কিন্তু তাদের আল্লাহপাক যে পরিমাণ ফজীলতপূর্ণ ও নেক কাজ করার তৌফিক দিয়েছেন এবং দীন ইসলামের জন্য তারা যে সীমাহীন ত্যাগ ও কুরবানী পেশ করে গেছেন তা তাদের গুনাহ মাফ হওয়ার জন্য যথেষ্ট । সুতরাং পরবর্তীদের জন্য তাদের সমালোচনা বা দোষচর্চার কোন অবকাশ নেই।

সারকথা লক্ষাধিক সাহাবীগণের রাযি. মধ্যে অল্প সংখ্যক সাহাবীর রাযি. দ্বারা দু'একটা ভুল সংঘটিত হওয়া বিচিত্র কিছু নয়। কিন্তু সাথে সাথে এ কথাও স্মরণযোগ্য যে, ভুল যেমন তাওবার দ্বারা ক্ষমা হয়ে যায় তেমনি ভাবে নেকীর দ্বারাও ক্ষমা হয়ে যায়। সাহাবীগণের রাযি. অতুলনীয় ও অকল্পনীয় কুরবানীর প্রেক্ষিতে তাদের জীবনের দু একটি ঘটে যাওয়া ভুলকে (যা বিরাট সমুদ্রের মধ্যে সামান্য নাপাক পড়ার তুল্য) আল্লাহ তা'আলা ক্ষমা করে তাদের ইমান ও ইসলাম তথা হকের মাপকাঠি এবং জান্নাতী হওয়ার ঘোষণা করেছেন এবং তাদের যে কোন প্রকার দোষচর্চাকে হারাম এবং লা'নতের কাজ বলে ঘোষণা করেছেন।

সহীহ রিওয়ায়েতে তাদের যে দু'একটি ভুল প্রমাণিত হয়েছে তা উম্মতকে গ্রহণ করতে নিষেধ করা হয়েছে। হযরত আলী রাযি. ও হযরত মুআবিয়ার রাযি. মাঝে ইয়াহুদী ও মুনাফিক তথা সাবায়ী চক্রের ষড়যন্ত্রের কারণে যে জঙ্গে জামাল ও জঙ্গে সিফফীন সংঘটিত হয়েছে এ খবর আল্লাহ রাব্বুল আলামীন জেনে শুনে পূর্বেই কুরআনে কারীমে তাদেরকে ক্ষমা প্রাপ্ত ঘোষণা করেছেন। সুতরাং পরবর্তী মুসলমানদের ঐ সব সাহাবীগণের রাযি. ব্যাপারে ভক্তি মুহাব্বত ও ভাল আলোচনা ব্যতীত কোন প্রকার মন্দ আলোচনা বা বিদ্বেষ পোষণ হারাম সাব্যস্ত করেছেন।

শেষ কথা দীন দু' জিনিষের নামঃ (১) ঈমান-আক্বীদা, যার ব্যাপারে কোন শিথিলতার স্থান নেই। অর্থাৎ এ ধরনের ত্রুটি ক্ষমাযোগ্য এবং হাদীসের মধ্যে যে এক ফেরকা সঠিক এবং অবশিষ্ট বাহাত্তর ফেরকা গোমরাহ ও জাহান্নামী বলা হয়েছে এ বাহাত্তর ফেরকা সবই এই আকীদার ব্যাপারে ভুল সিদ্ধান্তের প্রেক্ষিতে গঠিত হয়েছে।

(২) আমলে সালিহা তথা নামায রোযা ইত্যাদি। এ ব্যাপারে ত্রুটি বা শিথিলতার কারণে কেউ ঈমান হারা বা গোমরাহ হয় না। তবে ফাসিক হতে পারে। কিন্তু স্থায়ী জাহান্নামী হবে না। এখন দেখতে হবে যে, সাহাবায়ে কিরাম রাযি. যে সত্যের মাপকাঠি ঈমানের মানদণ্ড এবং তাদের দোষচর্চা বা তাদের প্রতি বিদ্বেষ পোষণ করা যে হারাম এ কথাগুলো উল্লেখিত দু প্রকারের কোনটির অন্তর্ভুক্ত। আহলে সুন্নাত ওয়াল জামাআতের ইজমা এই যে এ বিষয়গুলো প্রথম প্রকার তথা ঈমান ও আক্বীদার অংশ। এ জন্য ইসলামী আক্বীদার সকল কিতাব সমূহে বিষয়টি উল্লেখিত হয়েছে। (প্রমাণঃ আকীদাতুত ত্বাহাবী ১৩৯ পৃঃ শরহে আক্বায়িদ ১৪৯পৃঃ)

এ প্রেক্ষিতে শুধু ইতিহাসের ভিত্তিতে যা কখনো কুরআন বা সহীহ হাদীসের মত নির্ভরযোগ্য নয়, বরং ৩/৪ টি সহীহ নির্ভরযোগ্য ইতিহাস ছাড়া ইসলামের নামে যে সমস্ত ইতিহাস প্রচলিত আছে তা প্রায় সবই শিয়া, রাফেজী ও ইসলামের দুশমনদের বর্ণনা বা সরাসরি তাদের দ্বারা রচিত। এ কারণে আহলে হকের সিদ্ধান্ত এই যে ইতিহাসের যে সমস্ত বর্ণনা কুরআনে কারীম এবং সহীহ হাদীসের সাথে সংঘর্ষশীল নয় সে সমস্ত বর্ণনাকে গ্রহণ করা যাবে অন্যগুলো গ্রহণ করা যাবে না। আহলে হকের এ সিদ্ধান্তকে উপেক্ষা করে বর্তমান যুগের কতিপয় ইসলামী চিন্তাবিদ নামধারী আলিম শুধু ইতিহাসের উপর ভিত্তি করে ইসলাম কায়িমের আন্দোলনের নামে সাহাবীগণের রাযি. দোষচর্চায় লিপ্ত হয়ে নিজের ঈমান ধ্বংস করে চলেছে এবং অন্য লোকদের ঈমান ধ্বংস হওয়ার কারণ হয়েছে। বর্তমানে বেশ কিছু লোক তৈরি হয়েছে যারা সাহাবীগণের রাযি. ব্যাপারে দারুণ ক্ষোভে ভোগে। তাদের ব্যাপারে বিদ্বেষ পোষণ করে। এ সবই পূর্বে উল্লেখিত ঐ সমস্ত নামধারী বে-আলিম ইসলামী চিন্তাবিদদের লেখনীর বিষ ফল বা ঈমানী এইডস। সাহাবী রাযি. বিদ্বেষী লোকেরা সাহাবীগণের রাযি. দোষচর্চা বৈধ মনে করলেও ঐ সব ইসলামী চিন্তাবিদদের সমালোচনা কেউ করুক তারা তা বৈধ মনে করে না। তাদের আচরণে মনে হয় তারা ঐ সব চিন্তাবিদদেরকে সাহাবীগণের রাযি. মর্যাদার ঊর্ধ্বে মনে করে।

পঞ্চম অধ্যায়

বর্তমান প্রেক্ষাপট ইয়াহুদী খৃষ্টানদের ষড়যন্ত্রের স্বরূপ

আল্লাহ তা'আলা ইরশাদ করেনঃ

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لاَ تَتَّخِذُوا بِطَانَةً مِّن دُونِكُمْ لاَ يَأْلُونَكُمْ خَبَالاً وَدُّوا مَا عَنِتُّمْ قَدْ بَدَتِ الْبَغْضَاءُ مِنْ أَفْوَاهِهِمْ وَمَا تُخْفِي صُدُورُهُمْ أَكْبَرُ ۚ قَدْ بَيَّنَّا لَكُمُ الآيَاتِ ۖ إِن كُنتُمْ تَعْقِلُونَ ﴿١١٨﴾ هَا أَنتُمْ أُولاَءِ تُحِبُّونَهُمْ وَلاَ يُحِبُّونَكُمْ وَتُؤْمِنُونَ بِالْكِتَابِ كُلِّهِ وَإِذَا لَقُوكُمْ قَالُوا آمَنَّا وَإِذَا خَلَوْا عَضُّوا عَلَيْكُمُ الأَنَامِلَ مِنَ الْغَيْظِ ۚ قُلْ مُوتُوا بِغَيْظِكُمْ ۗ إِنَّ اللَّـهَ عَلِيمٌ بِذَاتِ الصُّدُورِ ﴿١١٩﴾

অর্থঃ হে ঈমানদারগণ তোমরা মুমিন ব্যতীত অন্য কাউকে অন্তরঙ্গরূপে গ্রহণ করো না তারা তোমাদের অমঙ্গল সাধনে কোন ত্রুটি করে না। তোমরা কষ্টে থাক তাতেই

তাদের আনন্দ। শত্রুতাপ্রসূত বিদ্বেষ তাদের মুখেই ফুটে ওঠে। আর যা কিছু তাদের মনে লুকিয়ে রয়েছে তা আরো অনেক বেশি জঘন্য ও মারাত্মক । তোমাদের জন্য নিদর্শন বিশদভাবে বর্ণনা করে দেয়া হল যদি তোমরা তা অনুধাবন করতে সক্ষম হও। দেখ তোমরাই তাদেরকে ভালবাসো তারা কিন্তু তোমাদের প্রতি মোটেও সৎভাব পোষণ করে না। আর তোমরা সকল কিতাবসহ পূর্বে সমস্ত কিতাবই বিশ্বাস কর অথচ তারা যখন তোমাদের সাথে এসে মিলিত হয় তখন বলে আমরা তোমাদের কিতাবের উপর ঈমান এনেছি। পক্ষান্তরে তারা যখন পৃথক হয়ে যায় তখন তোমাদের উপর রোষবশতঃ তোমাদের উন্নতি দেখে আঙ্গূল কামড়াতে থাকে। বলুন, তোমরা আক্রোশে মরতে থাক। আল্লাহপাক মনের কথা খুব জানেন। তোমাদের যদি কোন মঙ্গল হয় তাহলে তাদের খারাপ লাগে। আর তোমাদের যদি অমঙ্গল হয় তাহলে তাতে তারা আনন্দিত হয়। আর যদি তোমরা ধৈর্য্য ধারণ কর এবং তাকওয়া অবলম্বন কর তাহলে তাদের প্রতারণায় তোমাদের কোনই ক্ষতি হবে না। নিশ্চয়ই তারা যা কিছু করে তা সমস্তই আল্লাহর আয়ত্তে রয়েছে। (সুরাহ আল-ইমরানঃ১১৮-১২০)

আলোচ্য আয়াতে ‘বিতানাহ’ শব্দটি তার রূপক অর্থে ব্যবহৃত হয়েছে। সে হিসেবে এর অর্থ দাড়ায় বন্ধু, বিশ্বস্ত ও গোপন তথ্যের ব্যাপারে নির্ভরযোগ্য ব্যক্তি ইত্যাদি। কোন কোন অভিধানে বিতানাহ শব্দের অর্থে অভিভাবক বিশ্বস্ত বন্ধু এবং যার সাথে পরামর্শ করা হয় এমন ব্যক্তিকে বিতানাহ হিসেবে উল্লেখ করা হয়েছে।

অতএব, উপরোক্ত আয়াতে আল্লাহ তা’আলা মুসলমানদেরকে স্পষ্টভাবে নির্দেশ দিয়েছেন যে ইসলাম ধর্মাবলম্বীদের ছাড়া অন্য কাউকে এমন অভিভাবক হিসাবে গ্রহণ করো না যার নিকট ব্যক্তিগত, পারিবারিক কিংবা জাতীয় ও রাষ্ট্রীয় কোন গোপন তথ্য প্রকাশ করা যেতে পারে। কেননা তারা কখনো মুসলমানদের মঙ্গল চায় না বরং তারা মুসলমানদের গোলাম বানিয়ে রাখার অপকৌশলে লিপ্ত। মুসলমানরা আল্লাহপাকের খাস বান্দা এবং তাদের অভিভাবক হচ্ছেন স্বীয় রাব্বুল আলামীন। আল্লাহ তা’আলা নিজেই ঘোষণা করেছেন-

“আল্লাহ পাকই হচ্ছেন অভিভাবক।” আর কোন অভিভাবক এটা চায় না যে, তার সন্তান অন্যের অধীনে থাকুক বা অন্য কারো গোলামী করুক।

শুধু তাই নয় বরং কেউ গোলাম বানানোর চক্রান্তে লিপ্ত হবে এটাও বরদাশত করে না। তাই আল্লাহ তা’আলা মুমিনদের অভিভাবক হিসেবে তাদেরকে সাবধান করে দিচ্ছেন এই বলে যে, হে ঈমানদারগণ! ইয়াহুদী, খৃষ্টান, মুশরিক ও মুনাফিক এদের কেউই মুসলমানদের বন্ধু নয় এবং হতেও পারে না বরং তারা সর্বদা মুসলমানদের ক্ষতি সাধনে লিপ্ত।

মুসলমানদের জাগতিক ও পারলৌকিক ক্ষতিই তাদের কাম্য। আর তাদের অন্তরে যা লুকায়িত আছে তা অত্যন্ত মারাত্মক। সুতরাং এহেন শত্রুদেরকে অন্তরঙ্গ বন্ধু হিসেবে

গ্রহণ করা কোন বুদ্ধিমানের কাজ হতে পারে না। আল্লাহ তা'আলা পবিত্র কুরআনে তাদের ষড়যন্ত্রের এমন সুস্পষ্ট ব্যাখ্যা প্রদান করেছেন যাতে অতি সহজেই অনুমান করা যাবে যে তারা মুসলমানদের কত মারাত্মক দুশমন। পবিত্র কুরআনে ইরশাদ হয়েছেঃ "ইয়াহুদী খৃষ্টানরা কখনই আপনার প্রতি সন্তুষ্ট হবে না যে পর্যন্ত আপনি তাদের ধর্মের অনুসরণ না করেন।" (সূরাহ বাক্বারাহ)

মোটকথা মুসলমানদেরকে তাদের ধর্মের অনুসারী বানানো এবং তাদের গোলামে পরিণত করাই তাদের উদ্দেশ্য।

আমাদের এ মুসলিম প্রধান দেশে সাধারণ শিক্ষা ব্যবস্থায় এমন সব বিষয়ের শিক্ষা প্রদান করা হচ্ছে যা পাঠ করে মুসলিম পরিবারের সন্তানরা খৃষ্টানদের পদলেহী গোলামে পরিণত হচ্ছে। উল্লেখ্য যে, এ শিক্ষা অর্জন করা ফরজ কিংবা জরুরী নয় বরং শর্ত সাপেক্ষে জায়িয আছে মাত্র। আর দীনের শিক্ষা অর্জন করা ফরজ। অথচ এর প্রতি আদৌ কোন গুরুত্ব নেই। আবার পুরুষদের জন্য দীনী ইলম শিক্ষার যতটুকু ব্যবস্থা রয়েছে মহিলাদের জন্য ততটুকুও নেই বরং মেয়েদের জন্য ব্যবস্থা নেই বললেই চলে। তবে আশার বিষয় এই যে, বর্তমানে নারীদের মাঝে দীনী শিক্ষা বিস্তারের কিছুটা উদ্যোগ নেয়া হচ্ছে।

খৃষ্টানদের ষড়যন্ত্রের কথা উল্লেখ করে আল্লাহ পাক পবিত্র কুরআনের অন্যত্র ইরশাদ করেন-

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لاَ تَتَّخِذُوا الْيَهُودَ وَالنَّصَارَىٰ أَوْلِيَاءَ ۘ بَعْضُهُمْ أَوْلِيَاءُ بَعْضٍ ۚ وَمَن يَتَوَلَّهُم مِّنكُمْ فَإِنَّهُ مِنْهُمْ ۗ إِنَّ اللَّـهَ لاَ يَهْدِى الْقَوْمَ الظَّالِمِينَ ﴿٥١﴾

"হে ঈমানদারগণ! তোমরা ইয়াহুদী খৃষ্টানদেরকে বন্ধু হিসেবে গ্রহণ করো না। তারা একে অপরের বন্ধু। তোমাদের মধ্যে হতে যে তাদের সাথে বন্ধুত্ব স্থাপন করবে সে তাদেরই অন্তর্ভুক্ত। আল্লাহ তা'আলা জালিমদেরকে পথ প্রদর্শন করেন না।" (সুরাহ মায়িদাহঃ ৫১)

মুসলমানগণ ইসলামকে পরিত্যাগ করে পার্থিব সুযোগ-সুবিধা আদায়ের লক্ষ্যে যতই তাদের পদলেহী হোক না কেন তবুও তারা আন্তরিকভাবে মুসলমানদেরকে বন্ধু হিসেবে গ্রহণ করবে না।

উদাহরণ স্বরূপ বলা যায় তুরস্কের কামাল আতার্তুক পাশ্চাত্যের ইয়াহুদী খৃষ্টানদের মন জয় করার লক্ষ্যে নিজের দেশে সকল ইসলামী বিধি বিধানের উপর নিষেধাজ্ঞা জারি করেছিল এবং ইসলামী কৃষ্টি কালচারকে ধ্বংস করে দিয়েছিল ধর্ম নিরপেক্ষতার নামে এভাবে নিজেদের সত্তা বিলীন করে দিলেও প্রভুদের মন জয় করতে শেষ পর্যন্ত ব্যর্থ হয়েছে।

দুঃখজনক হলেও সত্য যে, আজ আমাদের সমাজেও এক শ্রেণীর বুদ্ধিজীবী ধর্ম নিরপেক্ষতার নামে আমাদের দেশ থেকে ইসলামকে নির্মূল করার হীন প্রয়াসে লিপ্ত।

মুসলিম পরিবারে জন্মগ্রহণ করেও তাদের মাথায় এসব বিকৃত চিন্তার অনুপ্রবেশ ঘটেছে ইংরেজ কর্তৃক প্রণীত শিক্ষা ব্যবস্থার অধীনে শিক্ষা লাভ করার ফলে।

প্রসঙ্গক্রমে আলীগড় মুসলিম বিশ্ব বিদ্যালয়ের প্রতিষ্ঠা লগ্নের কথা উল্লেখ করা যেতে পারে।

আলীগড় মুসলিম বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রতিষ্ঠাতা স্যার সৈয়দ আহমদ যখন গভীরভাবে লক্ষ্য করলেন যে ব্রিটিশ বিরোধী আন্দোলন মুসলমানরা সফল কাম হচ্ছে না এবং সরকারের উচ্চপর্যায়ের সকল কর্মকর্তা ও কর্মচারীরা ইংরেজ কিংবা ইংরেজদের দালাল তাদের ষড়যন্ত্রে আন্দোলন ব্যর্থতায় পর্যবসিত হচ্ছে আর এদিকে মুসলমানরাও আধুনিক শিক্ষা থেকে অনেক দূরে তাই ইংরেজ বিরোধী আন্দোলনকে আরো বেগবান করার লক্ষ্যে তিনি উক্ত প্রতিষ্ঠান গড়ার ইচ্ছা করলেন এবং এ ব্যাপারে পরামর্শের জন্য তার সহকর্মী পীর মুহাম্মদ সাহেবকে মাওলানা রশীদ আহমদ গাংগুহীর রহ. নিকট প্রেরণ করলেন। তার কথা শুনে রশীদ আহমদ গাংগুহী রহ. হযরত মাওলানা কাসেম নানুতবীর রহ. সাথে তাকে পরামর্শের কথা বললেন। ঘটনাক্রমে সেখানে কাসেম নানুতবী রহ. এসে উপস্থিত হলে পীর মুহাম্মদ সাহেবের কথা শুনে তিনি বললেন যে উদ্দেশ্য ভাল তবে এর দ্বারা ইংরেজ বিরোধী নয় বরং ইংরেজদের তোষামোদকারীই তৈরী হবে। কারণ সেখানে যে শিক্ষা প্রদান করা হবে সেটা তো ইংরেজ গোষ্ঠী কর্তৃত্ব প্রণীত সুতরাং তাদের দ্বারা প্রণীত সিলেবাস অনুযায়ী শিক্ষা লাভ করে তাদের বিরুদ্ধে আন্দোলন করবে এমন হতে পারে না। বরং তা পাঠ করে নিজের ধর্মের ব্যাপারে সন্দিহান হয়ে পড়বে। আর বাস্তবে হয়েছেও তাই অবশ্য বর্তমানে সেখানে হাক্কানী উলামায়ে কিরামের প্রচেষ্টার বদৌলতে দীনের কাজ চলছে এবং বর্তমানে সেখানে তাবলীগের কাজ জোরদারভাবে চালু আছে।

ইংরেজরা এই ভারত উপমহাদেশে তাদের রাজত্ব পাকাপোক্ত করার জন্য অনেকগুলো ষড়যন্ত্রের নীল নকশা প্রণয়ন করেছিল এর মধ্যে প্রথম ষড়যন্ত্র অনুযায়ী হাজার হাজার উলামায়ে কিরামকে ফাঁসির কাষ্ঠে ঝুলিয়েছে। কিন্তু তবুও তাদের শেষ রক্ষা হয়নি। অবশেষে লেজ গুটিয়ে পালাতে বাধ্য হয়েছে।

দ্বিতীয় ষড়যন্ত্র হিসেবে তারা এদেশ এমন শিষ্য-শাগরিদ তৈরী করে রেখে গেছে এবং এদেশে সহ শিক্ষার নামে এমন এক শিক্ষা ব্যবস্থা চালু করে রেখে গেছে যে শিক্ষা কার্যক্রম অনুসারে পাঠ গ্রহণের ফলে মানুষ চেহারা ও আকৃতির দিক দিয়ে পাকিস্তানি, হিন্দুস্তানী কিংবা বাংলাদেশী হলেও মন মস্তিষ্ক ও চিন্তা চেতনার দিক দিয়ে তারা হবে ইংরেজ। সরকার কর্তৃক মনোনীত জাতীয় শিক্ষা কমিশনের তৎকালীন চেয়ারম্যান লর্ড ম্যাকেলে বলেছিল, উপমহাদেশে আমাদের এ শিক্ষা ব্যবস্থা প্রণয়নের উদ্দেশ্যে হচ্ছে এদেশে এমন এক শ্রেণী তৈরী করা যারা বর্ণ আকৃতির দিক দিয়ে হবে ভারতীয়; কিন্তু মন-মস্তিষ্কের দিক দিয়ে হবে ইউরোপিয়ান ও ইংরেজ।

ইংরেজদের তৃতীয় ষড়যন্ত্র, দেশে অর্থনৈতিক সুদী ব্যবস্থা প্রবর্তন। তাদের ভাষায় সুদই অর্থনীতির মেরুদণ্ড। তাই আজ ব্যাংকিং ব্যবস্থায় সুদ, কারবারে সুদ, লেনদেনে সুদ। সুদ অর্থনৈতিক মেরুদণ্ড নয় বরং একটি অর্থনৈতিক অভিশাপ। আল্লাহ তা'আলা পবিত্র কুরআনে বলেনঃ আল্লাহ তা'আলা ব্যবসাকে হালাল এবং সুদকে হারাম করেছেন।

তাদের চতুর্থ ষড়যন্ত্র মুসলমানদের ঘরে ঘরে টেলিভিশন ও ভিসিআর পৌছিয়ে দেয়া। এর মাধ্যমে নারীদেরকে বেহায়া বানিয়ে তাদের সতীত্বের পরিবর্তে যৌনাচারে উজ্জীবিত করা। মেয়ে ছেলের অবৈধ সম্পর্ক ও অবাধ মেলা মেশার বাস্তব প্রশিক্ষণ দেয়া। যার উসিলায় আজ সমাজে ধর্ষণ, এইডস মহামারির ন্যায় দ্রুত ছড়িয়ে পড়ছে। এখন আবার শ্লোগান দেয়া হচ্ছে বিশ বছরের আগে মেয়েদের বিবাহ নয়। এটাও কিন্তু পশ্চিমাদের চাপিয়ে দেয়া আরেক ষড়যন্ত্র। এতে যিনা ব্যভিচারের রাস্তাকে আরো প্রশস্ত করা হচ্ছে। কেননা টি.ভি, ভিসিআর আর নগ্ন ছবির বদৌলতে মেয়েরা বারো বছরে বালেগ হয়ে যাচ্ছে। এরপর আট বছর ঘরে বসে তারা কি করবে? এতে সমাজে যিনা ব্যভিচার বৃদ্ধি পাবে। অবৈধ সন্তানের গঞ্জনা যাতে সইতে না হয় সেজন্য রাস্তার মোড়ে মোড়ে স্বাস্থ্য সেবার জন্য ক্লিনিক খোলা হচ্ছে। উদ্দেশ্য অবৈধ মিলন আর অবৈধ গর্ভপাতের পথ সুগম করা। এসব ষড়যন্ত্র আমাদেরকে অনুধাবন করতে হবে।

তাদের পঞ্চম ষড়যন্ত্রের জাল হল, সেবার ছদ্মবরণে রাষ্ট্রীয় ক্ষমতা কুক্ষিগত করা। উলামায়ে কিরামের হাতে পিটুনি খেয়ে এদেশ থেকে তারা পলায়ন করল, আবার কিভাবে এদেশের শাসন ক্ষমতা কুক্ষিগত করা যায় সেজন্য সেবার ছদ্মবরণে পাঠিয়ে দিল এনজিওদেরকে। এর মাধ্যমে দেশের এক শ্রেণীর বুদ্ধিজীবীদের মাথা মোটা অংকের বিনিময়ে ক্রয় করে নিলো যারা আজ মীরজাফর, জগৎশেঠ, উর্মিচাদ, ঘষেটি বেগমের ভূমিকায় অবতীর্ণ হয়েছে।

এই এনজিও দ্বারা আমাদের মা-বোনদেরকে রাস্তায় বের করা হয়েছে। মাতৃজাতিকে আজ ভোগের সামগ্রীতে পরিণত করা হয়েছে। তারা সমাজ থেকে বিবাহ প্রথা উঠিয়ে দিয়ে পাশ্চাত্য ধারায় ফ্রি সেক্সের প্রবর্তন করতে চাচ্ছে, অবাধে যিনা ব্যভিচারের পথ সুগম করে হালাল সন্তানের পরিবর্তে হারামজাদাদের দিয়ে দেশ ভরে দিতে চাচ্ছে । মুখের কথায় তালাক হয় না তিন তালাক এক সাথে দিলেও তালাক হয় না। রাগ করে তালাক দিলে তালাক হয় না। এসব ভ্রান্ত কথার দ্বারা স্বামী স্ত্রীকে স্থায়ীভাবে যিনায় লাগিয়ে দিচ্ছে।

তাদের ষষ্ঠ ষড়যন্ত্র হল জনসংখ্যা বিস্ফোরণ নামক জুজু বুড়ীর ভয় দেখিয়ে পরিবার পরিকল্পনা বা জন্ম নিয়ন্ত্রণ বাস্তবায়ন। শরী'আতের দৃষ্টিতে ব্যক্তিগত বা স্বাস্থ্যগত উজরের কারণে মুফতীদের থেকে ফাতওয়া নিয়ে এটা গ্রহণের কিছুটা সুযোগ থাকলেও সুখী পরিবার গড়ার লক্ষ্যে এটা গ্রহণের কোন সুযোগ শরীআতে নেই। কারণ এটা গ্রহণের অর্থঃ আল্লাহকে রিযিক দাতা অস্বীকার করা। এমতাবস্থায় একজন

মুমিনের আল্লাহর প্রতি ঈমান কিভাবে থাকতে পারে? বাস্তব কথা হচ্ছে এটা মুসলমানদের জনসংখ্যা বৃদ্ধি ভীতির প্রেক্ষিতে তার প্রতিরোধকল্পে এক মহা ষড়যন্ত্র। যেহেতু মুসলিম জনসংখ্যা বৃদ্ধি ভীতি তারা মুখে বলতে সাহস পায় না, তাই ষড়যন্ত্রমূলক ভাবে সেখানে জনসংখ্যা বিস্ফোরণ এবং দারিদ্রতা বৃদ্ধির কথা বলে আসল কথাটা ধামাচাপা দিয়ে থাকে এবং মুসলিম সরকারদেরকে সাহায্য প্রদানের শর্ত আরোপ করে এর প্রচার প্রসারে বাধ্য করে। তারাও মূল ষড়যন্ত্র না বুঝে দাতাদের সন্তুষ্টি অর্জন ও বেশী সাহায্য লাভের লোভে সকল প্রচার মাধ্যমে এর প্রচারণা চালায়। অথচ এর দ্বারা জনসংখ্যা কম তো হয়ই না বরং যিনা ব্যভিচারের রাস্তা প্রশস্ত হয়।

এই হল তাদের ষড়যন্ত্রের কিঞ্চিত খতিয়ান মাত্র। স্মরণ রাখতে হবে নারী হল মাতৃজাতি, মানুষগড়ার কারখানা। সেই কারখানা যদি নকল কারখানায় পরিণত হয় তাহলে তার থেকে নকল মালই উৎপন্ন হবে। আর এ ধরনের সন্তানের সংখ্যা যখন বৃদ্ধি পাবে তখন এদেশে দুশমনদের ক্ষমতা দখলের পথ সুগম হবে। কারণ এ ধরনের সন্তানগণ ইসলাম ও মুসলমান এবং দেশ ও জাতির কোন তোয়াক্কা করবে না। তারা মীর জাফরদের ন্যায় সামান্য স্বার্থের বিনিময়ে ঈমান, ইসলাম, দেশ ও জাতি সব কিছুই দুশমনদের হাতে তুলে দিতে প্রস্তুত থাকবে। অমুসলিম এনজিওগুলো এর প্রকৃষ্ট প্রমাণ। অসংখ্য বেকার যুবকদের ঋণ বা সাহায্য না দিয়ে মেয়েদেরকে নিয়ে এরা টানা হেচঁড়া করে থাকে অথচ এক একজন নারী তার সন্তানদের জন্য এক একটা আদর্শ বিদ্যালয়। সুতরাং তারা বেকার নয়।

লক্ষ্য করলে বুঝা যায়, আজও অনেক অফিসার এমন রয়েছেন যারা ঘুষ গ্রহণ করেন না। এর কারণ হল তার মা তাকে নিষেধ করেছেন। দেখুন আমাদের শত ওয়াজ শত তাফসীর আর বক্তৃতা দ্বারাও মানুষ ঘুষ ছাড়বে কিনা সন্দেহ কিন্তু তার মা যেহেতু নিষেধ করেছেন তাই কর্মক্ষেত্রে গিয়েও তার মায়ের কথার ধ্বনিটা কানে বাজতে থাকে। এ জন্য ঘুষ নিতে সাহস করছে না। চিন্তা করে দেখুন মা কত বড় আদর্শ সন্তানের জন্য। কিন্তু এখন কি শিক্ষা দেয়া হচ্ছে? কোথায় নেয়া হচ্ছে তাদেরকে? তাই এই ফিতনা ফাসাদের যুগে নারী জাতিকে মাতৃজাতির সেই শ্রদ্ধার আসনে অধিষ্ঠিত করতে হরে তাদের জন্য দীনী শিক্ষার ব্যবস্থা করতে হবে। তাদেরকে এনজিও বেঈমানদের মরণ ছোবল থেকে রক্ষা করতে হলে তাদের মাঝে ইসলামী শিক্ষার ব্যাপক প্রচার ও প্রসার ঘটানো অপরিহার্য।

আজ সময় এসেছে দুশমনদের প্রত্যেকটি ষড়যন্ত্রকে গভীরভাবে অনুধাবন করার এবং মুসলিম স্বাধীন দেশে সর্বস্তর থেকে তাদের ষড়যন্ত্রকে ছুড়ে ফেলে দিয়ে সঠিক ইসলামী বিধি-বিধান বাস্তবায়ন করা। এটাই এ জাতির কামিয়াবীর মূলমন্ত্র।

তথ্যসূত্র:

১	পবিত্র কুরআনুল কারীম	১৫	তাফসীরে মা আরিফুল কুরআন

২	তাফসীর ইবনে কাসীর	১৬	আর-রাওজাতুন নাদিয়াহ
৩	আল-মুসায়ারাহ	১৭	মিরকাত শরহে মিশকাতুল মাসাবীহ
৪	বুখারী শরীফ	১৮	তারীখে ত্বাবারী
৫	মুসলিম শরীফ	১৯	আল আওয়াসিম মিনাল ক্বাওয়াসিম
৬	তিরমিযী শরীফ	২০	আল-বিদায়া ওয়ান নিহায়া
৭	আবু দাউদ শরীফ	২১	শরহুল আক্বীদাতুত তাহাবি
৮	ইবনে মাজাহ শরীফ	২২	শরহে আকায়িদ
৯	নাসায়ী শরীফ	২৩	শরহে ফিকহে আকবার
১০	রাজীন	২৪	শরহে আক্বীদায়ে ওয়াসিতিয়্যাহ
১১	মুসনাদে বাযযার	২৫	হায়াতুস সাহাবা
১২	আল-মুসামারাহ	২৬	তাফহীমাত
১৩	আদদুররাতুল মুযীয়াহ	২৭	আল-হুকুমাতুল ইসলামিয়্যাহ
১৪	আছ-ছারিমুল মাসলুল		